পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের
তাফসীর মাহফিল থেকে

বিষয়ভিত্তিক
তাফসীরুল কোরআন

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

বিষয়ভিত্তিক

তাফসীরুল কোরআন

দ্বিতীয় খন্ড

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক তাফসীর মাহফীলে কোরআন-হাদীস, ইতিহাস, দর্শন, চলমান ঘটনা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আলোচিত বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন
দ্বিতীয় খন্ড
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার
৫৩/১ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং
৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ২০০ টাকা মাত্র

Bishoy Bhittique Tafsirul Quran 2nd Part by Moulana Delawar Hossain Sayedee, Co-operated by Rafeeq bin, Sayedee, Copyist : Abdus Salam Mitul, Published by Global publishing Network, Dhaka.2nd Edition 2009 March, Price : 200 Hundred Tk, only in BD, 5 Doller in USA, 3 Pound UK.

কিছু কথা

সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে শতকোটি শোকর গোজার করছি, যিনি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত বিশ্ব-মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন দান করে পৃথিবীতে প্রচলিত অগণিত বাঁকা পথের গোলক ধাঁ-ধাঁ থেকে বের করে সহজ-সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম মানবতার মহান মুক্তিদূত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, যাঁর ওপরে আল্লাহ্ তা'য়ালা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং যাঁর মাধ্যমে বিশ্বের শোষিত, নিপিড়ীত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির পথনির্দেশনা দিয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়্যাতের জীন্দেগীতে কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অশুভ শক্তির সাথে সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সংগ্রামমুখর জীবন-যাপন করেছেন। সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমেই তিনি একদল নিষ্ঠাবান, নিঃস্বার্থ, অকুতোভয় বীর মুজাহিদ তৈরী করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন আল কোরআনের বিপ্লবী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মী। আল্লাহর রাসূল তাঁদের মাধ্যমেই একটি শোষণ মুক্ত, নিরাপত্তাপূর্ণ, সুখী -সমৃদ্ধশালী ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রত্যেক যুগের চিন্তানায়কগণই এ কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আল কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন ব্যতীত পৃথিবীর মানুষ কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না।

সেই কোরআনের বিপ্লবী সিপাহ্সালার সারা দুনিয়ার অগণন মানুষের প্রাণ প্রিয় মুফাচ্ছির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব পৃথিবীর আনাচে কানাচে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে কোরআনের আহ্বান পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল হাম্‌দুলিল্লাহ- তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টায় সারা পৃথিবীব্যাপী ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং অগণিত মানুষ কোরআনের বিধান দুনিয়ায় পুনরায় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বজ্র শপথ গ্রহণ করেছে। আল্লাহর কোরআন একটি বিপ্লবী আন্দোলনের পয়গাম নিয়ে এসেছে- এই কথাটি মুসলমানরা কালের ব্যবধানে বিস্মৃত হয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আল্লামা সাঈদী সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে মুসলমানরা কোরআনের দিকে ফিরে আসছে। শুধু মুসলমানরাই নয়- অগণিত অমুসলিমও তাঁর হাতে হাত দিয়ে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। তিনি পৃথিবীর দেশে দেশে তাফসীরুল

কোরআন মাহফিলের মাধ্যমে মানুষকে কোরআনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দই শান্তি পিয়াসী মুক্তি পাগল জনতার প্রাণে কোরআনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই আকর্ষণকে স্থায়ীভাবে মানুষের মনের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিক তাফসীর মাহফিলে আলোচিত বিষয়সমূহ গ্রন্থাবদ্ধ করে জাতির খেদমতে পেশ করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কামিয়াব করুন।

তাফসীর মাহফিলে আল্লামা সাঈদী সাহেবের আলোচনা শুনে কোরআন পাগল জনতা যেভাবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন, আমরা আশা করছি— তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা— যা বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, এসব গ্রন্থ পাঠ করেও মুক্তি পিয়াসী জনতা কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। দুই খন্ডে বিভক্ত **বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন** – নামক এই গ্রন্থ সাজানো হয়েছে, তাঁর বক্তৃতা ও লেখনী দিয়ে। গ্রন্থের কোথাও তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়লে তা আমাদের ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে ইন্‌শাআল্লাহ্ সংশোধন করা হবে। শব্দ ধারণযন্ত্র থেকে সঙ্কলন করার ক্ষেত্রে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের অসতর্কতা হেতু তথ্যগত ভুল লেখনী আকারে গ্রন্থাবদ্ধ হওয়া বিচিত্র কিছু নয়, এ জন্য তথ্যগত ভুলের দায়-দায়িত্ব একান্তভাবেই অনুলেখক-সঙ্কলকের।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর কোরআনের খাদেম আল্লামা সাঈদী সাহেবকে শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতের ময়দানে একে নাজাতের উসিলা বানিয়ে নিন।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষে

বিনয়াবনত

আব্দুস সালাম মিতুল

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

কোরআনের মূল আলোচনা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষসহ অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এসব প্রাণী পৃথিবীতে কিভাবে জীবন পরিচালিত করবে, সে প্রবণতা সৃষ্টিগতভাবেই তাদের ভেতরে দান করা হয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে খাদ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারা সে খাদ্যই আহার করে জীবন ধারণ করে। মাংসাশী প্রাণীসমূহ বৃক্ষ-তরু-লতা আহার করে না। আবার উদ্ভিদ আহার করে যেসব প্রাণী, তারা রক্ত-মাংস আহার করে না। প্রাণীসমূহকে যেসব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে দেখা যায়, তা তাদের সৃষ্টিগত প্রবণতা। এ প্রবণতা দিয়েই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জন্য পৃথক কোন বিধি-বিধানের প্রয়োজন হয় না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে যে নিয়ম-কানুনের অধীন করে সৃষ্টি করেছেন, তারা সে নিয়মের অধীনেই জীবনকাল অতিবাহিত করে। এ জন্য কখনো এটা দেখা যায়নি যে, মাছ হঠাৎ করে পানি ত্যাগ করে স্থলে এসে বসবাস করছে। আবার বাঘকে এমন দেখা যায়নি যে, তারা বন-জঙ্গল ত্যাগ করে সমুদ্রে গিয়ে বসবাস করছে। তারা সবাই আল্লাহর নিয়মের অধীন। আর আল্লাহর নিয়মের কোন পরিবর্তন কখনো হয় না। আল্লাহ বলেন—

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً–

তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন ধরনের পরিবর্তন হতে, কোন প্রকারের ব্যতিক্রম হতে দেখতে পাবে না। (সূরা ফাতির)

সুতরাং, আইন-কানুন, বিধি-বিধানের প্রয়োজন হয় মানুষের। মানুষের জন্যই জীবন বিধানের প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যেই পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালা ওহী যোগে জীবন বিধান প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন প্রেরণ করা হয়েছে। এ কোরআন দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখা নিয়ে শুধু আলোচনা করে না, বরং মানব জাতির জন্য যেখানে যা প্রয়োজন তাই নিয়ে এ কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কোরআনের সবটুকুই মানুষের জন্যই আলোচনা করা হয়েছে। মানুষই হলো এ কিতাবের মূল আলোচ্য বিষয়। মানুষকে বোঝাতে গিয়ে অন্যান্য বিষয় যতটুকু প্রয়োজন—ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের যখন কোনই অস্তিত্ব ছিল না, তখন থেকে শুরু করে, তার শেষ পরিণতি পর্যন্ত এ কিতাব আলোচনা করেছে। আত্মার জগতে মানুষকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে এবং সে কি জবাব দিয়েছিল, সে কথা এ কোরআন আলোচনা করেছে। আবার সেখান থেকে মাতৃগর্ভে যখন তাকে প্রেরণ করা হলো, তখন সে কি অবস্থায় ছিল, সে বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ-ذٰالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-لَااِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-

তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে তিন তিনটি অন্ধকার পর্দার অভ্যন্তরে একের পর এক আকৃতি দান করে থাকেন। (যিনি এ কাজগুলো সম্পাদন করেন) সেই আল্লাহই তোমাদের রব। তিনিই প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী-তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (সূরা যুমার-৬)

তিনটি পর্দা বলতে এখানে মায়ের পেট, বাচ্চা যে থলির ভেতরে অবস্থান করে সে থলি এবং যে ঝিল্লি দিয়ে বাচ্চা আবৃত থাকে সে ঝিল্লিকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে আগমন পূর্ব মুহূর্তে মানুষের কি অবস্থা ছিল, তা আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আস্ সাজ্দায় বলেন–

الَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهْ وَبَدَاَخَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ-ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهْ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ-ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ-قَلِيْلاً مَّاتَشْكُرُوْنَ-

যে জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন তা উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সুত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো। তারপর তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

মানুষ সৃষ্টির উপাদান ও প্রক্রিয়া, তারপর একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষ কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে, তার শারীরিক কাঠামো, তাকে সৃষ্টি করার

উদ্দেশ্য এবং তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি, ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছি আমি এবং এর ভেতরে যা কিছুই রয়েছে, কোন কিছুই আমি বৃথা সৃষ্টি করিনি। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসব সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি তোমাদের কল্যাণের জন্য। এসব কিছুই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি। আর তোমাদের ওপরে আদেশ দিয়েছি, তোমরা কেবল আমারই আদেশ পালন করবে। আমার বিধান অনুসরণ করবে। আমার দাসত্ব ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না আর আমার দাসত্বের মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

অর্থাৎ এ কিতাব মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেছে। কোন কাজ করলে, কোন পথে অগ্রসর হলে, কিভাবে জীবন পরিচালিত করলে মানুষ একটি সুখী সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ, ভীতিহীন, বৈষ্যম্যহীন, শোষণমুক্ত, নিরাপত্তপূর্ণ পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি গঠন করতে সক্ষম হবে এবং পরকালীন জীবনে কিভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারবে, সে বিষয়ে এ কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ কোন পথে নিজেকে অগ্রসর করালে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিজেকে পৌছে দেবে, পৃথিবীর জীবন হবে অস্থিরতা আর শঙ্কা জড়িত, পরকালীন জীবনে তাকে নিক্ষিপ্ত হতে হবে যন্ত্রণাময় জীবনে, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষকে নির্ভুল কর্মনীতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার দিকে মানুষকে অগ্রসর করানোর লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষকে নিয়ে এ জন্যই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আরেকটি বড় সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর সে সত্যটি হলো, কোরআন যে কোন মানুষের রচনা করা কিতাব নয়, তা যে কোন চিন্তাশীল পাঠকই স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হয়। কারণ এ কিতাব যাঁর ওপরে এবং যে পরিবেশে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং সে পরিবেশ ছিল মূর্খতায় আচ্ছন্ন। একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে অজ্ঞানতার পরিবেশে অবস্থান করে এমন বৈজ্ঞানিক আলোচনা সমৃদ্ধ কিতাব রচনা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, এ সত্য কোরআনের আলোচিত বিষয়ই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা

বিশ্বের সর্বকালের সর্বযুগের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কোরআনে কারীমের মাধ্যমে একটি জাতির পরিবর্তন সাধিত করেছিলেন। গোটা বিশ্বে রেডিক্যাল চেঞ্জ এনেছিলেন। এ কথা অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, পৃথিবীতে মানব রচিত কোন বিধান দিয়ে কোনদিন কল্যাণ বয়ে আসবে না। জাতি সুখ এবং সমৃদ্ধি কখনো দেখতে পাবে না। অপরের রক্তচক্ষু দেখে গোলাম হয়ে চিরকাল কাটাতে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ভয়ে আতঙ্কে কাতর হয়ে পড়তে হবে। এই বিশ্বের মাঝে যদি আমরা বলিষ্ঠতা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আগ্রহী হই, একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ ও জাতি কামনা করি, তাহলে কোরআনে কারীম প্রবর্তিত একটি সমাজ ব্যতীত অন্য কোন পথে তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

আল্লাহর কোরআন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহ তা'য়ালা আর অন্য কিছু দেননি। গোটা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো কোরআন। আল্লাহর এই কিতাব হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়। মানুষের হেদায়াতের জন্য এই কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত কিছুই বলে দিয়েছেন, নতুন করে কোন কিছু আর বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আর একটি শব্দ এবং অক্ষরও মানুষের কাছে হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হবে না। এই কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা যে কতবেশী, তা মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। এ জন্য আল্লাহর এ কিতাবের সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

সর্বময় ক্ষমতার উৎস হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁর পক্ষ থেকেই এ কোরআন মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যত নিয়ামত দান করেছেন, তার ভেতরে এই কোরআনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এই নেয়ামতের গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা অনুধাবন করার জন্যই একে অবতীর্ণ করা হয়েছে রমজানের কদরের রাতে। এ সম্পর্কে আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ–

রমজানের মাস, এতে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কাররূপে নির্ধারণ করে।

কোরআনের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তা রমজান মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যাদের জন্য এই কোরআনের মতো মহান নিয়ামত দান করা হয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা এই অমূল্য নিয়ামত লাভ করলে এ জন্য তোমরা শোকর আদায় করো। কিভাবে শোকর আদায় করতে হবে, সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, রোজা পালন করে শোকর আদায় করো।

ব্যক্তিগতভাবেও কোন মানুষ যদি তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে সফলতা অর্জন করে, তখন সে আনন্দ প্রকাশ করে। একটি জাতি যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফলতা অর্জন করে, তখন সে জাতি বিজয় উৎসবের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে। মুসলিম একটি মিল্লাতের নাম। এই মিল্লাত বা জাতির পিতা হলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। এই জাতি গোটা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেবে এ জন্য যে, এরা গোটা পৃথিবীতে কোরআনের আদর্শ বাস্তবায়ন করবে। কারণ কোরআনের আদর্শ যদি এরা বাস্তবায়ন না করে, তাহলে গোটা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে অশান্তির দাবানল যেভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, এর মূল কারণ হলো, কোরআনের আদর্শের অনুপস্থিতি। এই কোরআন স্বয়ং সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং তা আগমন করেছে তাঁর অনুসারীকে পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করার লক্ষ্যে। অর্থাৎ কোরআন তার অনুসারীদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেয়। এটা কোন কল্পনার বিষয় নয়—মুসলমানদের অতীত ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। যতদিন মুসলমানরা কোরআন অনুসরণ করেছে, গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব ছিল তাদেরই পদতলে।

সুতরাং, এই অমূল্য নিয়ামত দান করে তার শোকর আদায় করার জন্য রোজা পালন করতে বলা হয়েছে। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনুধাবন করা যাক, যেমন জাতিয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জনগণ যেন তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় সে জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। বিষয়টির ওপরে সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখে যেন সকল স্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে

পারে। যে অনুষ্ঠানে জনগণ অংশগ্রহণ করবে, সে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুযায়ী সরকার ক্ষেত্র বিশেষে সময় বর্ধিত করে যেন সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে কেউ বঞ্চিত না থাকে। ঠিক তেমনি, কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা এত বেশী যে, এটা লাভ করে মানুষ শোকর আদায় করবে। এই শোকর আদায় থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না থাকে, সে ব্যাপারেও আল্লাহ তা'য়ালা ব্যাবস্থা করে রেখেছেন।

আল্লাহর গৃহীত সে ব্যবস্থাটি হলো, কোন কারণবশতঃ শোকর আদায়ের মাস রমজান মাসে কেউ যদি রোজা পালন করার সুযোগ না পায়, তাহলে বছরের যে কোন সময়ে সে রোজার কাযা আদায় করে শোকর পালনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই সুযোগ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র কোরআনের সম্মান ও মর্যাদার কারণে। রমজান মাসের রোজাকে শুধুমাত্র আল্লাহভীতি অর্জনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমই করা হয়নি, বরং মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যে বিরাট ও মহান নে'মাত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে দিয়েছেন, রোজাকে তার শোকর আদায়ের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য কোন নে'মাতের শোকর আদায় এবং অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পদ্ধতি এটাই তো হতে পারে, যে বিরাট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ নে'মাত দেয়া হয়েছে, নে'মাত যারা লাভ করলো, তাদের দায়িত্ব হলো সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযোগী করে নিজেকে গঠন করার জন্য সর্বাত্মক সাধনায় লিপ্ত হওয়া।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের মতো নে'মাত এ জন্য আমাদেরকে দান করেছেন যে, আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করার পথ ও পদ্ধতি অবগত হয়ে সে অনুসারে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবো এবং গোটা পৃথিবীকেও সেই পথেই পরিচালিত করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করবো। আর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো রোজা এবং রমজান মাসে এ জন্যই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোরআন দিয়ে আমাদেরকে ধন্য এবং বিজয়ী করা হয়েছে। আমরা শোকর আদায় শেষে বিজয় উৎসব যেন উদযাপন করতে পারি এর জন্য দেয়া হয়েছে ঈদ উৎসব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا–

হে নবী ! বলো, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটা (কোরআন) প্রেরণ করেছেন। এ জন্য তো লোকদের আনন্দ ফূর্তি করা উচিত। (ইউনুস-৫৮)

কোরআনের মতো অতুলনীয় নে'মাত লাভ করে আমরা বিজয়ী হয়েছি, সেই বিজয় উৎসবই হলো ঈদ। কোরআনের মতো নিয়ামতকে যে রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ-

আমি এটি এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা দুখান-৩)

এভাবে সূরা কদরেও বলা হয়েছে, এ কোরআন আমি কদরের রাতে অর্থাৎ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। সে রাত যে কতটা মহিমান্বিত রাত, যার মর্যাদা সম্পর্কে কোন মানুষ কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। অগণিত রাত-ব্যাপী নামাজরত থেকে যে সওয়াব অর্জন করতে পারে, সে রাতে এক রাকাআত নামাজ আদায় করে সেই একই সওয়াব অর্জন করতে পারে। এ রাতের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন-

وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ-

প্রকৃতপক্ষে এটা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা আমার কাছে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ। (সূরা যুখরুফ-৪)

কোরআনের পরিচয় আল্লাহ জানিয়ে দিয়ে এ কথাও স্পষ্ট করে দিলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে আল্লাহর কোরআনের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়, কোরআন পরিবেশিত অনুপম জ্ঞান ভান্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে তা অনুসরণ করতে না পারে, তাহলে এটা সে ব্যক্তির লজ্জাজনক ব্যর্থতা আর দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যেতে পারে। কেউ যদি এ কিতাবকে ছোট করার প্রয়াস পায় এবং কিতাবের বক্তব্যের মধ্যে ভুল ধরার চেষ্টা করে তাহলে সেটা তার চরম হীনমন্যতা বৈ আর কিছু নয়।

কোরআনকে কেউ সম্মান-মর্যাদা না দিলেই এর মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। কেউ কোরআনের প্রভাব ও জ্ঞানকে গোপন করতে চাইলেই তা গোপন করতে পারে না। এটা যথাস্থানে একটি উচ্চ মর্যাদা স'পন্ন কিতাব যাকে এর অতুলনীয় শিক্ষা, মু'জিযাপূর্ণ বাগ্মিতা, নিষ্কলুষ জ্ঞান এবং যাঁর বাণী তাঁর গগনচুম্বী ব্যক্তিত্ব অতি উচ্চে

—২

তুলে ধরেছে। সুতরাং একে কেউ অবমূল্যায়ন করলেই তা মূল্যহীন হয়ে যায় না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা আনআ'ম-এর ৯২ আয়াতে বলেন–

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ -

এটা একটি কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ।

এই কোরআনের যেমন সম্মান ও মর্যাদা, একে যারা অনুসরণ করবে, তাদেরও সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা আমার কোরআন অনুসরণ করবে, তাদেরকে আমি পৃথিবীতে নেতৃত্ব দান করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবো। কেননা, আমার এ কিতাব কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ। এ বরকতপূর্ণ কিতাব আমি ইতিপূর্বে নবী ও রাসূলদেরকে দান করেছিলাম। এ থেকে কল্যাণ লাভ তারাই করতে পারে, যারা না দেখে তাদের রব্বকে ভয় করে এবং আখিরাতের দিনে হিসাব গ্রহণের বিষয়ে ঈমান রাখে।

কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে সতর্কতা

এ কিতাব যিনি পাঠ করছেন, তিনি তা থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারেন। সেই সাথে এর শ্রোতাদেরকেও বলা হচ্ছে, তোমরা তা শ্রদ্ধাভরে নীরবে শুনে তা থেকে হেদায়াত লাভ করার চেষ্টা করো। হেদায়াত লাভ করা আল্লাহর রহমত ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং নীরবে কোরআন শুনে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভ করার জন্য দোয়া করতে থাকো। এ কিতাব যিনি পাঠ করবেন তার ওপরে আদেশ দেয়া হচ্ছে– وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আর কোরআন থেমে থেমে পাঠ করো। (সূরা মুয্যাম্মিল-৪)

আল্লাহর কিতাবের অতি উচ্চ মর্যাদার কারণে তা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। ধীর গতিতে প্রতিটি শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হবে এবং বিরতি দেয়ার স্থানে বিরতি দিতে হবে। যেন এ কোরআনের অর্থ ও তাৎপর্য পরিপূর্ণভাবে তেলাওয়াতকারী অনুভব করতে পারে। তার বিষয়বস্তু হৃদয়পটে অঙ্কিত হয় এবং তা অনুসরণে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কোরআন তেলাওয়াতের সময় যেন শয়তান কোনভাবেই প্রতারণা করতে না পারে, সেদিকেও তেলাওয়াতকারী বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ–

তারপর যখন তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। (সূরা আন্ নাহল-৯৮)

কোরআন তিলাওয়াতের শুরুতেই আয়ুযুবিল্লাহিমিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম মুখে উচ্চারণ করলেই হবে না, মনের মধ্যে কোরআন বুঝার ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, শয়তান যেন প্রতারণা করতে সক্ষম না হয়, কোরআনের ভুল অর্থ গ্রহণ করা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ কিতাবের প্রতিটি কথাকে কিতাবেরই আলোকে দেখতে হবে এবং নিজের মনগড়া মতবাদ বা অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা চিন্তার মিশ্রণে কোরআনের শব্দাবলীর এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবেনা, যা আল্লাহর বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিপন্থী। সেই সাথে তেলাওয়াতকারীর মনে এ চেতনা এবং উপলব্ধিও জাগ্রত রাখতে হবে যে, সে যেন কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে এবং কোরআনের ভুল অর্থ গ্রহণ না করে, কেননা এ ব্যাপারে শয়তান তার পেছনে সক্রিয় তৎপরতা চালাচ্ছে।

কোরআন যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত অর্থে তিলাওয়াতকারী বুঝতে না পারে, এ জন্য শয়তান সবচেয়ে বেশী তৎপর। এ কারণে মানুষ যখনই এ কিতাবের দিকে ফিরে আসে তখনই শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার এবং কোরআন থেকে পথনির্দেশনা লাভ থেকে বাধা দেয়ার এবং তাকে ভুল চিন্তার পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এ কারণে আল্লাহর কোরআন অধ্যয়নের সময় অধ্যয়নকারীকে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে, যেন শয়তানের প্ররোচনা ও সুক্ষ্ম অনুপ্রবেশের কারণে সে হেদায়াতের উৎস কোরআনের কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়ে।

কারণ যে মানুষ আল্লাহর কিতাব থেকে সঠিক সত্য পথের সন্ধান লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পৃথিবীর কোন উৎস থেকেই আর সত্য পথের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হবে না। শয়তানের প্রতারণার কারণে কোন ব্যক্তি যদি কোরআন অধ্যয়নের সময় বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রষ্টতা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোন জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান তাকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আল্লাহর এই কোরআন যে রূপে অবতীর্ণ হয়েছে, যে অর্থ প্রকাশ করেছে, যেদিকে মানুষকে নিতে চেয়েছে, এসব দিকে কেউ যদি যেতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই শয়তানের প্রতারণা থেকে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন এই কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্বও তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেছেন—এ কথা শয়তান জানার পরে সে এটা অনুভব করেছে, এই কোরআনকে কোনক্রমেই ধ্বংস করা যাবে না। অতএব কোরআন যখন ধ্বংস করা যাবে না তখন যারা কোরআন বুঝার চেষ্টা করবে তাদেরকে প্রতারিত করতে হবে। কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য যেন মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়, বিভ্রান্তির গোলক ধাঁ-ধাঁয় যেন নিমজ্জিত হয়, এ ব্যাপারে শয়তান কোরআন অধ্যয়নকারীর প্রতি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ জন্য কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে শয়তানের প্রতারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং সে পদ্ধতিও আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা নাহ্লের ৯৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবং যে কথা বলে বান্দা আশ্রয় প্রার্থনা করবে সে কথাটি হলো—

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অভিশপ্ত শয়তানের প্রতারণা থেকে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

কোরআন শোনার ক্ষেত্রে সতর্কতা

এ কোরআন যখন পাঠ করা হবে, তখন শ্রোতারা কিভাবে কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে—

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

যখন কোরআন তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তা খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো, সম্ভবত তোমাদের প্রতিও রহমত অবতীর্ণ হবে। (আ'রাফ-২০৪)

মানব জাতির জন্য কোরআনের মোকাবেলায় শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আর দ্বিতীয়টি নেই। এই কোরআন যারা অধ্যয়ন করে বুঝে অনুসরণ করবে, তারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। মুসলমানগণ নামাজে প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সত্য সহজ সরল পথ কামনা করে। আর মানুষের এ কামনার জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা পরিপূর্ণ কোরআন তার সামনে পেশ করেন।

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ আল্লাহর দাসত্ব করবে, এটাই সহজ সরল পথ। (সূরা ইয়াছিন)

মুক্তির সোপানে পৌঁছে দেয় এই কোরআন। আল্লাহর কোরআন যেন মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়, এ জন্য শয়তান তার মুরীদদের সাথে নিয়ে কোরআন শোনার পরিবেশ বিঘ্নিত করে। আল্লাহর কিতাব যাতে মানুষের কানে পৌঁছতে না পারে, শয়তান সে ব্যবস্থা করতে থাকে। এ গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তান শুধু ইবলিসই নয়–মানুষের শত্রু এক শয়তান, জ্বিন শয়তান ও মানুষের ভেতরেও শয়তান রয়েছে। এই চার ধরনের শয়তান একযোগে প্রচেষ্টা চালায় যেন কোরআন কোন মানুষ শুনতে না পারে। আল্লাহর এ কিতাব শোনা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে এসব শয়তান এক শ্রেণীর মানুষকে এভাবে ধোকা দিয়ে থাকে যে, কোরআন হলো আল্লাহর বাণী। আর আল্লাহর বাণী বড়ই জটিল, এটা বুঝতে হলে যে জ্ঞান ও যোগ্যতা প্রয়োজন–তা আমাদের নেই। অতএব সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে কোরআন বুঝা যাবে না। অতএব কোরআনের [illegible] তাফসীর পড়াও যাবে না–করাও যাবেনা।

এভাবে শয়তান এক শ্রেণীর নামাজী লোকদেরকে কোরআন বুঝা থেকে দূরে রাখে। আরেক শ্রেণীর মানুষকে শয়তান এভাবে ধোকা দিয়ে থাকে, কোরআন হলো আরবী ভাষায় অবতীর্ণ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থ অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করলেও এর সঠিক মর্মার্থ অপ্রকাশিতই থেকে যায়। সুতরাং পরিবর্তিত ভাষায় কোরআন অধ্যয়ন করে কোন লাভ নেই। আরবীতে তিলাওয়াত করলেই প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমলনামায় দশ দশটি করে সওয়াব লেখা হতে থাকবে। অতএব আরবী ভাষার কোরআন আরবীতেই তেলাওয়াত করে সওয়াব অর্জন করতে হবে, অন্য ভাষায় তা পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। এভাবে শয়তান সওয়াবের লোভ দেখিয়ে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা করে।

শয়তান আবার এভাবে ধোকা দেয় যে, কোরআন হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থ সুমধুর সুরে পাঠ করলে সওয়াব অর্জন করা যায়। শুনলেও সওয়াব হয়। নামাজে তা পাঠ করতে হবে। প্রতিদিন সকালে ফজরের নামাজ আদায় করে তেলাওয়াত করলে সওয়াবে আমলনামা পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু এ গ্রন্থ যে শিক্ষাদর্শ মানুষের সামনে পেশ করেছে, তা ঐ যুগে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যখন

তা অবতীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে পৃথিবীর সার্বিক অবস্থা বড়ই জটিল। এখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা অবস্থান করছে। কোরআনের বিধান এ অবস্থায় প্রয়োগ করতে গেলেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে। ফলে পৃথিবীতে হানাহানি সৃষ্টি হবে। সুতরাং, বর্তমানের এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুসারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত করতে হবে। কোনক্রমেই রাজনীতির অপবিত্রতার অঙ্গনে কোরআনের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থকে টেনে এনে অপবিত্র করতে দেয়া হবে না।

এভাবে শয়তান কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করার ব্যাপারে মানুষকে বিরত রাখে। কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হলে অসংখ্য মানুষ তা শুনতে যায়। এ মাহফিল যেন অনুষ্ঠিত হতে না পারে, এ জন্য শয়তান তার অনুগতদের দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার শয়তান কোরআনের মাহফিলে মানুষ যেন যেতে না পারে, সে পথেও নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে। যারা বাধাতিক্রম করে মাহফিলে যায়, তারাও যেন মনোযোগের সাথে কোরআন শুনতে না পারে, এমন অবস্থা তাদের ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়।

এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আ'রাফে বলেছেন, আমার কোরআন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যিনি তোমাদেরকে কোরআন শোনাচ্ছেন, তোমার পূর্ণ চেতনা একমাত্র তাঁর দিকেই নিবিষ্ট করে কোরআন শোনো। যখন আমার কিতাব থেকে তোমাদেরকে শোনানো হয়, তখন এমন পরিবেশের সৃষ্টি করো না, যাতে আমার বাণী অনুধাবন করতে কোন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। কোরআন অনুধাবন করে যারা সত্য পথ লাভ করেছে, আমার রহমত তাদের ওপরে বর্ষিত হচ্ছে। তুমিও কোরআন শুনে সত্য পথ লাভ করে আমার রহমতের অংশ নিতে পারো।

কোরআন স্পর্শ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা

আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং তাঁর বাণীও পবিত্র। তাঁর বাণী সম্বলিত পবিত্র কোরআন কোন অবস্থাতেই অপবিত্র শরীরে স্পর্শ করা যাবে না। এ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব স্পর্শ করতে হলে স্পর্শকারীকে অবশ্যই শরীর ও পোষাকের দিক দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এ কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে সূরা ওয়াকীআয় বলা হয়েছে—

اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ - لَّا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

প্রকৃতপক্ষে এটা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কোরআন। একটি সুরক্ষিত গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ, যা পবিত্রতম সত্তা (ফেরেশ্তাগণ) ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। এটা রাব্বুল আলামীনের অবতীর্ণ করা।

আল্লাহর এই কোরআন এক নিখুঁত মাত্রায় পরস্পর সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ জীবন বিধান হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে চরিত্র, ইবাদাত, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন ও আদালত, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি তথা মানব জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ; বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা-বিধান দান করা হয়েছে। এ কোরআনে কোন একটি জিনিসও অপর কোন একটি জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন ও অসামঞ্জস্যমূলক নয়। এ কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা অবিচল; অপরিবর্তনীয় এবং এর সম্মান ও মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে তা অপবিত্রাবস্থায় পাঠ করা দূরে থাক, স্পর্শ করার অনুমতিও দেয়া হয়নি।

মানুষকে অপবিত্রতা মুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়নি। পক্ষান্তরে আল্লাহর ফেরেশতাগণ যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এ কোরআনে ফেরেশতাদের সত্তা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে 'পবিত্রতম সত্তা'। তাঁরা এ কোরআন যখন তখন স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু এই মানুষের দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে অপবিত্রতা। তা দেহের বাইরে নির্গত হলে কোন সময় মানুষের ওপরে গোসল ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন অপিবত্রতা দেহ থেকে বাইরে এলে অজু করা আবশ্যক হয়। এ জন্য এসব অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে, পবিত্র স্থানে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে। এ বিষয়ে একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শয়তান স্বয়ং অপবিত্র এবং সে অপবিত্রতা পছন্দ করে। কোরআনের পাঠককে সে যদি অপবিত্র অবস্থায় পায়, তাহলে অতি সহজে সে তাকে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়। এ জন্য আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন কালে পবিত্রতা অর্জনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

কোরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে

পবিত্র কোরআন যে মহামানবের ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁকে এ কিতাবের পঠনরীতিও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এ কিতাব যাঁর বাণী তিনিই তাঁকে তা পাঠ করার উপযুক্ত রীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল যে পদ্ধতিতে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, তা ছিল মহান আল্লাহর শিখানো এবং সহীহ শুদ্ধ রীতি। ঐ একই রীতিতে কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে পবিত্র কোরআনের অনুসারীদেরকে। আল্লাহর রাসূল কখনো দ্রুত গতিতে কোরআন তিলাওয়াত করতেন না। তিনি এমন রীতিতে তেলাওয়াত করতেন যে, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট বুঝা যেত। তাঁর তিলাওয়াত শুনে পাঠক অনুভব করতে পারতো, আল্লাহ তা'য়ালা কি বলছেন। আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত শুনে শ্রবণকারী প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিলাওয়াতের রীতি যদি এমন হয় যে, শ্রোতা রীতিমতো বিরক্তি বোধ করে অথবা তা অস্পষ্ট, এভাবে কোরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। এ কিতাব তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূল প্রদর্শিত রীতিই অনুসরণ করতে হবে।

বুঝে স্পষ্ট উচ্চারণে কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে, আল্লাহ কি বলছেন, তা তিলাওয়াতকারী যেমন বুঝতে পারে এবং তার ওপরে যেন প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, এমন কোন আয়াত পাঠ করা হচ্ছে, যে আয়াতে আল্লাহর মূল সত্তা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সে আয়াত তিলাওয়াত করার কালে মহান আল্লাহর বিরাটত্ব ও মহানত্ব তিলাওয়াতকারীর হৃদয়-মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

আবার যে আয়াতে আল্লাহর রহমত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, সে আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহর শোকরের আবেগে মন-মানসিকতা উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। এভাবে যে আয়াতে আযাবের কথা বলা হয়েছে, তা পাঠ করার কালে হৃদয়ে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। এক কথায় কোরআন পাঠ করার বিষয়টি যেন শুধুমাত্র শব্দের উচ্চারণ ও ধ্বনি তোলার মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখে তেলাওয়াত গভীর চিন্তা-ভাবনা, অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করা পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল কিভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, এ ব্যাপারে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জানিয়ে ছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল প্রতিটি শব্দ টেনে দীর্ঘ করে পাঠ করতেন। তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির

রাহিম এমনভাবে পাঠ করতেন যে, আল্লাহ্ রাহমান ও রাহীম এই শব্দগুলো খুব বেশী টেনে টেনে পাঠ করতেন। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহর রাসূল কিভাবে কোরআন পাঠ করতেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন, আল্লাহর রাসূল এক একটি আয়াত পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করতেন এবং প্রতি আয়াত পাঠ করে থামতেন। যেমন আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পাঠ করে থামতেন। তারপর আর রাহমানির রাহীম পাঠ করে থামতেন। এর পরে পাঠ করতেন মালিকি ইয়াওমিদ্দিন।

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে; হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একটি শব্দ সুস্পষ্ট উচ্চারণ সহকারে পাঠ করতেন। হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি রাতে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন দেখলাম তিনি কোরআন এমনভাবে পাঠ করছেন যে, যেখানে আল্লাহর প্রশংসা করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি প্রশংসা করছেন। যেখানে দোয়া চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি দোয়া করছেন। যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় লাভের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতেন।

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন রাতে আল্লাহর রাসূল নামাজে কোরআন পাঠ করছিলেন। তিনি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হে আল্লাহ! তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও, তাহলে তুমি তা দিতে সক্ষম। কারণ তারা তো তোমারই বান্দাহ্ মাত্র। আর তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা করার ক্ষমতা তোমারই ইখতিয়ারে। কেননা তুমি তো সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী। তিনি এই আয়াতটি বার বার পড়তে লাগলেন। আর এভাবে প্রভাত এসে গেল।

অনেকে যেমন এক নিঃশ্বাসে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে থাকেন। রাসূল কখনো এমন করতেন না। তিনি প্রতিটি আয়াতের শেষে বিরতি দিয়ে

তারপর পরবর্তী আয়াত পাঠ করতেন। এর ফলে শ্রোতারা বুঝতে পারতো, কি পাঠ করা হচ্ছে এবং সে আয়াতে আল্লাহ্ কি বলছেন তার মনে কোরআনের প্রভাব সৃষ্টি হতো।

শেষ রাত কোরআন বুঝার উত্তম সময়

অধ্যয়ন, সাধনা ও অনুধাবনের উপযুক্ত পরিবেশ হলো নির্জনতা। একাজগুলো নির্জন পরিবেশ ব্যতীত সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন হতে পারে না। জনকোলাহলপূর্ণ পরিবেশে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না। এ জন্য উল্লেখিত কাজগুলো সম্পাদন করার উপযুক্ত পরিবেশ হলো রাতের নির্জনতা। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ জন্য রাতকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দান করেছেন। রাতে নামাজ আদায় ও কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا–

প্রকৃতপক্ষে রাতে শয্যা ত্যাগ করে ওঠা আত্মসংযমের জন্য অত্যন্ত বেশী কার্যকর এবং কোরআন যথাযথভাবে পাঠ করার জন্য যথার্থ। (সূরা মুয্যাম্মিল-৬)

যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সম্পাদন করা হবে, সে কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। কাজের ভেতরে যদি প্রদর্শনেচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল করার প্রশ্নই ওঠে না। কিয়ামতের ময়দানে এমন অনেক শহীদকে দেখা যাবে, সে জিহাদের ময়দানে জীবন দান ঠিকই করেছে, কিন্তু তার শাহাদাত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিল না। তার মনে এ উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল যে, মানুষ তার বীরত্ব দেখবে, তার মৃত্যুর পরে তাকে জাতিয় হিরো হিসাবে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে, এ উদ্দেশ্যেই সে জিহাদের ময়দানে জীবন দান করেছিল। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি তো আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন দান করোনি, তুমি জীবন দিয়েছিলে তোমার সুনাম বৃদ্ধি করার আশায়। তোমার মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে মানুষ তোমার সুনাম করেছে। সুতরাং, তুমি তোমার প্রাপ্য লাভ করেছো। আজ তোমার প্রাপ্য হলো জাহান্নাম।

এভাবে অনেক নামাজীকে, রোজা পালনকারীকে, হজ্জ আদায়কারীকে, দানকারীকে বলা হবে, লোকে তোমাকে নামাজী বলবে, পরহেজগার বলবে, হাজী সাহেব

বলবে, এসব লক্ষ্যে তুমি নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করেছো। দানবীর উপাধি লাভের আশায় দান করেছো। তোমার কোন কাজ আমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছিল না। সুতরাং আজ আমার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য কিছুই নেই।

মহান আল্লাহ রাতকে এ জন্য বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, রাতের নির্জনতায় আরামের শয্যা ত্যাগ করে মানুষ যখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সেজদা দেয়, সে সেজদার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা থাকে না। নির্জন নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশে আল্লাহর কিতাব বান্দাহ যখন পাঠ করে আল্লাহকেই শোনায়, তখন সে পাঠের ভেতর দিয়ে এক অনাবিল জান্নাতী আবেশের সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া কোরআন অধ্যয়নের জন্য রাতই উপযুক্ত সময়। এ সময়ে কানে কোন কোলাহল আসে না, পৃথিবীতে জীবন ধারণ করার কোন উপকরণের চিন্তায় মনভারাক্রান্ত থাকে না। মন-মস্তিষ্ক থাকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত-উন্মুক্ত। আল্লাহর কোরআন এ সময়ে অধ্যয়ন করে অনুধাবন করার তখনই উপযুক্ত সময়। রাতের ইবাদাতের মর্যাদাও আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। রাতে নামাজের জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ।

গোটা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ-মন এ সময় বিশ্রাম কামনা করে। এ সময়ে দেহ-মনকে বিশ্রাম লাভের সুযোগ না দিয়ে নামাজ আদায়-কোরআন তেলাওয়াত অবশ্যই সাধনার বিষয়। এ সাধনা মানুষের কুপ্রবৃত্তি দমন করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি প্রবল কার্যকর পন্থা সন্দেহ নেই। এভাবে যে ব্যক্তি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজের দেহ-মনের ওপর প্রবল প্রতিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে, নিজের যাবতীয় শক্তিমত্তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি সর্বাধিক দৃঢ়তার সাথে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হতে এবং পৃথিবীর বুকে এ আন্দোলনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ভূমিকা রাখতে পারে।

রাতের নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির একটি কার্যকর পদ্ধতি। কারণ গভীর রাতে বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধক ও অন্তরাল সৃষ্টিকারী কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। এ সময়ে বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা বলে, তা তার হৃদয়ের অতল তলদেশ থেকে উত্থিত কথাগুলোই বলে থাকে। এসবে কোন ধরনের প্রদর্শনেচ্ছার স্পর্শ থাকে না। রাতের ইবাদাত হলো মানুষের বাইরের চরিত্র আর ভেতরের প্রকৃত চরিত্রে সামঞ্জস্যতা সৃষ্টির

উৎকৃষ্ট মাধ্যম। ব্যক্তি দিনের আলোয় মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজে, কোরআন তেলাওয়াতে সময় ব্যয় করতে পারে। কিন্তু গভীর রাতে যখন সবাই গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন থাকে, তখন ব্যক্তি সবার অগোচরে কোরআন তেলাওয়াত করে, নামাজ আদায় করে, এগুলো সে করে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই।

দিনের নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত রাতের নামাজ–কোরআন তেলাওয়াতের তুলনায় অনেক সহজ। ঘুমে দু'চোখ যখন বন্ধ হয়ে আসতে চায়, দেহ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চায়, এমন নিদ্রাকে উপেক্ষা করে মানুষ যখন নামাজে–তেলাওয়াতে নিমগ্ন হয় এবং এটা যদি অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মানুষের ভেতরে অবিচলতা ও স্থিতিশীলতার গুণাবলী সৃষ্টি হয়। দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে সে অধিক দৃঢ়তা সহকারে এগিয়ে যেতে থাকে। বাতিল সৃষ্ট যাবতীয় কঠিন পরিস্থিতি, সে অবিচলতা ও দৃঢ়তার সাথে [illegible] করতে সক্ষম হয়।

কোরআন [illegible]

মানুষ যে কোন [illegible] কেন, সে কর্মের একটি ফল অবশ্যই সে লাভ করে থাকে। যে [illegible] কোনো [illegible] করা যাবে না, জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন কোনো মানুষের [illegible] করা সম্ভব হয় না। মানুষ তার শ্রমের বিনিময় লাভ করবে, [illegible] নিয়েই সে শ্রমদান করে থাকে। অনুরূপ আল্লাহর কোরআন তিলাওয়াতকারী ও নামাজ আদায়কারী যদি তিলাওয়াত ও নামাজের মাধ্যমে কোন ফল লাভ না করে, তাহলে এটা বুঝতে হবে, তার কোরআন তিলাওয়াত ও নামাজ আদায় যেমনভাবে হওয়া উচিত, তেমনভাবে হচ্ছে না। ইসলাম বিরোধী [illegible] নির্যাতনের মুখে ইসলামী আন্দোলনের [illegible] শক্তি [illegible] মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হয়। তার একটি যথাযথভাবে নামাজ আদায় এবং অপরটি কোরআন অধ্যয়ন।

কারণ নামাজ ও কোরআন আন্দোলনের কর্মীদেরকে এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নত অনুপম যোগ্যতার অধিকারী করে গড়ে তোলে এমন শক্তি তার ভেতরে সঞ্চারিত করে, যে শক্তির সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল কঠোরতা ও নির্যাতনের মোকাবেলায় শুধু টিকেই থাকে না, বাতিলের গতিকে স্তব্ধ করে দিতেও সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ এ শক্তি তখনই অর্জন করতে পারে, যখন সে কোরআনের শব্দগুলো পাঠ করেই ইতি-কর্তব্য পালন করে না,

বরং কোরআন প্রদর্শিত শিক্ষাসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত হয়। কোরআনের শিক্ষা তার দেহের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত করে। নামাজের বিষয়টিও ঠিক তেমনি। একটার পর আরেকটা সেজদা আর শারীরিক কসরতের মধ্যে নামাজকে সীমাবদ্ধ না রেখে যারা নামাজের শিক্ষাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে, তখনই নামাজ তার ভেতরে শক্তি সৃষ্টি করে। এই শক্তির বলেই সে আল্লাহর পছন্দের বিপরীত পথ থেকে নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম হয়।

কোরআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে তার মনের গহীনে যদি পৌঁছতে না পারে, তার হৃদয়তন্ত্রীতে যে তিলাওয়াত আঘাত করতে সক্ষম হয় না তাকে জিহাদের ময়দানে বাতিল শক্তির মোকাবিলায় ঐ তিলাওয়াত শক্তি সরবরাহ করা তো দূরের কথা, তার ঈমান ঠিক রাখায় শক্তিই সরবরাহ করতে সক্ষম হয় না। এ ধরনের কোরআন তিলাওয়াতকারীগণ মানুষের কাছে পরহেজগার হিসাবে সুনাম অর্জন করলেও সে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি মোটেও অর্জন করতে সক্ষম হয় না। এই শ্রেণীর কোরআন তিলাওয়াতকারী সম্পর্কেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يقرأون القرآن ولايجاوز حناجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية-

তারা কোরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে অবতরণ করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনভাবে ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। (বোখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

প্রকৃতপক্ষে যে তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের পরে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, মন মানসিকতা বাস্তব জীবনে চরিত্র ও কর্মনীতিতে কোরআনের কোন প্রভাব দেখা যায় না; কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না, কোরআনের বিপরীত কোন কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে না, আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না, কোরআন যা হালাল করেছে, তা হালাল বলে গ্রহণ করে না, কোরআন যা হারাম করেছে, তা থেকে বিরত থাকে না, কোরআনের বিপরীত রাজনীতি ত্যাগ করে না, কোরআন যাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করে না,

একজন মুসলমানের কোরআন তেলাওয়াত–অধ্যয়ন এমন হতে পারে না। হযরত সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেন–

ما امن بالقران من استحل محارمه–

কোরআন কর্তৃক হারাম জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে, সে কোরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।

যারা কোরআন তেলাওয়াত–অধ্যয়ন ও কোরআনের তাফসীর শোনার পরেও নিজেদের চরিত্র সংশোধন করতে সক্ষম হয়নি, আত্মিক উন্নতি হয়নি, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা করেনি, তাদের তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন কোরআনের প্রতি বিদ্রূপ করার শামিল। এ ধরনের লোকগুলো আল্লাহর মোকাবেলায় যেমন নিজেদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে তেমনি নিজেদের বিবেকের কাছেও চরম নির্লজ্জ হিসাবে নিজেকে প্রকাশিত করে। এ লোকগুলোর চরিত্র বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ যে ব্যক্তি এ কিতাবকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকৃতি দেয় এবং তা পাঠ করে কোরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়, তারপরও সে আল্লাহর পছন্দের বিপরীত কর্মকান্ডে জড়িত হয়, সে তো সরাসরি আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এরা আল্লাহর কোরআনে পাঠ করেছে–

اَفَغَيْرَدِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَه اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ طَوْعًاوَّ كَرْهًاوَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ–

মানুষ কি আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে অন্য বিধান অনুসন্ধান করে ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সবই স্বেচ্ছায় হোক এবং অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে)। আর তাঁরই দিকে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা ইমরাণ)

কোরআন তিলাওয়াত করছে, অধ্যয়ন করছে–জানতে পারছে এটা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তারপরও এ লোকগুলো কোরআনের বিপরীত মতবাদ মতাদর্শের অনুসরণ করছে, সেসব মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোকে সহযোগিতা করছে; এরা তো আল্লাহর মোকাবিলায় বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে। না জানার কারণে এমন করছে না বরং জেনে বুঝেই এরা এই ভূমিকা পালন করছে। এদের সম্পর্কে সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ-

নিশ্চিত জেনো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততটাই অসম্ভব, যতটা অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উটের গমন।

কিয়ামতের ময়দানে আদালতে আখিরাতে স্বয়ং কোরআান এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়টিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বক্তব্যে এভাবে উপস্থাপন করেছেন- القرآن حجة لك او عليك- কোরআান তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। (মুসলিম)

আল্লাহর এ কিতাবকে যদি যথাযথভাবে তেলাওয়াত করা হয়; অধ্যয়ন করে তা অনুসরণ করা হয় তাহলে এ কোরআান তার জন্য সাক্ষী ও প্রমাণ হয়ে দেখা দেবে। পৃথিবী থেকে আখিরাত পর্যন্ত চলার পথে যেখানে তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, সেখানেই কোরআান তার জন্য সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। কোরআানের তেলাওয়াতকারী ও অধ্যয়নকারী বলতে সক্ষম হবে, পৃথিবীতে আমি যে কাজই করেছি তা এই কিতাবের নির্দেশেই করেছি। যদি মানুষের কাজ প্রকৃতপক্ষেই কোরআানের আদর্শ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীতেও কোন ইসলামী বিচারক তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না এবং আখিরাতের ময়দানেও তাকে গ্রেফতার করা হবে না।

আর যে ব্যক্তি এই কোরআান থেকে জেনেছে, তাকে কোরআানের বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে চলতে হবে, কোরআানের রাজনীতি করতে হবে; কোরআান পরিবেশিত অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে, কোরআানের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কোরআানের বিচার নীতি অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করতে হবে। এসব জেনেও যে ব্যক্তি কোরআান বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করবে, তখন এ কোরআান সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহর বিচারালয়ে এ কোরআান তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাকে আরো শক্তিশালী করবে। পরিশেষে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে।

কোন রাসূলেরই এ শক্তি ছিল না

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে যেসব মহামানবদেরকে নবী-রাসূল হিসাবে নির্বাচিত করেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করার মুহূর্তকাল পূর্বেও তাঁদের কল্পনাতেও আসেনি, তাঁরা নবী-রাসূল হিসাবে মনোনীত হতে যাচ্ছেন। সুতরাং, তাঁদের নিজস্ব কোন শক্তি বা ক্ষমতা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তাঁরা ইচ্ছা করলেই মানুষকে কোন ধরনের নিদর্শন দেখাতে পারেন না। আল্লাহ বলেন-

وَمَاكَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ-

আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত নিজেই কোন নিদর্শন এনে প্রদর্শন করবে, কোন রাসূলেরই এ শক্তি ছিল না। (সূরা আর-রা'দ-৩৮)

পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ হলো তখন এর বিধি-বিধানের মধ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীর দল নিজেদের মৃত্যু দেখতে পেলো। তখন তারা নবীজীর কাছে দাবীনামা পেশ করলো যে, এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোন কোরআন নিয়ে এসো অথবা এসব বিধান পরিবর্তন করো। সূরা ইউনুসের ১৫ নং আয়াতে বা হয়েছে-

قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْبَدِّلْهُ-قُلْ مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاىِٔ نَفْسِىْ- اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ-

এরা বলে, এর পরিবর্তে অপর কোন কোরআন নিয়ে এসো অথবা এর মধ্যেই কোন পরিবর্তন সূচিত করো। (হে রাসূল!) তাদেরকে বলো, আমার এ কাজ নয় যে, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নেবো। আমি তো শুধু সেই ওহীরই অনুসারী, যা আমার কাছে প্রেরণ করা হয়।

পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নেই যে, এই কোরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে সক্ষম হয়। এ ক্ষমতা তাঁকেও দেয়া হয়নি, যাঁর ওপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ তা'য়ালা যা অবতীর্ণ করেন, তা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারেই অবতীর্ণ করেছেন। এসব বিধান পৃথিবীর কোন সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা হয় না যে, জনরোষের ভয়ে তা পুনরায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। আল্লাহর ওহী অপরিবর্তনীয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন-কানুন বা জীবন বিধান হিসাবে কোন ওহী আর কিয়ামত পর্যন্ত

অবতীর্ণ হবে না। সুতরাং, এতে কোন পরিবর্তনও সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন–

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

আর এই কোরআন এমন কোন জিনিস নয় যে, আল্লাহর ওহী ও শিক্ষা ব্যতীত রচনা করে নেয়া যেতে পারে। (সূরা ইউনুস–৩৭)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর রাসূল নিজ থেকে বানিয়ে কোন কথা বলেন না; তিনি যা ওহী করেন–রাসূলের মুখ থেকে আল্লাহর বাণী হিসাবে তাই উচ্চারিত হয়। শুধু তাই নয়, এ কথা ধমকের সুরে বলেছেন, আমার রাসূল যদি কোন কথা নিজ থেকে বানিয়ে বলতেন, তাহলে আমি তার কন্ঠনালী টেনে ছিঁড়ে দিতাম। সুতরাং, কোরআনে যে বিধি-বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন রাসূল কর্তৃক সূচিত হবার কোন অবকাশ ছিল না। আর মহান আল্লাহ এমন অক্ষম নন যে, কোন বিধান রচনার জন্য কোন মানুষের সহযোগিতা তাঁর প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং সম্পূর্ণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন–পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী।

কোরআনে পরিবর্তন করা অসম্ভব

মানব জাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী রাসূল প্রেরণ করে তাদের ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, যেন তাঁরা আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারে মানব গোষ্ঠীকে পরিচালিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আগমন করেন। এই ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। তাঁর ওপরে পবিত্র কোরআন মানব জাতির জীবন ব্যবস্থা হিসাবে অবতীর্ণ করা হয়। কোরআনের পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তা যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংরক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় মূল কিতাব বিকৃত হয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে কোরআন অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে নবীজী তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সমকালীন লোকজন থেকে শুরু করে, বর্তমানকাল পর্যন্ত এই কোরআন মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই, যে গ্রন্থ দাড়ি, কমা এবং সেমিকোলনসহ মুখস্থ করে রাখা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ এ

—৩

কোরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অতীতে যেমন অসংখ্য মানুষ এ কোরআন মুখস্থ করে স্মৃতির পাতায় থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন, বর্তমানেও রাখছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যহত থাকবে। মানুষ একটু চেষ্টা করলেই তা মুখস্থ করতে পারে।

এ জন্য কোরআনের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে প্রচার মাধ্যমে কোন একজন কোরআন তেলাওয়াত করছে, যদি সে কোথাও সামান্য একটু ভুল করে, তাহলে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বসে শ্রবণরত হাফেজে কোরআন তা শোনার সাথে সাথে বুঝতে পারবে, তিলাওয়াতকারী অমুক স্থানে ভুল উচ্চারণ করেছে। পরক্ষণেই গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাফেজে কোরআনগণ সেই তিলাওয়াতকারীকে জানিয়ে দেবে, অমুক আয়াতে সে ভুল উচ্চারণ করেছে বা তিলাওয়াতের সময় অমুক শব্দ বাদ পড়েছে। এভাবে পবিত্র কোরআন অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর কিতাব পাঠ করার একটি নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে। সে নিয়মটি হলো, কোরআন যে ভাষায় যে ভঙ্গীতে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় এই কিতাব তিলাওয়াত করা যাবে না। এ কিতাব যে কোন ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে, যে কোন ভাষার মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোরআনের অবিকৃত আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তা তিলাওয়াত করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

এই সুযোগ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে করে দেয়া হতো, তাহলে এ কিতাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার সুযোগ থাকতো। যে কোন ধরনের বিকৃতি থেকে হেফাজত করার লক্ষ্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সূরা হিজর-এ আল্লাহ বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ–

আর বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করেছি, তিনি তা স্বয়ং রচনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তোমরা যারা আমার কিতাবের বিরোধিতা করছো, জেনে রেখো, এতে করে আমার এ কিতাবের কোন

ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না। এ কিতাব প্রত্যক্ষভাবে আমার হেফাজতে রয়েছে। গোটা পৃথিবীতে যারা তোমরা কোরআন বিরোধী রয়েছো, তারা সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালেও আমার কিতাবকে বিলুপ্ত করতে পারবে না। তোমরা একে কোণঠাসা করে রাখতে চাইলেও তা পারবে না। তোমাদের আপত্তি, নিন্দাবাদ, মিথ্যা প্রচার–প্রচারণার কারণেও আমার কিতাবের সম্মান-মর্যাদা বিন্দুমাত্র কমবে না। তোমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মুখেও এ কোরআনের আন্দোলন থেমে থাকবে না। এ কোরআনকে কোনক্রমেই তোমরা বিকৃত বা এর ভেতরে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে সক্ষম হবে না।

কোরআন কিভাবে গ্রন্থবদ্ধ হলো

প্রথম দিকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে বলা হয় সাবিকুনাল আওয়ালিন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদেরকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, সহায়-সম্পদ হারাতে হয়েছে, আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। এভাবে একের পর এক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁদের ঈমানী শক্তি বিকশিত হয়েছিল এবং দৃঢ়তা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামের সোনালী দিনে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে কোন ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়নি বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। ফলে যে পরিবেশে ঈমানী শক্তি বিকশিত হয় এবং দৃঢ়তা লাভ করে, সে পরিবেশ তাঁরা পাননি।

এ জন্য যুক্তি সংগত কারণেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ দুটো দলের সম্মান ও মর্যাদা সমপর্যায়ের হয়নি। এরপর আরেকটি দল ছিল ইতিহাসে যাদেরকে তোলাকা বলা হয়েছে। তোলাকা মানে হচ্ছে, মক্কার এমন এক বংশ, যারা শেষ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিল। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মুআবিয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামও সেই ক্ষমাপ্রাপ্ত বংশের লোক ছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন, তারপর থেকেই এই তোলাকাদের মধ্য থেকে এবং আরবের অন্যান্য এলাকার কিছু লোকজন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিলো। এদের এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাসূলের সাহাবাগণকে যুদ্ধের মুখোমুখী হতে হয়েছিল।

এসব যুদ্ধে পবিত্র কোরআনের অসংখ্য হাফিজ শাহাদাত বরণ করেছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, যে সময়ে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে অসংখ্য সাহাবা শাহাদাত বরণ করলেন। তারপর আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হয়ে দেখলাম ওমরও সেখানে উপস্থিত আছেন। আবু বকর আমাকে বললেন, ওমর আমার কাছে এসেছে এবং পরামর্শ দিচ্ছে, ইয়ামামার যুদ্ধে কোরআনের অসংখ্য কারী (যাদের কোরআন মুখস্থ ছিল এবং মানুষকে তা পড়ে শোনাতেন এবং শিক্ষা দিতেন) শহীদ হয়েছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, অন্যান্য যুদ্ধেও যদি কোরআনের কারীগণ শাহাদাত বরণ করেন, তাহলে কোরআনের বিরাট অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ জন্য আমার রায় হচ্ছে এই যে, আপনি কোরআনকে একত্রিত করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহর কোরআনের অধিক সংখ্যক হাফিজগণ শহীদ হয়ে যাবার পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চিন্তা করেছিলেন, এভাবে যদি তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে থাকেন, তাহলে তো একদিন গোটা কোরআনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট যা টিকে থাকবে, তাতেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটতে পারে। এ জন্য তিনি শুধু স্মৃতির পাতায় কোরআন সংরক্ষণের একমাত্র ব্যবস্থার সাথে সাথে কাগজের পাতায় তা লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সে লক্ষ্যেই তিনি খলীফাতুর রাসূলের কাছে নিজের মতামত দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছিলেন।

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ওমরের কথা শুনে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, আল্লাহর রাসূল যে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি, সে কাজ আপনি কিভাবে করতে পারেন?

হযরত ওমর বললেন; আল্লাহর শপথ! এটা খুবই উত্তম কাজ। এভাবে তিনি যুক্তি উত্থাপন করতে থাকেন। হযরত আবু বকরের মধ্যে প্রথম দিকে কিছুটা দ্বিধা সংকোচ থাকলেও পরে তিনি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হযরত আবু বকর বলেন, পরবর্তীতে আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজের জন্য আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন। ওমরের মতামতের সাথে আমার অভিমত মিলে গেল।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ব্যক্তিগত সচিব। তিনি বলেন, খলীফাতুর রাসূল আমাকে বললেন, বয়সে তুমি নবীন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দান করেছেন। তুমি রাসূলের ওহী লেখার কাজেও নিয়োজিত ছিলে। তোমার দায়িত্ব হলো, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কোরআনের অংশসমূহ একত্র করা।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি যদি আমাকে পাহাড় তুলে আনার নির্দেশ দিতেন তাহলে এটা আমার কাছে এতটা কঠিন মনে হতো না—যতটা কঠিন মনে হচ্ছে তার এই কাজের নির্দেশ। আমি আবেদন করলাম, আপনি এ কাজ কেমন করে করবেন যা রাসূল করেননি?

তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ! এটা বড়ই উত্তম কাজ। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে এই মহান কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। আল্লাহর রাসূলের ওপর যখন যে ওহী অবতীর্ণ হতো, তা স্বয়ং রাসূলের নির্দেশে লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেসব অংশ জমা করা হলো। সাহাবাদের ভেতরে যার কাছে কোরআনের যে অংশ বা সম্পূর্ণ কোরআন পাওয়া গেল, তাও জমা করা হলো। সে সময় পর্যন্ত কোরআনের হাফিজ যাঁরা ছিলেন, তাদের কাছ থেকে যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করা হলো। এভাবে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা, সন্দেহ সংশয়ের সম্ভাবনা মুক্ত হয়ে আল্লাহর কোরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজে হাত দেয়া হলো। আল্লাহর কিতাব গ্রন্থাবদ্ধ করার পূর্বে এর প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে তাঁদেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো, যাঁদের সামনে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যাঁরা তা কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন ও ওহী লিখতেন।

সময়ের ব্যবধানে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন কোরআনকে লিখিত একটি গ্রন্থের রূপ দেয়া সম্ভব হলো, তখন সেটা খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছেই রাখা হলো। তাঁর ইন্তেকালের পরে তা রাখার দায়িত্ব পালন করেছিলেন দ্বিতীয় খলীফা স্বয়ং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁর শাহাদাতের পরে তাঁরই কন্যা উম্মুল মুমিনীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে আমনত রাখা হলো। লোকজনকে এ অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা সে

কোরআন দেখে নিজের কাছে রক্ষিত কোরআনের সাথে তা মিলিয়ে নিতে পারে, সেটা নির্ভুল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে। আল্লাহর এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কার কুরাইশদের ব্যবহৃত আরবী ভাষায়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষার উচ্চারণ গোটা দেশে এক ধরনের নয়। এক একটি এলাকায় তা উচ্চারণগত দিক দিয়ে পৃথক ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। গোটা আরবের ভাষা আরবী হলেও তা বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আরবের আরবী ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলে তখন যেমন পার্থক্য ছিল বর্তমানেও তেমনি পার্থক্য বিদ্যমান।

একই বিষয়বস্তু আরবের এক এলাকায় এক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়, আবার অন্য এলাকায় তা ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণে বর্ণিত অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। সাত হরফ বলতে হাদীসে এ বিষয়টিকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, কোরআন যদিও কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত বাকরীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু আরববাসীদের স্থানীয় উচ্চারণ ভঙ্গী ও বাকরীতিতে তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

একজন আরবী ভাষী লোক যখন আল্লাহর এই কিতাব পাঠ করে তখন ভাষার স্থানীয় পার্থক্য বর্তমান থাকার পরও অর্থ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। কোরআনে নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ হয়ে যায় আবার বৈধ বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে যায় না, আল্লাহর একত্ব তথা তাওহীদের বর্ণনা পরিবর্তিত হয়ে শিরক মিশ্রিত হয় না।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে—হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে সূরা ফোরকান পাঠ করতে শুনলাম। কিন্তু আমি যেভাবে সূরাটি পাঠ করে থাকি, তার সাথে হিশামের পাঠে গরমিল লক্ষ্য করলাম। তখন আমি তার চাদর ধরে টানতে টানতে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। রাসূল আমাকে আদেশ করলেন আমি যেন তাকে ছেড়ে দিই, তখন আমি রাসূলের নির্দেশ পালন করলাম। রাসূল তাকে সূরা ফোরকান পাঠ করতে বললেন, আমি যেভাবে তার মুখে পাঠ শুনেছিলাম, রাসূলের সামনেও তিনি সেভাবে পাঠ করলেন। রাসূল শুনে কোন আপত্তি না করে বললেন, কোরআন সাত হরফে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে পাঠ করা সহজ সেভাবেই পাঠ করো।

এরপর সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আল্লাহর ইসলাম আরব সাম্রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। অসংখ্য অনারব ইসলাম কবুল করে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকলো। এসব অনারবদের শিক্ষক ছিলেন আরবরাই। এসব শিক্ষকদের আরবী উচ্চারণ ভঙ্গী পৃথক ছিল। তাঁরা যাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তাঁদের পৃথক উচ্চারণ ভঙ্গীতেই তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বিষয়টি বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অনারব মুসলমান ও আরব মুসলমানদের মেলামেশার ফলে আরবী ভাষা অনারবদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছিলো।

ফলে যে যার মতো আঞ্চলিক উচ্চারণে কোরআন পাঠ করতে থাকলে অনারব নও মুসলিমদের মনে কোরআন সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হওয়া অসম্ভবের কিছু ছিল না। তারপর এ ধরনের সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছিল যে, এক এলাকার সাহাবী নামাজে কোরআন তিলাওয়াত করছেন তাঁর আঞ্চলিক উচ্চারণে, অন্য এলাকার সাহাবী তা শুনে সন্দেহে পড়ে যেতেন। যেমনটি হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমসহ অনেকের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আল্লাহর কালাম অপরিচিত উচ্চারণ ও ভঙ্গীতে পাঠ করা নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভবের কিছু ছিল না। তারপর এ পার্থক্য অদূর ভবিষ্যতে মৌলিক বিকৃতি সৃষ্টি করতো না, এ নিশ্চয়তা ছিল না।

এ ধরনের নানা আশঙ্কা দেখা দেয়ার ফলে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রবীন সাহাবা–যাদেরকে সাবিকুনাল আওয়ালীন বলা হয়, তাঁদেরকে নিয়ে বৈঠক করে সবার ঐক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, খলীফা তুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় যে কোরআন লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেটাই এখন থেকে পঠিত হতে থাকবে। আর অন্য যেসব কোরআন রয়েছে, যা বিভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গীতে পাঠ করা হয়ে থাকে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অবিলম্বে এই আইন কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হলো এবং হযরত আবু বকর কর্তৃক সংকলিত কোরআন মুসলিম জাহানে প্রচার করা হলো। কোরআন অবতীর্ণ হবার সময় যেভাবে তা সুসংবদ্ধ ও উন্নতমানের ছিল, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক সংকলিত কোরআন অনুরূপ তাই ছিল।

এ সম্পর্কে বোখারী শরীফে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আনাস ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান হযরত উসমানের কাছে এলেন। এটা সেই সময়ের কথা, যখন তিনি সিরিয় বাহিনীসহ আরমেনিয়া বিজয়ে ইরাকী বাহিনীর সাথে আযারবাইজান বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লোকদের বিভিন্ন রীতিতে কোরআন পাঠ হযরত হুযাইফাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো। তাই তিনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো আল্লাহর কিতাবে বিভেদ সৃষ্টির পূর্বে আপনি এই জাতিকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করুন।

এরপর হযরত উসমান হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে বলে পাঠালেন, আপনার কাছে যে কোরআন রয়েছে তা আমার কাছে প্রেরণ করুন। আমরা সেটা দেখে কপি করে তা আপনাকে ফেরৎ দেবো। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হযরত সাঈদ ইবনে আ'স এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-এ চারজনকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। তাঁরা হযরত আবু বকর কর্তৃক সংকলিত কোরআন থেকে আরো কয়েকটি কপি প্রস্তুত করবেন।

এই চারজনের মধ্যে কুরাইশ বংশের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হযরত সাঈদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমদেরকে নির্দেশ দিলেন, যদি কখনো কোরাআনের কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের সাথে যায়েদের মতানৈক্য হয়, তাহলে তোমরা কোরআনকে কোরাইশদের বাকরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করবে। কারণ সেই রীতিতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরাই তাঁর নির্দেশ অনুসারে দায়িত্ব পালন করলেন। যখন তাঁরা গ্রন্থাকারে কোরআনের সংকলন প্রস্তুত করলেন, তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক সংকলিত কপিটি হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে ফেরৎ পাঠালেন।

এরপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কোরআনের এক একটি সংকলন ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই সাথে নির্দেশ দিলেন, এই সংকলন ব্যতীত অন্য যতো সংকলন রয়েছে, তা যেন আগুনে জ্বালিয়ে

দেয়া হয়। সুতরাং, বর্তমান সময়ে আমরা যে কোরআন দেখছি ও পাঠ করছি, তা হযরত আবু বকর কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থের অনুলিপি। হযরত উসমান সেই সংকলনেরই অনুলিপি সরকারীভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন।

ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শুধু যে আল্লাহর কিতাবের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের সংকলন প্রস্তুত করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয়, একই সাথে তিনি সে কোরআনের যথার্থ পঠনরীতি মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য স্বনামধন্য ক্বারীও প্রতিটি স্থানে নিয়োগ করিয়েছিলেন। মদীনায় এ কাজের দায়িত্ব ছিল হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারীর ওপর। মক্কায় এ কাজের আঞ্জাম দিতেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। সিরিয়ায় নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুগীরা ইবনে শিহাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

কুফায় নিয়োগ লাভ করেছিলেন হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। বসরায় এই মহান দায়িত্ব পালন করতেন হযরত আমের ইবনে আব্দুল কায়েস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও যেখানেই আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর বিদায়ের পরে কোরআন পাঠে অভিজ্ঞ ক্বারী সাহাবীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কোন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যেত, অগণিত মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে আল্লাহর এ কিতাবের প্রতিটি শব্দ সহীহ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা শিখে নিতো।

১৯ সংখ্যার চরম এক জটিল জাল

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই মুসলমান ও অমুসলমানদের কাছে কোরআনের সেই অনুলিপিই বিদ্যমান। পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে কোরআনের একটি কপি সংগ্রহ করে, তা আরেক দেশের কপির সাথে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, দুটো কপির সাথে কোন গড়মিল নেই। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির কাছে পেশ করেছিলেন; এটাই যে সেই কোরআন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য একশ্রেণীর অমুসলিম চিন্তাবিদগণ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। তারা যদি কোরআনের ভেতরে একটি অক্ষরেরও গড়মিল খুঁজে পেতো, তাহলে এতদিনে গোটা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করতো। কোরআনের ওপরে

গবেষণা করতে-গিয়ে তারা কোন গড়মিল খুঁজে পায়-ই নি, উপরন্তু তারা প্রমাণ পেয়েছে, এ ধরনের কোন গ্রন্থ মানুষের পক্ষে শতকোটি বছর ধরে চেষ্টা-সাধনা করেও রচনা করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে কম্পিউটারের সাহায্যে তারা কোরআনের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মাহাত্মের সন্ধান লাভ করে। তারা সন্ধান পেয়েছে, আল্লাহর এই কিতাবে এক বিস্ময়কর সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জাল বিছানো রয়েছে, যা অতি অদ্ভুত, অভিনব এবং বিস্ময়কর। সেই সংখ্যাটি হলো ১৯ সংখ্যার সুদৃঢ় সামঞ্জস্য। চূড়ান্ত বিশুদ্ধতায় এ কিতাব আল্লাহর বাণী এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর গোটা বয়সব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা-সাধনা করে যেতো কোরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে, তবুও তা অনন্তকাল ধরে থেকে যেতো সাম্ভাব্যতার সীমানা থেকে শতকোটি যোজন যোজন দূরে।

এ কিতাবে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয়েছে, সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে যে ১৯ সংখ্যার চরম এক জটিল জালকে যেভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে, তেমনি সমান সংখ্যক শব্দে, সমান সংখ্যক বাক্যসংখ্যায়, সমান সংখ্যক অক্ষরে এ কোরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন হতো ৬২৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ বছর। অর্থাৎ ৬২৬ সংখ্যার সাথে ২৪ টি শূণ্য জুড়ে দিলে যে সংখ্যা হতে পারে। এরপরও বলা হয়েছে, কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের কিতাব রচনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একত্রিত হয়ে একযোগে চেষ্টা করতে হবে, সেই সাথে প্রতিটি মানুষকে হায়াত লাভ করতে হবে শতকোটি বছরের ওপরে। সুতরাং আমাদের সামনে যে কোরআন বর্তমান রয়েছে, তা যে আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যেভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আল্লাহর নির্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কোরআনের বিন্যাস করেছিলেন এবং গ্রন্থাবদ্ধ করার সময় তাতে যে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেনি, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোরআনের দাওয়াত

পৃথিবীতে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যে হেদায়াত ও পথনির্দেশনার একান্ত প্রয়োজন, এ পৃথিবীতে মানুষের আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গোটা বিশ্বলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব ও অস্তিত্বের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, মানুষের ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও দায়িত্ব-কর্তব্য, পারিবারিক চরিত্র গঠন ও পরিচালনা, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, সমাজ, দেশ ও জাতিকে সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব মূলনীতি ও আদর্শ একান্ত প্রয়োজন, সেসব লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো মহান আল্লাহকে নিজেদের জন্য একমাত্র পথনির্দেশক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া।

তারপর তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, শুধুমাত্র তাই অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তা অনুসরণ করা। আল্লাহকে শুধুমাত্র সেজদা লাভের অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তারপর জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পৃথিবীর চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের আবিষ্কৃত মতবাদ মতাদর্শ অনুসরণ করা এবং নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নেতা নেত্রীদের নেতৃত্বাধীন করা মানুষের জন্য এক মারাত্মক ভ্রান্ত কর্মনীতি। এ ধরনের কর্মকান্ড মানুষকে ক্রমশঃ ধ্বংস গহ্বরের দিকে অগ্রসর করিয়ে থাকে। এ জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন–

اِتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ–

হে মানুষ! তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আ'রাফ-৩)

এই কোরআন মানুষকে আহ্বান জানায় আল্লাহর দাসত্ব করার দিকে। মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তিনিই তোমাদের স্রষ্টা ও লালন-পালন কর্তা। সুতরাং তাঁরই আইন-কানুন অনুসরণ করে চলো। কোরআন মানুষকে এভাবে দাওয়াত দেয়–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ–

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর দাসত্ব স্বীকার করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত মানুষের সৃষ্টি কর্তা। (সূরা বাকারা–২১)

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই তাঁর স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতিই হলো, সে আল্লাহর দাসত্ব করবে। এই প্রকৃতি থেকে মানুষ যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তখন সে সমস্ত সৃষ্টির দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। সম্মান ও মর্যাদার আসন থেকে সে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে যায়। এ জন্য কোরআন মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য আহ্বান জানায় তথা মানব প্রকৃতির দিকে ফিরে আসতে উদাত্ত আহ্বান জানায়। কোরআন মানুষকে দাওয়াত দেয়–

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ-وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ-

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দাহ্ হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলো। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। (সূরা আল হাজ্জ–৩১)

উল্লেখিত আয়াতে আকাশ বলতে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর প্রকৃতি দাবি করে আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার জন্য এবং তাওহীদ ব্যতীত সে আর অন্য কোন আদর্শ অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়না। মানুষ জন্মগ্রহণ করে তার স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপরে আল্লাহর গোলাম হিসাবেই। পরবর্তীকালে তার প্রকৃতি নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করতে থাকে। মানুষ যখন তার জন্মগত স্বাভাবিক প্রকৃতিতে থাকে, তখন তাকে রাসূল প্রদর্শিত আদর্শানুসারে শিক্ষা প্রদান করা হলে তার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও অন্তরদৃষ্টি স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে এসব মানুষ আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে আরোহন করতে সমর্থ হয়।

আল্লাহর রাসূল বলেন, মানুষ জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হিসাবেই, তাকে লালন-পালনকারী যারা, তারাই তাকে ভিন্ন আদর্শে গড়ে তোলে। অর্থাৎ মানুষ এক আল্লাহর গোলামী করার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করে থাকে। মানুষের জন্য এই প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হবার অর্থই হলো, সম্মান-মর্যাদার উচ্চাসন

থেকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হওয়া। এ অর্থেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর গোলামী ত্যাগ করে যে ব্যক্তি অন্যের অনুসরণ করলো সে যেন তাকে দাসত্ব লাভের অধিকারী বানিয়ে দিল।

আর এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করার অর্থই হলো স্পষ্ট শিরক করা। শিরকে লিপ্ত হওয়ার মানেই হলো সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসন থেকে ছিটকে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এভাবে কোন মানুষ যখন নীচে পড়ে যায়, তখন অসংখ্য শক্তির দাসত্ব করতে সে বাধ্য হয়। পরিবারে নিজের স্ত্রী থেকে শুরু করে, সমাজের নেতাদের দাসত্ব করতে থাকে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের এবং মানুষের রচনা করা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের দাসত্ব করতে সে বাধ্য হয়।

একটা পাখির শাবক যখন বাসা থেকে ছিটকে পড়ে, তখন যেমন শাবকটি বাতাসের ঝাপটায় বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে, অথবা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ারের খোরাকে পরিণত হয়। তেমনি মানুষ যখন তার নিজের আসল স্থান থেকে ছিটকে পড়ে, তখন সে শয়তানের খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়। মানুষের মধ্যে যারা শয়তান রয়েছে, তারা শিকারী পাখির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে বিভিন্ন দল ও আদর্শের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে তার মধ্যে যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে, এই কুপ্রবৃত্তি তাকে বাতাসের গতিতে ভ্রান্ত পথে দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। এ জন্যই কোরআন মানুষের প্রতি এই দাওয়াত দেয়, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং এ পথেই মানুষের জীবনে স্থিতি আসতে পারে। নিজের গর্দান থেকে দাসত্বের সমস্ত শৃংখল ছিন্ন করে নিজেকে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনে সার্বিক সফলতা। কোরআন সেদিকেই মানুষকে আহ্বান জানায়। কোরআন বলছে—

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ-يَهْدِىْ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

হে নবী ! জ্ঞানবানরা অতি উত্তমভাবে অবগত রয়েছে যে, যা কিছু তোমার রব-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথপ্রদর্শন করে। (সূরা সাবা-৬)

কোরআন বুঝার জন্য ময়দানে আসতে হবে

হেরা পর্বতের গুহায় রাসূল ধ্যানমগ্ন ছিলেন আর আল্লাহর ফেরেশ্তা এসে তাঁকে এই কোরআন নামক গ্রন্থটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন; রাসূল তা এনে বাড়িতে আরাম শয্যায় শুয়ে কোরআনের মর্ম অনুধাবন করেছেন–বিষয়টি মোটেও এরকম নয়। পবিত্র কোরআন যে শিক্ষাদর্শ সহকারে অবতীর্ণ হলো, যে পরিবেশে অবতীর্ণ হলো, তা ছিল আল্লাহর এ কিতাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীত স্রোতধারাকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থের মতো এ কোরআন কোন ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা একটি পরিপূর্ণ ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা–সমাজ পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। একটি বিপ্লবাত্মক দাওয়াত ও আন্দোলনের গ্রন্থ। চার দেয়ালের মধ্যে বসে এ গ্রন্থ পাঠ করলে এর সঠিক ভাবধারা উপলব্ধি করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বসে বসে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র পাঠ করলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায় না। রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ওষুধ সেবন করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যে সমস্যার সমাধানের জন্য কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, সে সমস্যার সাথে মোকাবেলা না করলে কি করে কোরআনের মূলভাবধারা অনুধাবন করা যেতে পারে? অন্যায় অত্যাচারে ভেসে যাওয়া সমাজ, অশান্তির অগ্নি গহ্বরে নিমজ্জিত দেশ ও জাতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে যারা ঘরের নিভৃত কোণে আবদ্ধ রেখে নিজেকে সবচেয়ে 'নির্বিরোধী সত্যাশ্রয়ী শান্তি প্রিয়' হিসাবে প্রমাণ করতে চায়, তাদের পক্ষে কখনোই আল্লাহর কোরআনের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একটা বিষয় কোরআন অধ্যয়নকারীর স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বড় পরহেজগার, নির্বিরোধী, সত্যাশ্রয়ী ও শান্তি প্রিয় মানুষ এ পৃথিবীতে অতীতে যেমন ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও আর আসবে না। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর কোরআন কি আরামের শয্যায় অবস্থান করার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিল–না রক্তক্ষয়ী উত্তপ্ত ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত করেছিল?

সুতরাং, এ কোরআন বুঝতে হলে এবং এ থেকে পথনির্দেশনা লাভ করতে হলে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির ভেতরে আসন গেড়ে বসা আল্লাহ বিরোধী শক্তির

বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সমাজ দেহে অনুপ্রবিষ্ট আল্লাহ বিরোধী শক্তি যে ক্যান্সার সৃষ্টি করেছে, তা নিরাময়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর কোরআন অধ্যয়ন করলে তখন আল্লাহর কোরআনের প্রকৃত ভাবধারা অনুধাবন করা সহজ হবে। কোরআন অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর রাসূলকে যে আন্দোলনের পথে অগ্রসর করালো, সেই আন্দোলনের দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। যারা সর্বপ্রকার দাসত্বের বন্ধন দূরে ছুড়ে ফেলে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে আগ্রহী ছিল, তাঁরা সর্বপ্রথম কোরআনের আন্দোলনে শামিল হলো।

দেশ ও জাতির ওপরে যারা নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রেখে শোষণ যন্ত্রটি সক্রিয় রাখতে আগ্রহী ছিল, তারা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। কোরআনের আন্দোলনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে তারা সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। শুরু হয়ে গেলো কোরআনের সৈনিকদের সাথে শয়তানের সৈনিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। আল্লাহর কিতাব যাদেরকে প্রস্তুত করছিল, তাঁদের ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন শুরু হলো, তাঁরা সহায়-সম্পদ হারালেন; অপমানিত লাঞ্ছিত হলেন। তাঁদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হলো। কষ্টার্জিত সমস্ত সম্পদ বাতিল করা হলো। কারাবরণ করতে হলো। শাহাদাতের পেয়ালাও হাসি মুখে পান করতে হলো। এভাবে সূচনা থেকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে দীর্ঘ তেইশটি বছর লেগে গেলো। আল্লাহর এই কোরআন দীর্ঘ তেইশটি বছর ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে তা সফলতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দিল।

অতএব এই কোরআনকে বুঝতে হলে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ যে পথে তাঁদের পবিত্র পদচিহ্ন এঁকেছেন, তাঁরা যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন, সে পথে এগিয়ে যেতে হবে, সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য নিজের সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার মন-মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে কোরআনের অধ্যয়নকারীর কাছে মনে হবে, বর্তমানে তিনি যে সমস্যার মোকাবিলা করছেন, এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ বোধহয় এই মাত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ সময়ে কোরআনকে সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ করা কোন কিতাব মনে হবে না, কোরআন যে চির নতুন—এ কথা নতুন করে পাঠকের সামনে প্রতিভাত হবে।

কোথাও যদি আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয় আর সে আগুনের উত্তাপে চারদিকের আবর্জনা নিঃশেষে পুড়ে না যায়, তাহলে বাহ্যিক দিক থেকে তা আগুন মনে হলেও

তা আগুন নয়। এ ধরনের দহন ক্ষমতাহীন আগুনের কোন মূল্য নেই। শত সহস্র কণ্ঠে যদি কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, আর সে তিলাওয়াতের আঘাতে মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শের ধারক-বাহকদের ক্ষমতার মসনদ টল-টলায়মান হয়ে না ওঠে, তাদের ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়, তখন তো তিলাওয়াতকারীকে এ কথা অনুধাবন করতে হবে, তার কোরআন তিলাওয়াত আর সাহাবীদের কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য অনুধাবন করতে হলে যে আন্দোলন ও সংগ্রামের ময়দানে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে ময়দানে নামতে হবে। কোরআন অনুধাবন করে কোরআনের আদর্শে নিজেকে প্রস্তুত করে এগিয়ে যেতে থাকলে তার সামনে অবশ্য অবশ্যই মক্কার উত্তপ্ত পরিবেশ এসে উপস্থিত হবে। বদরের ময়দান তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। ওহুদের রক্ত রঞ্জিত ময়দান দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হবে। তায়েফের প্রস্তর বর্ষন কিভাবে হচ্ছে তা অবলোকন করা যাবে। হোনাইনের ময়দানে আকাশ আবৃত করে কিভাবে তীর ছুটে আসছে তা দেখা যাবে। মুতার প্রান্তরে কিভাবে রক্তের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে, তা দেখে শরীর শিহরিত হবে।

মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণী কোরআন পাঠ করে, কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ বিরোধী শক্তির অপতৎপরতার কাহিনী পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবাদের সাথে কি নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, সে কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে পড়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তব ময়দানে তারা আল্লাহ বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। আবু জেহেল আর আবু লাহাবের ভূমিকা তাদের চোখে পড়ে না। না পড়ার কারণ হলো, এরা কোরআনকে একটি আন্দোলনের কিতাব হিসাবে পড়ে না। এরা কোরআনের ভেতরে জ্বিন তাড়ানোর আয়াত অনুসন্ধান করে। যুবক-যুবতীদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করার, হারানো দ্রব্য ফিরে পাবার, মামলায় জয়ী হবার, শত্রুর উৎপাত থেকে নিরাপদ থাকার, পুত্র সন্তান জন্ম দেবার, ব্যবসায়ে বরকত হবার, পরীক্ষায় পাশ করার, বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার, বন্ধ্যা নারীর সন্তান হবার আয়াত অনুসন্ধান করে। আল্লাহর কোরআনকে এরা ঝাড়-ফুঁকের কিতাব হিসাবে পাঠ করে।

কোন ব্যক্তি যদি দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি এলাকা থেকে দেশের রাজধানীর দিকে যাওয়ার লক্ষ্যে যন্ত্রযানে আরোহন করে যাত্রা আরম্ভ করে, তাহলে তার সামনে যে মঞ্জিলগুলো আসার কথা, সে মঞ্জিল না এসে তার বিপরীত মঞ্জিল

আসতে থাকে, তাহলে যাত্রীকে এ কথা বুঝতে হয়, সে যে যন্ত্রযানে আরোহন করেছে, তা তার কাংখিত স্থানের দিকে, তার গন্তব্য স্থলের দিকে যাচ্ছে না–যাচ্ছে বিপরীত দিকে। এ পথ তাকে দেশের রাজধানীর দিকে নিয়ে যাবে না, নিয়ে যাবে সেখানেই যেখানে সে যেতে ইচ্ছুক নয়। একইভাবে কোরআন নিয়ে কেউ যদি ময়দানে সক্রিয় হতে চায়, তার সামনে একে একে ঐসব মঞ্জিল এসে উপস্থিত হবে, যেসব মঞ্জিল রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের সামনে এসেছিল। সে তখন চোখ মেলেই দেখতে পাবে, তাঁর চোখের সামনে শ্বাপদ সঙ্কুল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে আবু জেহেল আর আবু লাহাবের দল। সামনে-পেছনে, ডানে-বামে যেদিকেই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই সে দেখতে পাবে, আবু জেহেল আর আবু লাহাবের দল কিভাবে হুংকার ছাড়ছে। সুতরাং, কোরআনকে তার সঠিক অর্থে অনুধাবন করতে হলে, কোরআন যে আন্দোলন আর সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই ময়দানে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে তারপর কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে।

মক্কী সূরার আলোচিত বিষয়

বর্তমানে পবিত্র কোরআন যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে, এভাবে এ কোরআনকে বিন্যাস করেছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবুয়্যত ও রিসালাত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তিনি যেসব কথা বলেছেন, সেসব কথা তিনি আল্লাহর আদেশেই বলেছেন। এই কোরআনে যখন শ্রেণী বিন্যাস করা হয়, তখন তা স্বয়ং আল্লাহরই নির্দেশে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে তা করা হয়। কোন সূরার পরে কোন সূরা সাজানো হবে, কোন আয়াত কোন সূরার অংশ হবে, এ সংক্রান্ত নির্দেশ আল্লাহর রাসূল দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী তাঁর নবুয়তি জিন্দেগীর মোট তেইশ বছরের মধ্যে তের বছর অবস্থান করেছিলেন মক্কায় আর অবশিষ্ট দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর ওপরে যেসব ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলো মক্কী সূরা নামে অভিহিত হয়েছে। আর মদীনায় অবস্থানকালে যেসব ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তা মাদানী সূরা নামে অভিহিত। অবশ্য কতকগুলো সূরা সম্পর্কে কোরআন গবেষকগণ বলেন, এসব সূরায় মক্কী ও মাদানী এ উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

আল্লাহর এ কিতাবের যেসব সূরা মক্কী হিসাবে অভিহিত হয়েছে, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং মাদানী নামে পরিচিত সূরাগুলোর বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্ব হলো নবী-রাসূলদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষণপূর্বেও নবী হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ এ দায়িত্ব ও দায়িত্বের পরিধি–ব্যাপকতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখতেন না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে কিছুই জানতেন না। সুতরাং, এ দায়িত্ব অর্পণ করার পর তাঁর মধ্যে যে অস্থিরতা প্রকাশিত হয়েছিল, মক্কী সূরায় তাঁর অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

নবী ও রাসূল হিসাবে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব কি এবং কিভাবে তিনি তা পালন করবেন, সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করা হয়েছে। কোরআন যে দাওয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে দাওয়াতের দিকে আল্লাহর রাসূল কোন পদ্ধতিতে মানুষকে আহ্বান জানাবেন, দাওয়াত দানকারীকে কি ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ও গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে, মক্কী সূরায় এ সম্পর্কিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিকভাবে এ দাওয়াতের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার মোকাবেলায় রাসূলের অবস্থান কি হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করা হয়েছে। যখন বিরোধিতা শুরু করা হলো, সে বিরোধিতার ধরন অনুসারে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা শামিল হচ্ছিলেন, তাঁদের মাধ্যমে এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধন করা হবে, এ লক্ষ্যে ব্যক্তি গঠনমূলক পথনির্দেশ মক্কী সূরায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

মানুষের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ, এক আল্লাহর দাসত্ব করার প্রয়োজনীয়তা, নবুয়্যত ও রিসালাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, আখিরাত ও আখিরাতের আবশ্যকতা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান দেয়া হয়েছে মক্কী সূরায়। এসব প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করতে গিয়ে গোটা বিশ্বলোক, প্রাণীজগৎ, মহাশূণ্য, উদ্ভিদজগৎ, মানব সৃষ্টির রহস্য, রাত-দিনের আবর্তন ও বিবর্তন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সূচনায় মক্কায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে যেসব সূরা অবতীর্ণ করা হতো, সেগুলো আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমৃদ্ধ ছিল এবং তা ছিল গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারকারী। ইসলামী আদর্শের মৌলিক দিক হলো তাওহীদ, রিসালাত ও

আখিরাত। এ তিনটি বিষয় মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছিল এসব সূরায় এবং সেই সাথে শিরক, আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস ইত্যাদির পরিণতি সম্পর্কে বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যারা রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দেবে না, বিরোধিতা করবে আখিরাতে তাদের জন্য কি ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে, তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতীতে যারা নবী-রাসূলদের সাথে বিরোধিতা করেছে, ইতিহাসে তাদের কি পরিণতি ঘটেছে, সেসব ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। যারা বিরোধিতা করতো, তারা যেসব ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো, সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। যারা রাসূলের আন্দোলনে শামিল হবে এবং রাসূল কর্তৃক আনিত আদর্শ অনুসরণ করবে, আখিরাতে তাদের সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রতিদান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

মাতা-পিতা তাদের অবাধ্য সন্তানকে যেমন স্নেহমাখা কণ্ঠে সোজা সরল পথে চলার জন্য নানা ধরনের যুক্তি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেন এবং সন্তানকে সত্য পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন না, মক্কী সূরার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সত্য সহজ সরল পথ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাহ্দেরকে বারবার বুঝিয়েছেন। বারবার বুঝানোর পরেও বান্দাহ্ বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করছে, তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে বুঝানোর ব্যাপারে বিরতি দেননি বা বিরক্ত হয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করেননি। তারা যেন সত্য পথ গ্রহণ করে, এ ব্যাপারে আহ্বান জানিয়েছেন।

রাসূল এবং রাসূলের সাথীদের ওপরে যখন চরম নিষ্ঠুর নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে, এ অবস্থায় দ্বীনি আন্দোলনের সৈনিকদেরকে কি ভূমিকা পালন করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে এবং বারবার সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হবার কারণে অতীতে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁরা কিভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, এখন তাঁদেরকে কিভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, নির্যাতনের মধ্য দিয়েই কিভাবে আন্দোলনকে বিজয়ের পথে অগ্রসর করাতে হবে, এর বিনিময়ে তাঁদেরকে কিভাবে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে এবং সামনে তাঁরা বিজয়ের সোনালী সূর্যের আভায় অচিরেই সিক্ত হবেন, এ সম্পর্কিত

বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে ইসলাম বিরোধিদেরকে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে, এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে আখিরাতের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এ পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিভাবে ধ্বংস হবে, মাটির সাথে মিশে যাওয়া মৃত মানুষগুলো আবার জীবিত হবে, পৃথিবীতে মানুষ যা করেছে তার প্রতিটি কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এসব দিক আলোচনা করে বিরোধিদেরকে বিরোধিতা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে। আখিরাত সম্পর্কে গোটা কোরআনে এত কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, তা একত্রিত করলে গোটা কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান হবে। এত কথা একটি বিষয়ের ওপরে এ জন্য বলা হয়েছে যে, যে কোন ধরনের কঠিন আইন প্রণয়ন করে তা জারি করেও মানুষকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখা যায় না এবং মানুষের ভেতর থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা যায় না। এক কথায় মানুষের চরিত্র কিছুতেই ভালো করা যায় না। মানুষের চরিত্র ভালো করতে হলে মানুষের চিন্তার জগৎ থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করতে হলে, অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে দূরে রাখতে হলে মানুষের ভেতরে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করতে হয়। মক্কী সূরাসমূহে এ প্রচেষ্টার আধিক্য লক্ষ্যণীয়।

মাদানী সূরার আলোচিত বিষয়

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, দীর্ঘ তের বছরে সে আন্দোলন একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নিত হলেও মক্কায় এ আন্দোলন সফল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ যে কোন আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন সফল করতে হলে দুটো জিনিসের একান্তই প্রয়োজন হয়। একটি হলো যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে, সে আদর্শের ভিত্তিতে একদল লোক প্রস্তুত করা। যেন সাধারণ মানুষ সে লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে আদর্শ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারে এবং আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

এ ছাড়া আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যতটা কঠিন, তার চেয়ে অধিক কঠিন হলো আদর্শ টিকিয়ে রাখা। আদর্শ ভিত্তিক লোক প্রস্তুত করা না হলে আদর্শ টিকিয়ে রাখা যায় না। দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রয়োজন হয় তাহলো আদর্শ ভিত্তিক সে আন্দোলনের প্রতি

জনসমর্থন। দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনতার সে আন্দোলন ও আদর্শের প্রতি যদি সমর্থন না থাকে, তাহলে তা দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়না। আল্লাহর রাসূল মক্কার জীবনে প্রথমটিতে সফলতা অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয়টি মক্কায় ছিল না। মক্কায় আদর্শ ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি প্রস্তুত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ রাসূলের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেনি এবং ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এ জন্য হযরত মুসয়াব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আল্লাহর রাসূল মদীনায় প্রেরণ করে মদীনার জনগণকে ইসলামের পক্ষে সংগঠিত করার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ–ইসলামের প্রথম দুত।

এছাড়া মদীনা থেকে হজ্জ উপলক্ষ্যে যেসব লোকজন মক্কায় আগমন করতো, আল্লাহর নবী তাদের কাছে ইসলামী আদর্শ তুলে ধরতেন। এভাবে মদীনার কিছু সংখ্যক লোকজনের ইসলামের সাথে পরিচিতি ঘটে এবং পরপর দু'বছর মদীনা থেকে আগত লোকজন রাসূলের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাসূলকে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে মদীনায় বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই মদীনায় ইসলামের পক্ষে একটা সাধারণ জনমত গড়ে উঠেছিল।

মক্কায় ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এ কারণে কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলের অনুমোদনক্রমে হাবশা-বর্তমানে যে দেশটির নাম আবিসিনিয়া সেখানে হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মক্কার মুসলমানগণও একে একে মদীনায় হিজরাত করেন। তারপর মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকেই পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। ঠিক সে সময়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরাত করার অনুমতি দিলেন।

রাসূল মদীনায় গমন করলেন, সেখানের সাধারণ জনগণ তাঁকে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য রাসূলের এই আন্দোলন, তা বাস্তবে পরিণত করার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করলেন। এবার রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে ইসলাম চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। এ পর্যন্ত দ্বীনি আন্দোলনের কর্মী-সমর্থক

যেখানে যে অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলেন, তাঁরা সবাই একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ লাভ করলেন। মদীনায় হিজরাত করার পরে আল্লাহর রাসূলের ওপরে কোরআনের যেসব আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়, সেগুলো মাদানী সূরা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব সূরার বৈশিষ্ট্য মক্কী সূরা থেকে ভিন্ন। একটি রাষ্ট্রশক্তি মুসলমানদের হস্তগত হবার পর থেকে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে মুসলমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করলো। মদীনায় ইহুদীদের একটি বিরাট শক্তি বর্তমান ছিল। এই ইহুদী জাতি-গোষ্ঠীগতভাবে অত্যন্ত কুটিল স্বভাবের। ইসলাম এবং মুসলমান এদের কাছে অসহনীয়।

এছাড়া রাসূল মদীনায় হিজরাত করার পূর্বে উবাই নামক এক প্রভাবশালী ব্যক্তির নেতৃত্বের আসনে আসীন হবার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল মদীনায় পদার্পণ করার সাথে সাথে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরে গেল; জনতা নেতৃত্বের আসনে আসীন করলো স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকে।

নেতৃত্ব হারিয়ে লোকটি উন্মদের ন্যায় হয়ে পড়েছিল। সে তার সমর্থক গোষ্ঠী নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনশক্তি ইসলামের দিকে থাকার কারণে সে প্রকাশ্যে বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করতে না পেরে মদীনার ইহুদী এবং মদীনার বাইরের ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাত করে ইসলামী রাষ্ট্র উৎখাত করার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছিলো।

মুসলমানদের জনবল নেই, অর্থবল নেই, অস্ত্রশক্তিও নেই–তবুও তাঁদেরকে একটার পরে আরেকটা যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হলো। এভাবে এক চরম সংঘাত-মুখর পরিস্থিতি অতিক্রম করে দীর্ঘ দশ বছর পরে বিজয়ের সোনালী সূর্য উদিত হলো। এই দীর্ঘ দশটি বছর অতিবাহিত করতে গিয়ে যেসব পরিস্থিতি ও পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে, তার আলোকে কোরআনের যে সূরা বা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও জাতি গঠন এবং তা বিশ্বের মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যেসব উপাদান– উপকরণের প্রয়োজন, তা মাদানী সূরাসমূহে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

মক্কায় অবস্থান কালে মুসলমানদেরকে নির্যাতিত হয়েছে। মদীনায় এসে তাদেরকে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের (Self preservation and resist) ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তাঁদের এই ভূমিকার ধরন কেমন হবে, তা এসব সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। জাতি গঠন ও জাতি গঠনের মূল উপাদান-উপকরণ কি কি, তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি ও যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা পেশ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং এ সম্পর্কের ভিত্তি কি হবে-তা সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপরেখা এবং তা কিভাবে বিকশিত হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের প্রতিদিনের জীবনধারা এবং জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে কোন নীতি অবলম্বন করতে হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

মুনাফিক ও অমুসলিমদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে, তা অবগত করানো হয়েছে। আহলি কিতাবদের সাথে মুসলমানরা কি ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এভাবে সামাজিক আইন-কানুন, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আইন-কানুন, বিচার বিভাগীয় আইন-কানুন, উত্তরাধীকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

গোটা পৃথিবীর সামনে তাঁরা যেন আদর্শের জীবন্ত সাক্ষী হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়, এ জন্য তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে ইহুদী-খৃষ্টানদের ভ্রান্তিসমূহ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, এই ভ্রান্ত পথ-মত ও নীতি-পদ্ধতি পরিহার না করলে তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হবে।

যুদ্ধে বিজয়ী হবার পরে যেসব সম্পদ মুসলমানদের হাতে এসেছে, সেসব সম্পদ সম্পর্কিত বিধান জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবন বিধানের ওপর হামলা আসার ফলে মুসলমানদেরকে সংগত কারণেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। সক্ষম থাকার পরেও এসব যুদ্ধে যোগদান না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে জিহাদকারীর সম্মান ও মর্যাদা।

জিহাদের ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় যাঁরা জীবন দান করবে, তাঁদেরকে কি ধরনের বিনিময় দেয়া হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় তথা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে উৎসাহ প্রদান ও ব্যয় না করার পরিণতি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। সাংবাদিকতার নীতিমালা পেশ করা হয়েছে এবং সেই সাথে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ ভীতিহীন লোক কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ যাচাই-বাছাই না করে গ্রহণ করা যাবে না। মাদানী সূরাসমূহে এ ধরনের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

কোরআনের সূরা সংখ্যা ও নামসমূহ

পবিত্র কোরআনে মোট সূরার সংখ্যা হলো ১১৪ টি। আল্লাহর রাসূলের হিজরাতের পূর্ব জীবনে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যেগুলোকে মক্কী সূরা নামে অভিহিত এবং হিজরাতের পরবর্তী সময়ে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মাদানী সূরা নামে অভিহিত হয়েছে। এমন কি হিজরাতের পর মক্কার কাছে অবস্থিত হুদায়বিয়ার সন্ধী (Hudaibiya treaty) সম্পাদিত হবার পর এবং বিদায় হজ্জ উপলক্ষ্যে মূল মক্কা নগরীতে যা কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলোও মাদানী সূরার অন্তর্গত হয়েছে। এ দিক দিয়ে মক্কী সূরার মোট সংখ্যা হলো ৮৬ টি। আর মাদানী সূরার মোট সংখ্যা হলো ২৮ টি। এভাবে কোরআনের মোট সূরার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১১৪ টি। কতকগুলো সূরা এমন যে, তার প্রথম অংশ মক্কী এবং পরবর্তী অংশ মাদানী। কিন্তু গোটা সূরাটিই মক্কী হিসাবেই গণনা করা হয়েছে। সূরা মুযাম্মিল এ ধরনের একটি সূরা।

কোরআনের মোট সূরার মধ্যে ১৭ টি সূরা মক্কী না মাদানী এ বিষয়ে মতপার্থক্য বিরাজমান। এই ১৭ টি সূরার মধ্যে আবার সূরা বাইয়েনাহ, সূরা আল আদিয়াহ, সূরা আল মাউন, সূরা আল ফালাক ও সূরা আননাস—অর্থাৎ মোট ৫ টি সূরা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য বিদ্যমান। এই ১৭ টি সূরার মধ্যে সূরা আর রাদ, সূরা আর রাহমান, সূরা আদ দাহার ও সূরা আল যিলযাল অর্থাৎ ৪ টি সূরা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো মাদানী সূরা। আবার সূরা আত তীন, সূরা আল কদর, সূরা আত তাকাসুর, সূরা আল আসর, সূরা আল কোরাইশ, সূরা আল কাওসার, সূরা আল কাফিরুন ও সূরা ইখলাস—এই ৮ টি সূরা সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষকগণ বলেছেন, এগুলো মক্কী সূরা।

আল্লাহর কোরআনের কোন বিষয় ভিত্তিক নাম নেই। এ কিতাবের যতগুলো নাম পাওয়া যায়, তা সবই গুণবাচক নাম। যেমন কোরআন একটি নাম এবং এর অর্থ হলো যা পাঠ করা হয় বা যা পাঠ করা একান্তই জরুরী। অর্থাৎ এটা এমনই একটি কিতাব, যা প্রতিটি মানুষের জন্য পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ এ কিতাব ব্যতীত মানুষ কোনক্রমেই নির্ভুল পথ এবং জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়। আর নির্ভুল পথ ও জ্ঞান মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যেই এ কিতাব অবশ্যই পাঠ করা কর্তব্য। এ জন্য আল্লাহর এ কিতাবকে বলা হয়েছে কোরআন।

মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা এ কিতাবের আরেকটি নাম হলো ফোরকান। এই ফোরকান শব্দের অর্থ হলো যা সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দেয়। পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যে গ্রন্থ দাবী করতে পারে যে, আমি সত্য আর মিথ্যার ব্যবধান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম। কিন্তু আল্লাহর এই কিতাব চ্যালেঞ্জ করে দাবী করে, আমি সত্য আর মিথ্যা নির্ণয়ের একমাত্র নির্ভুল মানদন্ড—আমি সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরি। আল্লাহ বলেন—

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ–

স্মরণ করো, আমি মূসাকে কিতাব এবং ফোরকান দান করেছি—সম্ভবত এর সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্য পথ লাভ করতে পারবে। (সূরা বাকারা-৫৩)

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওপরেও যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, সে কিতাবও সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য করার গুণাবলী সম্বলিত ছিল। আর কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ–

রমজান মাস, এতেই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। (সূরা বাকারা-১৮৫)

সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জড়তা বা সন্দেহ সংশয় থাকে না, সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে তা তুলে ধরে। মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মানুষের রচনা করা বিধান অনুসরণ কেন করা যাবে না এবং কেন আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুসরণ করতে হবে। এ পার্থক্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট তুলে ধরে এ কিতাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ-اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ-

আর তিনি মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী। এখন যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। (সূরা আলে-ইমরান-৪)

আল্লাহ তা'য়ালা যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা অত্যন্ত কল্যাণময়। কেননা এ কিতাব মানুষের যে কোন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। এই পৃথিবীর ইতিহাস হলো সত্য আর মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সত্য আর মিথ্যার যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব এ পৃথিবীতে চলে আসছে, এ দ্বন্দ্ব দূরীভূত করার লক্ষ্যেই এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا-

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি–যিনি এ ফোরকান তাঁর বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য সতর্ককারী হয়। (সূরা আল ফোরকান-১)

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবকে 'যিকর' নামে অভিহিত করেছেন। প্রচলিত অর্থে যিকর বলতে একশ্রেণীর মানুষ যা বুঝে থাকে, যিকর শব্দের অর্থ বা যিকর বলতে শুধু সেটাই বুঝায় না। আল্লাহ তা'য়ালা এই যিকর শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ কিতাবকেও যিকর বলা হয়েছে। কোরআনকে যিকর বলা হয়েছে এ অর্থে যে, এ কিতাব ভুলে যাওয়া শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা নির্ভুল উপদেশ–জ্ঞান দান করে। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওপর যে তাওরাত অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তাকেও যিকর বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ-

পূর্বে (এই কোরআনের পূর্বে) আমি মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফোরকান, জ্যোতি ও যিকর মুত্তাকিদের জন্য। (সূরা আল আম্বিয়া-৪৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই কিতাবকে যিকর হিসাবে উল্লেখ করে বলেন–

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ–اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ–

আর এখন এই বরকত সম্পন্ন যিকর আমি অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে? (সূরা আল আম্বিয়া-৫০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা আ'রাফের ৬৩ ও ৬৯ আয়াতে, সূরা ইউসুফের ১৪০ আয়াতে, সূরা হিজরের ৬ ও ৯ আয়াতে, সূরা নাহলের ৪৪ আয়াতে, সূরা কলমের ৫১ আয়াতে ও সূরা আবাসার ১১ আয়াতে যিকর শব্দের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনকে বুঝিয়েছেন। সূরা কামারের ২৫ আয়াতে যিকর শব্দ দিয়ে ওহীকে বুঝানো হয়েছে। এই কিতাব সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করে সূরা আল হিজরের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ–

আর বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই কোরআনকে 'আমার যিকর' নামে অবিহিত করেছেন–যে যিকর মানুষকে সত্য সহজ পথপ্রদর্শন করে। মানুষ যে শিক্ষা ভুলে গিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ–

এ বাণী তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যেতে থাকো। যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আন নাহল-৪৪)

এভাবে এ কিতাবকে 'নূর' বলা হয়েছে। কারণ এ কিতাব মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অর্থাৎ মিথ্যার অন্ধকার থেকে মহাসত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসে। এ ধরনের অনেক নাম রয়েছে এ কিতাবের। যা গুণবাচক নাম এবং সেসব নাম এ কিতাবের সম্মান-মর্যাদা ও অন্যান্য গুণাবলী প্রকাশ করে। আল্লাহর এই কিতাবে যে ১১৪ টি সূরা রয়েছে, তার ভেতরে ৯ টি সূরা ব্যতিত ১০৫ টি সূরার

বিষয় ভিত্তিক নাম নেই। শুধুমাত্র পরিচিতির জন্য বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহ্, এর অর্থ গাভী। এ নাম এ জন্য দেয়া হয়নি যে, এ সূরায় শুধু গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আন নাহল–এর অর্থ মৌমাছি। সূরা নামল–এর অর্থ পিপিলীকা। সূরা আনকাবুত–এর অর্থ মাকড়শা। এসব সূরার মধ্যে এই শব্দগুলো উল্লেখ রয়েছে, ফলে পরিচিতির জন্য নামকরণ করা হয়েছে।

কোরআনের আংশিক অনুসরণ করা যাবে না

আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান হিসাবে কোরআনের ওপরে ঈমান আনার অর্থ হলো, কোরআন পরিবেশিত বিধি-বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। কারণ কোরআনই হলো একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। কোরআনের বিধান কিছুটা অনুসরণ করা হবে আর কিছুটা অনুসরণ করা হবে না, অর্থাৎ কোরআনের বিধান খণ্ডিতভাবে অনুসরণ করা হবে, তাহলে মুমিন হওয়া যাবে না।

নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহ্‌লীল, জানাযা, দাফন-কাফন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোরআনের বিধান অনুসরণ করা হবে আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন–রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, শ্রমনীতি, পরিবার পরিচালনায়, সমাজ পরিচালনায়, বিচার কার্য পরিচালনায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনের বিধান ত্যাগ করে পৃথিবীর দার্শনিক-চিন্তাবিদ কর্তৃক রচিত মতবাদ-মতাদর্শ বা বিধি-বিধান অনুসরণ করলে কোনক্রমেই নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া যাবে না।

কোরআনের বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন করতে হবে। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কোরআনের বিধান অনুসরণ করতে হবে। কোরআন এ জন্য অবতীর্ণ হয়নি যে, তার কিছু নীতিমালা মানুষ অনুসরণ করবে আর অবশিষ্ট বিধি-বিধান শুধু সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করা হবে তা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনে অনুসরণ করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ -وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُوْنَ- اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ-فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ-

তবে তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং অপর অংশকে অবিশ্বাস করো? জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যারাই এধরনের আচরণ করবে তাদের এ ছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পৃথিবীর জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে মোটেও বেখবর নন। প্রকৃতপক্ষে এসব লোকেরা নিজেদের পরকাল বিক্রি করে পৃথিবীর জীবন ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না এবং এরা নিজেরাও কোন সাহায্য পাবে না। (সূরা বাকারা-৮৫-৮৬)

মুসলমানদের জীবন দুই ভাগে ভাগ করার কোন অবকাশ নেই। এক ভাগে থাকবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি আর আরেক ভাগে থাকবে ধর্ম, এ বিভক্ত জীবন মুসলমানের হতে পারে না। আল্লাহর কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বিধান অনুসরণ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করা যাবে না। যারা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণ করবে, এ পৃথিবীতে তারা গোলামীর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আর গোলামীর জীবন হয় অপমান ও লাঞ্ছনামূলক জীবন।

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানরা ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন অতিবাহিত করছে, এর একমাত্র কারণ হলো, এরা কোরআনের বিধি-বিধান আংশিক অনুসরণ করে। পৃথিবীতেও এরা লাঞ্ছিত হচ্ছে, কিয়ামতের ময়দানেও এরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। মুসলিম বিশ্বে যারা এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করছে, তারা যে অমুসলিম শক্তির পক্ষে কাজ করছে এবং এ কাজের বিনিময়ে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বিধান মেনে নিলে পৃথিবীতে ভোগবাদী জীবন ধারা অনুসরণ করা যাবে না, এ জন্যই তারা দুনিয়ার জীবনের মোকাবেলায় আখিরাতের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে।

এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুসারীদের জন্য আদালতে আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। সুতরাং, একমাত্র কোরআনের বিধানই অনুসরণ করতে হবে, এ ব্যাপারে কোন আপোস করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ–

হে মানুষ ! তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করো না। (সূরা আ'রাফ–৩)

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারার ২০৬ আয়াতে বলেন–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً–

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।

উল্লেখিত আয়াতে 'ইসলামে প্রবেশ করো' বলতে বুঝানো হয়েছে, পরিপূর্ণভাবে কোরআনের বিধান অনুসরণ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ–

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। (সূরা নেছা)

এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রাজনীতি করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউ-ই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোন খন্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তোমার মামলার ফায়সালা করে দিচ্ছি

খন্ডিতভাবে রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং কোরআনের বিধান অনুসরণ করার কোন অবকাশ কোরআন দেয়নি। কোরআন তথা রাসূলের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে যদি কারো মধ্যে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে মুসলমান হওয়া যাবে না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে একজন লোক এসে একটি মামলার নিস্পত্তি করে দেয়ার আবেদন পেশ করেছিল। সেই ব্যক্তি ঐ একই মামলা রাসূলের আদালতে পেশ করেছিল–কিন্তু রাসূলের দেয়া রায় তার মর্জ্জি মাফিক ছিল না।

এ কারণে সে পুনরায় মামলাটি হযরত ওমরের কাছে পেশ করেছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকটির কাছে প্রশ্ন করলেন, তুমি এই মামলাটি প্রথম কার কাছে পেশ করেছিলে?

লোকটি জানালো, আমি মুসলমান, আমি নামায আদায় করি; রোযা পালন করি, ইসলামের পক্ষে জিহাদেও যোগদান করি। একজন ইহুদী রাসূলের আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা করলো আর রাসূল সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ইহুদীর পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। এ রায় সঠিক হয়নি। আপনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে সঠিক ফায়সালা করে দিন।

লোকটির কথাগুলো হযরত ওমরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর ধমনীর রক্ত দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। ক্রোধে তাঁরা চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি অপেক্ষা করো, আমি তোমার মামলার ফায়সালা করে দিচ্ছি।

এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করে কোষমুক্ত তরবারী এনে বললেন, আল্লাহর বান্দা শোন, আল্লাহর রাসূল যে ফায়সালা করে দেন, তাঁর ফায়সালার সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে, তাদের ফায়সালা এভাবেই করতে হয়।

এ কথা বলে তিনি তরবারীর আঘাতে লোকটিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। রাসূলের দরবারে সংবাদ পৌঁছে গেল, হযরত ওমর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। চারদিকে এ সংবাদ জানাজানি হয়ে গেল। লোকজন বিরূপ মন্তব্য করতে থাকলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং বিব্রতবোধ করতে থাকলেন, ওমর কেন এমন কাজ করলো। রাসূলের যাবতীয় দ্বিধা সংকোচ দূর করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ সূরা নিছার ৬৫ নং আয়াতে জানিয়ে দিলেন–

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًامِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا–

তোমার রবের শপথ ! লোকেরা কোনক্রমেই ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না তারা–হে নবী–আপনাকে তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী হিসেবে মেনে নেয়, আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মনে কুণ্ঠাবোধ করে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।

অর্থাৎ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যাকে হত্যা করেছেন সে ব্যক্তি মুমিন নয়, সে ব্যক্তি হলো মুনাফিক। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করার পরে নিজেকে মুসলমান দাবী করে কোরআনের আংশিক অনুসরণ ও খন্ডিতভাবে নবীর নেতৃত্ব মানার কোন অবকাশ নেই, পরিপূর্ণভাবে নবীর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের যে বিধান পেশ করেছেন, সে বিধানের কোন একটি দিকও ত্যাগ করা যাবে না। কোরআনের বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই বিধান যেমন বাস্তবায়িত করতে হবে ব্যক্তি জীবনে, তেমনি বাস্তবায়িত করতে হবে দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে।

কোন মুসলমান যদি রাজনীতি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাঁকে অবশ্যই কোরআনের রাজনীতি করতে হবে। ইসলাম কোন মুসলমানকে এ সুযোগ দেয়নি যে, সে কোরআনের বিধানের বিপরীত কোন মতবাদ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি করবে। এ ধরনের কোন রাজনীতির সাথে যে ব্যক্তি নিজেকে জড়িত করবে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করার তার কোন অধিকার নেই। শাসন ক্ষমতায় যিনি অধিষ্ঠিত, তাকেও কোরআনের বিধান অনুসরণ করতে হবে।

শাসক হিসাবে আল্লাহর রাসূল কিভাবে দেশ পরিচালিত করেছেন, সেভাবেই দেশ পরিচালনা করবেন। সেনাপ্রধান অনুসরণ করবেন আল্লাহর রাসূলকে। তিনি তাঁর বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখবেন, আল্লাহর রাসূল সেনাপ্রধান হিসাবে কিভাবে তাঁর অধীনস্থ বাহিনী পরিচালিত করেছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে আল্লাহর কোরআনে। কোরআন কি ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করে গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে দরিদ্রতা দূর করেছিল। কোরআনের সেই অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হবে।

আল্লাহর কিতাবের দেয়া যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট স্তরের মানুষগুলোকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রবান মানুষে পরিণত করেছিলেন, সেই শিক্ষানীতি অনুসরণ করতে হবে। শিল্পপতিগণ তাদের অধিনস্থ শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোরআনের দেয়া শ্রমনীতি অনুসরণ করবেন। এসব ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকা যাবে না। পৃথিবীর কোন মানুষ নির্ভুল বিধান দিতে পারে না।

কারণ কোরআনের জ্ঞানহীন মানুষ নির্ভুল জ্ঞানের পরিবর্তে অমূলক ধারণা ও অনুমানকেই অনুসরণ করে থাকে। তাদের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-কল্পনা, নীতি-দর্শন, জীবন বিধান ও কর্ম পদ্ধতি সমস্ত কিছুই অনুমান নির্ভর–ধারণা আর অনুমানের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

পক্ষান্তরে কোরআন প্রদর্শিত পথ–নির্ভুল পথ। এ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান ও সন্ধান সেই আল্লাহই দান করেছেন। মানুষ নিজেদের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে যে পথ নির্ধারণ করে নিয়েছে, তা কোনক্রমেই নির্ভুল নয়। সুতরাং, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও দেশসমূহ কোন পথে চলছে এবং কোন বিধান অনুসরণ করছে, তা কোন মুসলমানের কাছে বিবেচনার বিষয় নয়। মুসলমান একমাত্র কোরআন প্রদর্শিত পথে চলবে। এ পথের পথিক যদি সে একাও হয় তবুও সে একাকীই এ পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবে। এ বিষয়টিই কোরআন স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে–

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً-لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ-وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ

তোমার রব-এর কালামসমূহ সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তার বিধান পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এবং তিনি সমস্ত কিছু শোনেন এবং জানেন। আর হে রাসূল! তুমি যদি এ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথা মতো চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা অনুমানই তারা করতে থাকে। (সূরা আল আন'আম-১১৫-১১৬)

সমস্ত সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শন

মহান আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা–খালিক। স্রষ্টা হিসাবে তিনি নিজের কর্ম-কৌশল, নিজের সুবিচার-ইনসাফপূর্ণ নীতি ও নিজের অনুগ্রহশীলতার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথিবীতে অজ্ঞ, পথহারা ও অনবহিত না রাখার–বরং সত্য সঠিক অভ্রান্তপথ এবং ভ্রান্তপথ বুঝিয়ে দেয়ার, পাপ-পুণ্য, বৈধ-অবৈধ তথা হারাম ও হালাল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করার, কোন পথ-মত ও আচরণ গ্রহণ করলে সে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ হতে সক্ষম হবে এবং কোন পথ ও মত এবং কার আনুগত্য করলে সে আল্লাহর

—৫

বিদ্রোহী বান্দাহ্ বলে প্রমাণিত হবে, এসব কথা তাকে পরিপূর্ণভাবে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা লাইল-এ বলেন–

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى– পথপ্রদর্শন করা নিঃসন্দেহে আমারই দায়িত্ব।

সুতরাং হেদায়াতের পথপ্রদর্শন করা মহান আল্লাহরই দায়িত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং এই দায়িত্ব পালন করেন বলে তিনি তাঁর বান্দাহ্কে শিখিয়েছেন আমার কাছে এভাবে দোয়া করো, 'আমাদেরকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করো।' পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রতিটি সৃষ্টিকেই তার সূচনা থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এর শেষ স্তর হলো হেদায়াত। মহান আল্লাহই এই হেদায়াত দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى–وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى– যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন। (সূরা আ'লা-২-৩)

প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবীতে তাকে কি কাজ করতে হবে, সেই কাজের পরিমাণ কি হবে, তার আকার-আকৃতি কি হবে, তার গুণাবলী কি হবে, কোথায় তার স্থান ও অবস্থিতি হবে, তার স্থিতি, অবস্থান ও কাজের জন্য কি ক্ষেত্র ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে, কোন সময় তার অস্তিত্ব হবে, কতদিন পর্যন্ত তা নিজের অংশের কাজ করবে এবং কখন কিভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে, সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও পথ নির্দেশ ইত্যাদি–এসব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যথাযথরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেই সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে যাননি-হেদায়াতও তিনি দিয়ে দেন।

উদাহরণ স্বরূপ মানুষের পা যেভাবে গঠন করা হয়েছে, এই গঠন প্রণালীর দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। পায়ের নলার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পায়ের নলাটি গোটা পায়ের মাঝামাঝি নেই। সম্পূর্ণ পায়ের কেন্দ্রস্থলে এই নলাটি দেয়া হলে কোন মানুষের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটা চলাফেরা করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। পায়ের পাতার অংশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পায়ের পাতার সিংহভাগ সামনের দিকে আর ক্ষুদ্র অংশটি পেছনের দিকে। পায়ের পাতার এই পরিমাপ ঠিক না থাকলেও মানুষ স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটতে পারতো না। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা শুধু সৃষ্টিই করেননি, তিনি এর সুসামঞ্জস্যতাও বিধান করেছেন।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে এভাবে প্রতিটি দিক থেকে সুসামঞ্জস্যভাবে, পরিমাণ ঠিক রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবার পশু-প্রাণীর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। যেসব পশু শিকার করে তাদের পায়ের থাবা সামনের দিকে। যেদিকে মুখ দিয়ে সে ছুটতে বা দৌড়াতে পারে, তার থাবাও সেদিকেই দেয়া হয়েছে। পায়ের থাবা সামনের দিকে না দিয়ে পেছনের দিকে দেয়া হলে তার পক্ষে সামনের দিকে দৌড়ানোও যেমন সম্ভব হতো না, তেমনি সম্ভব হতো না তার পক্ষে শিকার ধরে আহার করা।

মুরগীর বাচ্চা ডিম ফুটে বের হয়ে স্থলে বিচরণ করে-এটাই তার ক্ষেত্র। স্থলে বিচরণ করার হেদায়াতই তাকে দেয়া হয়েছে। মুরগী ও তার বাচ্চাগুলোকে পানির ভেতরে ফেলে দেয়া হলে ডুবে মারা যাবে। কিন্তু হাঁসের বাচ্চা ডিম ফুটে বের হবার পরে পানিতে ছেড়ে দিলে স্বচ্ছন্দে তারা সাঁতার দিতে থাকবে। এই প্রজাতির হাঁস-যেগুলো গভীর অরণ্যে বাস করে, প্রজনন মৌসুমে এরা বড় বড় বৃক্ষের উচ্চ কোঠরে ডিম দেয়। গাছের নিচের কোন কোঠরে ডিম দিলে অন্য কোন প্রাণী সে ডিম খেয়ে ফেলতে পারে, এ জন্য তারা গাছের ওপরের কোঠরে ডিম দেয়। ডিমগুলো হেফাজত করার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা বের হবার পরে সে বাচ্চাগুলো প্রায় বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে নিচে নামবে কি করে? শক্ত মাটিতে বাচ্চাগুলো লাফিয়ে পড়লে আঘাত পেয়ে মারা যাবে, এ জন্য বড় হাঁসগুলো মুখের সাহায্যে গাছের শুকনো পাতা ঐ গাছের গোড়ায় একত্রিত করে নরম তোষকের মতো বানিয়ে দেয়। তারপর বাচ্চাকে সংকেত দিলেই সে বাচ্চাগুলো কোঠর থেকে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের সাথে কোন সরোবরের দিকে চলে যায়। হাঁস ও তার বাচ্চাকে এই হেদায়াত দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা।

সুতরাং, তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে পথ-নির্দেশ দিয়েছেন, সৃষ্টির পরিমাণ ঠিক করেছেন ও সামঞ্জস্যতা বিধান করেছেন। সমস্ত সৃষ্টি পরিচালিত হচ্ছে মহান আল্লাহর হেদায়াত অনুসারে। মানুষকেও একমাত্র তাঁরই হেদায়াত অনুসরণ করতে হবে। মানুষের কাছে স্বয়ং আল্লাহ এই হেদায়াত পৌছান না, তিনি মানুষের মধ্যে থেকে একজন সর্বোত্তম মানুষকে নবী-রাসূল নির্বাচিত করে তাঁর মাধ্যমেই মানব-জাতিকে হেদায়াত প্রদর্শন করেছেন।

মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মর্যাদাগত পার্থক্য

হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে যখন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন তাঁকে শুধু একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই প্রেরণ করা হয়নি। তাঁকে নবী-রাসূলের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। হেদায়াত অর্থাৎ সঠিক পথ আল্লাহ প্রদর্শন করবেন, এ কারণে পৃথিবীর প্রথম মানবকেই একজন নবী হিসেবে প্রেরণ করে তাঁর মাধ্যমে হেদায়াত দেয়া হয়েছিল। সৃষ্টির অন্যান্য বস্তু ও জীবের স্বভাবের মধ্যেই যেমন আল্লাহ প্রয়োজনীয় হেদায়াত দিয়েছেন, মানুষকে তা দেয়া হয়নি তার উচ্চ মর্যাদার কারণে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও জীবসমূহকে যে প্রক্রিয়ায় হেদায়াত দেয়া হয়েছে, সেই একই প্রক্রিয়ায় মানুষকে হেদায়াত দেয়া হলে, মানুষ আর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মর্যাদাগত দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকতো না এবং আল্লাহ যে পরীক্ষা করতে চান, সে উদ্দেশ্য সফল হতো না।

এ জন্য মানুষকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে এবং নবী-রাসূলের মাধ্যমে হেদায়াত দান করা হয়েছে। মানুষ যেন পৃথিবীতে চিনে নিতে সক্ষম হয়, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। কোনটি অনুসরণ করা উচিত আর কোনটি উচিত নয়। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আলাসিস্ সাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় তিনি অনুভব করেছিলেন, এই পৃথিবীতে তিনি কোন নির্দেশের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করবেন। তখন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে বলেছিলেন–

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

আমার কাছ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। (সূরা বাকারাহ্)

যখনই মানুষের জন্য সহজ-সরল পথের প্রয়োজন হয়েছে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাঁর ওয়াদানুসারে মানব জাতিকে হেদায়াত দিয়েছেন। জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে কোন পথ আবিষ্কার করার অধিকার মানুষের স্বয়ং নেই বা এ অধিকার তাকে দেয়া হয়নি। কারণ মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ,

সমস্ত সমস্যাসমূহের প্রতি একই সময়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে না এবং সে ক্ষমতাও মানুষের দৃষ্টির নেই। যাবতীয় সমস্যা সে একই সময়ে অনুধাবনও করতে পারে না বা অনুধাবন করার মতো জ্ঞানও মানুষের নেই। মানুষসহ প্রতিটি জীবের সমস্যা অনুধাবন করে তা সমাধান করার মতো সামর্থ মানুষের নেই।

মানুষের দৃষ্টি কতটা সঙ্কীর্ণ এবং সে দৃষ্টি তাকে কিভাবে প্রতারিত করে বা তার দৃষ্টির দুর্বলতা কেউ যদি পরীক্ষা করে দেখতে চায় তাহলে তাকে পাশাপাশি স্থাপন করা রেল লাইনের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে। কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাবে যে, লাইন দুটো পাশাপাশি চলে গিয়েছে। এভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে অনেক দূরে গিয়ে লাইন দুটো একত্রিত হয়েছে। অথচ প্রকৃত বিষয় তা নয়। আড়াল থেকে কানে কোন শব্দ প্রবেশ করলে সেটা কিসের শব্দ, তা নির্ণয়ে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়। এভাবে প্রতিটি বিষয়েই মানুষ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়। সুতরাং দুর্বলতায় আচ্ছন্ন অসমর্থ মানুষের পক্ষে সবার জন্য ইনসাফমূলক সার্বজনীন কোন বিধান রচনা করা সম্ভব নয়। তাকে অবশ্যই আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী হতেই হবে, এ ছাড়া তার সম্মুখে দ্বিতীয় কোন উন্মুক্ত নেই।

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, তিনিই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন। তিনিই মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সাল্লামের ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ সেখানে হেদায়াতের বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি তার জাতিকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের পূজা-উপাসনা, বন্দেগী, আনুগত্য, দাসত্ব করতে দেখে এবং মানুষের বানানো বিধান অনুসরণ করতে দেখে বলেছিলেন—

اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ-وَالَّذِىْ هُوَيُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ-وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ-

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে আহার করান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। (সূরা শু'আরা)

অর্থাৎ তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। আমি যখন ক্ষুধার্ত হই তখন তিনি আমাকে আহার করান। আমি যখন তৃষ্ণা অনুভব করি তখন তিনি আমাকে পান করান। আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে

তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। হযরত মুছা ও হযরত হারুন আলাইহিস্ সালামকে ফেরাউন প্রশ্ন করেছিল– قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى হে মুছা! তোমাদের দু'জনার রব কে? (সূরা ত্বা-হা-৪৯)

আল্লাহর নবী হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন–

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى–

আমাদের রব তিনি–যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা ত্বা-হা-৫০)

আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসকে শুধুমাত্র তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। পৃথিবীর এমন কোন জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগাবার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শোনার ও চোখকে দেখার কাজ তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার, পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেবার এবং মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। সুতরাং তিনি শুধু স্রষ্টাই নন–গোটা জাহানের সমস্ত কিছুর শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকও একমাত্র তিনিই।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল, মানুষের ক্ষুধার সময় তিনিই আহার করান, মানুষ তৃষ্ণার্ত হলে তিনিই পান করান, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনিই নিরাময় দান করেন অর্থাৎ তিনি মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন। সমস্ত কাজ তিনিই সম্পাদন করেন আর মানুষের হেদায়াতের কাজটি তিনি অন্যের জন্য রেখে দিবেন, এটা কোন যুক্তির কথা হতে পারে না। সুতরাং তিনি যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি সৃষ্টিকে হেদায়াতও তিনিই দান করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا–

আমি তাদেরকে পথ দেখিয়েছি, ইচ্ছা করলে তারা শোকরকারী হবে অথবা হবে কুফরকারী। (সূরা দাহর-৩)

আল্লাহ বলেন, আমি মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন করেই ছেড়ে দিইনি, সেই সাথে তাকে পথও প্রদর্শন করেছি। যেন তারা জানতে যে, শোকর-এর পথ কোনটি এবং কুফরের পথ কোনটি। তারপর তারা যে পথই

অবলম্বন করবে, তার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী হবে। সূরা আল বালাদে বলা হয়েছে– وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ আর আমি তাদেরকে উভয় পথ অর্থাৎ ভালো ও মন্দ স্পষ্ট করে দিয়েছি।

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত সৃষ্টিকেই পথপ্রদর্শন করেছেন। কোরআন বলছে–

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ-ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً-

আর দেখো তোমার রব মৌমাছীদেরকে এ কথা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, তোমরা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ তরু-লতা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো। তারপর সব রকমের ফলের রস চুসে নাও এবং নিজের রব-এর প্রদর্শিত পথে চলতে থাকো।(সূরা নাহ্ল-৬৮-৬৯)

কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য অন্য কাউকে পথপ্রদর্শনের জন্য নিযুক্ত করেননি। তিনি স্বয়ং এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনিই গোটা বিশ্বলোকের সমস্ত কিছুর পথ-নির্দেশ দেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الاَرْضِ-ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ-قَلِيْلاً مَّاتَذَكَّرُوْنَ-اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ-

কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন যখন সে তাঁকে কাতরভাবে ডাকে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন? আর কে তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহও কি এ কাজ করছে? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো। আর কে জলে-স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান? (সূরা নাম্ল-৬২-৬৩)

মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনে একমাত্র তিনিই সাড়া দেন, আর হেদায়াতের প্রয়োজনে তিনি হেদায়াত দেননি—মানুষ স্বয়ং তার হেদায়াতের নির্মাতা হবে, এ কথা জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির অগম্য। এই কথা যারা বলে, তারা মানুষকে শোষণ করা এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত অশুভ স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্যই বলে থাকে। মানুষের প্রতিটি কাজের যাবতীয় উপকরণও তিনিই সরবরাহ করে থাকেন। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন—وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا এবং তিনি তোমাদের কাজের উপযোগী উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করবেন। (সূরা কাহ্ফ-১৭)

নির্ভুল-অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ দেয়া তাঁরই দায়িত্ব এবং তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী। একমাত্র তিনিই সত্য পথের দিকে পরিচালিত করে থাকেন। পৃথিবীতে যারা পথ নির্দেশদানকারী বলে দাবী করে, তারা মানুষকে ভ্রান্তপথের দিকে পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন—وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ—আল্লাহ্ এমন কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন। (সূরা আহযাব)

সুতরাং নির্ভুল, অভ্রান্ত, স্থিতিস্থাপক, ইনসাফমূলক, সামঞ্জস্যমূলক, সহজ-সরল পথ একমাত্র আল্লাহ-ই রচনা করতে ও প্রদর্শন করতে পারেন। কোন মানুষের পক্ষে মানুষের জন্য অনুসরণীয় মতবাদ-মতাদর্শ, জীবন ব্যবস্থা রচনা করা কোনক্রমেই যে সম্ভব নয়, পৃথিবীর ইতিহাসই এর জ্বলন্ত সাক্ষী। এ যাবৎ কাল পর্যন্ত মানুষ যতগুলো আদর্শ উদ্ভাবন করেছে এবং তার ভিত্তিতে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করার প্রয়াস পেয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা শোচনীয় ব্যর্থতার গ্লানী বহন করেছেন। নিকট অতীতে মানব রচিত মতবাদ সমাজতন্ত্রের করুণ পরিণতি পৃথিবীবাসী অবলোকন করেছে এবং ঘৃণ্য পুঁজিবাদের মরণযন্ত্রণাও মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে।

মানুষ নির্ভুল পথ রচনা করতে পারে না

মানুষ তার নিজের সত্তার দিক দিয়েই একটি জগৎ বিশেষ। তার এই জগতের মধ্যে অসংখ্য শক্তি, যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতা বিদ্যমান। তার এই জগতের মধ্যে জাগ্রত রয়েছে কামনা-বাসনা, লোভ, লালসা, আবেগানুভূতি, ভাবাবেগ, ঝোঁক-প্রবণতা, কাম, ক্রোধ, জেদ, হঠকারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। মানুষের

দেহ ও মনের রয়েছে অসংখ্য দাবি। মানুষের আত্মা, প্রাণ ও স্বভাবের রয়েছে সীমাহীন জিজ্ঞাসা। প্রতি নিয়ত তার মধ্যে অসংখ্য প্রশ্নমালা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে। এটাই হলো মানুষের জটিল অবস্থা। এই জটিল অবস্থা সম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে মানব সমাজ গড়ে ওঠে, সে সমাজও নানা ধরনের জটিল সম্পর্কের ভিত্তিতেই গঠিত হয়। মানব সমাজ অসীম ও অসংখ্য জটিল সমস্যার সমন্বয়ের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ লাভের সাথে সাথে এসব জটিলতা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

এসব সমস্যা ছাড়াও পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী মানুষের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তা ব্যবহার করা এবং মানবীয় সংস্কৃতিতে তা ব্যবহার উপযোগী করে প্রয়োগ করার প্রশ্নেও মানুষের ভেতরে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে অসংখ্য জটিলতার সৃষ্টি করে। মানুষ তার নিজের দুর্বলতার কারণেই তার সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে একই সময়ে পূর্ণ ও সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। এ কারণে মানুষ নিজের জন্য জীবনের এমন কোন পথ স্বয়ং সে নিজেই রচনা করতে পারে না, যে পথ নির্ভুল হতে পারে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষের ভেতরেই একটি জগৎ রয়েছে এবং সে জগৎ অসংখ্য জটিল বিষয় সমন্বিত, অসংখ্য শক্তি-সামর্থ সে জগতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। সুতরাং মানুষ স্বয়ং যে বিধি-বিধান, মত-পথ রচনা করবে, সে বিধান স্বয়ং মানুষের অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তি-সামর্থের সাথে পূর্ণ ইনসাফ করবে, তার সমস্ত কামনা-বাসনার সাথে প্রকৃত অধিকার বুঝিয়ে দিবে, তার আবেগ-উচ্ছাস ও প্রবণতার সাথে ভারসাম্যমূলক আচরণ করবে, তার দেহের ভেতরের ও দেহের বাইরের যাবতীয় প্রয়োজন সঠিকভাবে পূরণ করবে, তার গোটা জীবনের যাবতীয় সমস্যার দিকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি দিয়ে সেসব কিছুর এক সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান বের করবে এবং বাস্তব জিনিসগুলোও ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে সুবিচার, ইনসাফ ও সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবহার করবে–এসব কোন কিছুই মানুষের পক্ষে কক্ষনো সম্ভব হবে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বয়ং যখন নিজের পথ-প্রদর্শক, আইন-কানুন, বিধান রচয়িতার ভূমিকা পালন করে, তখন নিগূঢ় সত্যের অসংখ্য দিকের মধ্য থেকে কোন একটি

দিক, জীবনের অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্য থেকে কোন একটি প্রয়োজন, সমাধানযোগ্য সমস্যাবলীর কোন একটি সমস্যা তার চেতনার জগতে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক- অন্যান্য দিক ও প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সে কোন দৃষ্টিই দিতে সক্ষম হয় না। কারণ তার চেতনার জগৎ তো আচ্ছন্ন হয়ে থাকে বিশেষ একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এভাবে বিশেষ মানুষের ওপরে বিশেষ কোন মত বা আদর্শ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়ার কারণে জীবনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে সামঞ্জস্যহীনতার এক চরম পর্যায়ের দিকে তা বক্র গতিতে চলতে থাকে।

মানব জীবনের এই চলার বাঁকা গতি যখন শেষ স্তরে গিয়ে উপনীত হয় তখন মানুষের জন্য তা অসহ্যকর হয়ে জীবনের যেসব দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার দিকে ইতোপূর্বে দৃষ্টি দেয়া হয়নি, সেসব দিক তরিৎ গতিতে বিদ্রোহ করে এবং সেসব প্রয়োজন পূরণ করতে বলে, সমস্যাগুলো সমাধানের দাবি করতে থাকে। কিন্তু তখন আর মানুষের পক্ষে সেসব প্রয়োজন পূরণ করা ও সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হয় না। কারণ পূর্বানুরূপ সামঞ্জস্যহীন কর্মনীতি পুনরায় চলতে থাকে।

পূর্বে যেসব সমস্যা সমাধান ও প্রয়োজনগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি, সামঞ্জস্যহীন কর্মনীতির ফলে মানুষের যেসব দাবি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে ভয়-ভীতি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে রাখা হয়েছিল, তা পুনরায় মানুষের ওপর প্রচন্ড গতিতে আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং তাকে নিজের বিশেষ দাবি অনুযায়ী বিশেষ একটি লক্ষ্যের দিকে গতিবান করে তোলার চেষ্টা করে।

এ সময় অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোর সাথে পূর্বের ন্যায় আচরণই করা হতে থাকে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবন কখনো সঠিক, সত্য, সহজ-সরল পথে একনিষ্ঠভাবে চলার মতো পরিবেশ লাভ করে না। সমস্যার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সে ক্রমশঃ ডুবে যেতে থাকে। একটি ধ্বংস গহ্বর থেকে কোনক্রমেই সে উঠতে সক্ষম হলেও ছুটতে গিয়ে অন্য আরেকটি ধ্বংস গহ্বরে সে আছড়ে পড়ে।

মানুষ এমনি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতায় পরিপূর্ণ এক জীব যে, কোন কাজ করতে গেলে সর্বপ্রথম তাকে নির্ধারণ করে নিতে হয় তার কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অন্য কোন জীবের ন্যায় এ মানুষ লক্ষ্যহীন কোন কাজ করতে পারে না আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্ধারণ করতে গেলেই তার সামনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে, কোন আদর্শের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী সে তার কাজগুলো সম্পাদন করবে। মানুষের নিজের রচনা করা কোন মতবাদ মানুষকে আদর্শের সন্ধান দান করে না বিধায় মানুষ চরম হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মানব চরিত্র যে কোন মতবাদ যখন মানুষকে আদর্শহীন অবস্থায় পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই মানুষের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন শূন্যতা।

পক্ষান্তরে আদর্শহীন অবস্থায় চিন্তা ও চেতনার শূন্যতা নিয়ে, মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না বলে জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য আদর্শের সন্ধানে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে চিন্তা ও চেতনার জগতের শূন্যতা পূরণ করার জন্য তার সামনে বিচিত্র ও মানব চিন্তার বিপরীতমুখী আদর্শের সমাবেশ ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় মানুষের যে কি করুণ পরিণতি ঘটে তা একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিষ্কার হতে পারে।

কোন একজন মানুষের অনেকগুলো বন্ধু ছিল। বন্ধুদের মধ্যে কেউ ছিল শুকনো কাঠ ব্যবসায়ী, কেউ ছিল তুলা ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কাপড় ব্যবসায়ী, কেউ ছিল পেট্রোল ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কেরেসিন তৈল ব্যবসায়ী, কেউ ছিল খড় ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কাগজ ব্যবসায়ী। হঠাৎ কোন একদিন দেখা গেল, গভীর রজনীতে ঐ অনেকগুলো বন্ধুর অধিকারী ব্যক্তিটির আপন বাসগৃহে আগুন লেগেছে। তখন ঐ ব্যক্তি চিৎকার করে তার বন্ধুদের কাছে সাহায্য চেয়ে বলছে, আমার এই চরম বিপদের মুহূর্তে তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করো।

লোকটির এই করুণ আর্তনাদে সাড়া দিয়ে তার সমস্ত বন্ধুরা ছুটে এলো। কাঠ ব্যবসায়ী বন্ধু প্রচুর কাঠসহ ছুটে এসে অগুনের ভেতরে তা ছুড়ে দিলো। কাপড় ব্যবসায়ী বন্ধু কতকগুলো কাপড়ের থান এনে তা আগুনের ভেতরে ছুড়ে মারলো। খড় ব্যবসায়ী বন্ধু কয়েক বোঝা খড় এনে তা আগুনের ভেতরে ছুড়ে দিল। এভাবে কাগজ ব্যবসায়ী বন্ধু কাগজ, পেট্রোল ব্যবসায়ী বন্ধু পেট্রোল, কেরেসিন ব্যবসায়ী বন্ধু কেরোসিন আগুনের ভেতরে ছুড়ে দিলো। ফল যা হবার তাই হলো। আগুন নির্বাপিত হবার পরিবর্তে আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সমস্ত বন্ধুর কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল বিপদগ্রস্থ বন্ধুকে সাহায্য করা অর্থাৎ বন্ধুর ঘরের আগুন নিভিয়ে ফেলা। পক্ষান্তরে বিপদগ্রস্থ বন্ধুর জন্য ওই লোকগুলো যা করলো, তাতে করে বিপদগ্রস্থ বন্ধুর বিপদ বৃদ্ধি বৈ কমলো না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের জন্য যত আদর্শ, মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করেছে তা সবই আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভুল দিক থেকে তার গতি শুরু হয় এবং ভুল দিকেই তা উপনীত হয়ে সমাপ্তি লাভ করে এবং সেখান থেকে পুনরায় অন্য কোন ভুল পথের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে।

এসব অসংখ্য ঁকা ও ভ্রান্ত পথের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে অবস্থিত এমন একটি পথ একান্তই আবশ্যক। যেন মানুষের সমস্ত শক্তি ও কামনা-বাসনার প্রতি, সমস্ত ভালোবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-উচ্ছাসের প্রতি, মানুষের আত্মা ও শারীরিক সমস্ত দাবির প্রতি এবং জীবনের যাবতীয় সমস্যার প্রতি যথাযথ−ন্যায়-নিষ্ঠ আচরণ করা, যে আচরণে কোন ধরনের বক্রতা ও জটিলতা থাকবে না, বিশেষ কোন দিকের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ ও অন্যান্য দিকগুলোর প্রতি অবিচার ও জুলুম করা হবে না।

বস্তুত মানব জীবনের সুষ্ঠু ও সঠিক বিকাশ এবং তার সাফল্য ও সার্থকতা লাভের জন্য এটা একান্তভাবে অপরিহার্য। মানুষের মূল প্রকৃতিই এই সত্য-সঠিক পথ তথা সিরাতুল মুস্তাকিম লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। পৃথিবীর কোন অমুসলিম বা ইসলাম বিদ্বেষী চিন্তানায়ক এ কথার প্রতি স্বীকৃতি দিক আর না-ই দিক, এ কথা চরম সত্য যে, অসংখ্য বাঁকা-চোরা পথ, ভ্রান্তপথ থেকে বারবার বিদ্রোহ ঘোষণার মূল কারণ হলো, মানব প্রকৃতি সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সহজ-সরল পথের সন্ধানেই ছুটতে থাকে।

পক্ষান্তরে এ কথা সর্বজনবিদিত ও চরম সত্য যে, মানুষ স্বয়ং মুক্তির এই রাজপথ আবিষ্কার করতে ও চিনতে সক্ষম হয় না এবং সিরাতুল মুস্তাকিম মানুষ রচনা করতে পারে না−শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই সিরাতুল মুস্তাকিম রচনা করার মতো জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনিই তা রচনা করতে সক্ষম। ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মানুষকে মুক্তির রাজপথে নিয়ে আসা তথা আল্লাহর গোলামীর পথ−সিরাতুল মুস্তাকিম কোনটি তা প্রদর্শন করা।

আল্লাহর কোরআন এই মহামুক্তির মহান পথ সিরাতুল মুস্তাকিমকে 'সাওয়া-আস-সাবীল' নামেও মানুষের সামনে পেশ করেছে। পৃথিবীর এই নশ্বর জীবন থেকে শুরু করে আলমে আখিরাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন পর্যন্ত অসংখ্য

বাঁকা-চোরা এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথের মাঝখান দিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম বা মহামুক্তির মহান পথ সরল রেখার মতোই আল্লাহর জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে। সুতরাং এই পথের যিনি পথিক হবেন, তিনি এই পৃথিবীতে নির্ভুল-অভ্রান্ত পথের পথিক হবেন এবং আলমে আখিরাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনে পরিপূর্ণভাবে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত হবেন।

আর যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সিরাতুল মুস্তাকিমের অভ্রান্ত পথ চিনতে ব্যর্থ হবে বা হারিয়ে ফেলবে সে ব্যক্তি এই পৃথিবীতেও বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও ভুল পথের যাত্রী আর আলমে আখিরাতে তাকে অনিবার্যরূপে আল্লাহর জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কারণ সিরাতুল মুস্তাকিম বা সাওয়া-আস সাবীল ব্যতিত অন্য সমস্ত বাঁকা পথের শেষ প্রান্ত আল্লাহর জাহান্নাম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

বস্তুবাদ আর জড়বাদের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত একশ্রেণীর চিন্তানায়কগণ বর্তমান মানুষের জীবনকে ক্রমাগতভাবে একটি প্রান্ত থেকে বিপরীত দিকের আরেকটি প্রান্তে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেখে এই ভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দ্বান্দ্বিক কার্যক্রম (Dialectical Process) মানুষের জীবনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক স্বভাবসম্মত পথ।

এসব চিন্তাবিদগণ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বুঝে নিয়েছেন যে, প্রথমে এক চরমপন্থী দাবী (Thesis) মানুষকে একদিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে, ঠিক অনুরূপভাবে সে ঐ প্রান্ত থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আরেকটি চরমপন্থী দাবী (Antithesis) তাকে বিপরীত দিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে পৌঁছাবে। এভাবে উভয় প্রান্তের আঘাতের সংমিশ্রণে মানুষের জন্য তার জীবন বিকাশের পথ (Synthesis) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসবে আর এটাই হচ্ছে মানুষের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র অভ্রান্ত পথ।

ভোগবাদে বিশ্বাসী এসব জড়বাদীদের আবিষ্কার করা ক্রমবিকাশ লাভের এই পথকে ক্রমবিকাশ লাভের পথ না বলে চপেটাঘাত খাওয়ার পথ বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ মানুষের জীবনের সঠিক বিকাশের পথে এই পথ বারংবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, মানব জীবন বিকাশের পথে এ পথ অর্গল তুলে দেয়। প্রতিটি চরমপন্থী দাবী মানুষের জীবনকে তার কোন একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয় ও তাকে কঠিনভাবে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে বিভ্রান্তির ঘুর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে হতে যখন সিরাতুল মুস্তাকিম

থেকে তা অনেক দূরে চলে যায়, তখন স্বয়ং জীবনেরই অন্যান্য যেসব সমস্যার প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি, যেসব সমস্যাগুলোর কোন সমাধান করা হয়নি, তা বিদ্রোহ শুরু করে।

এভাবে একটির পর একটি দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, মানুষের জীবন থেকে শান্তি সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এই অন্ধদের দৃষ্টি সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে যেতে বাধা দেয় তাদের সীমাহীন ভোগ ব্যবস্থা। এ জন্য তারা দেখতে পায় না, সিরাতুল মুস্তাকিমই হলো মানব জীবনের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র সত্য-সঠিক পথ।

জীবন-যাপনের সঠিক পথ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, একমাত্র আমারই দাসত্ব করবে, এটাই তোমাদের জন্য সহজ-সরল পথ আর এই কোরআনকে তোমাদের জন্য হেদায়াত হিসাবে দেয়া হলো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ–

বস্তুত এই (কোরআন) একটি পয়গাম সমস্ত মানুষের জন্য আর এটা প্রেরিত হয়েছে এ জন্য যে, এর মাধ্যমে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং তারা অবগত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্ শুধু একজন আর বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবে। (সূরা ইবরাহীম-৫২)

আল্লাহর এই কিতাব পৃথিবীর কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বা কোন শ্রেণী বিশেষকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়নি, এই কিতাব সমস্ত মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য এই কোরআন হেদায়াতের পয়গাম বহন করে এনেছে। এই কোরআন সোজা সহজ সরল পথপ্রদর্শন করতে এসেছে। এই কোরআনকে যারা অনুসরণ করবে তারা নিজেদের কল্যাণের লক্ষ্যেই তা করবে। আর যারা অনুসরণ করবে না, তারা নিজেদেরই অকল্যাণ সাধন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ–فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ–وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا–

আমি সমস্ত মানুষের জন্য এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং যে সোজা পথ অনুসরণ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। (সূরা যুমার-৪১)

আল্লাহর দায়িত্ব হলো নিজের সৃষ্টিসমূহকে পথপ্রদর্শন করা, যে পথে চলে তারা নিজেদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে সফল ও পূর্ণ করতে পারবে সেই পথের সন্ধান বলে দেয়া। এ কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন অবতীর্ণ হওয়া একদিকে যেমন তাঁর পরম দয়াশীলতার অনিবার্য দাবী, তেমনিভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ারও স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দাবীও এই কোরআনের অবতরণ।

আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁর সৃষ্টিসমূহের পথপ্রদর্শনের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন এই কোরআন অবতীর্ণ করে। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যদি তাঁর সৃষ্টির বিধি-ব্যবস্থা বলে না দেন, কর্মপথ নির্দিষ্ট না করেন, তাহলে দ্বিতীয় কে এমন আছে যে, তা করবে ? শুধু তাই নয়–সৃষ্টিকর্তাই যদি তাঁর সৃষ্টিকে হেদায়াত দিতে অক্ষম হন, তাহলে কে এমন আছে যে, তিনি হেদায়াত দান করতে সক্ষম?

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যে জিনিস নির্মাণ করলেন, তার জীবন, উদ্দেশ্য, পরিপূরণের পন্থা ও পদ্ধতি তিনিই বলে দিয়েছেন। মানুষের দেহের প্রতিটি লোমকূপ, প্রতিটি কোষ ও টিস্যু'র যা কাজ, মানব দেহে অবস্থান করে যে কাজ তাকে করতে হয়, এই কাজের শিক্ষা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সুতরাং এই লোমকূপ ও কোষসমূহের সমষ্টি যে মানুষ, সে নিজে তার সৃষ্টিকর্তার শিক্ষা ও পথপ্রদর্শন থেকে বঞ্চিত থাকে কিভাবে? মানুষকে এই হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়নি, পবিত্র কোরআন সেই হেদায়াত হিসাবে আগমন করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ–

রমযানের মাস, এতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। (সূরা বাকারা-১৮৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআনকে 'হুদাল্লিন নাছ' অর্থাৎ মানব জাতির জন্য এটা হেদায়াত—বলে ঘোষণা করেছেন। সূরা নেছায় বলা হয়েছে–

اِنَّااَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰكَ اللّٰهُ

হে নবী ! আমি এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন, সেই অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পারো। (সূরা নিছা-১০৫)

এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সহজ-সরল পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে আগমন করেছে। কোনটি আলো, কোনটি অন্ধকার, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, কোন পথে অশান্তি আর কোন পথে শান্তি, কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় তার স্পষ্ট পার্থক্য করে দেয় আল্লাহর এই কোরআন। এই কোরআনই মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই কোরআন দিয়েই মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেয়ার জন্য।

মানুষের হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ বুঝানোর জন্য এবং হেদায়াতের পথপ্রদর্শনের জন্য সবচেয়ে বড় যা হতে পারে, তা-ই হলো এই কোরআন এবং সেটাই মানুষের জন্য মানুষের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা অবতীর্ণ করেছেন। এই কোরআন থেকে মানুষ যদি হেদাতায়ত গ্রহণ না করে, তাহলে গোটা সৃষ্টিজগতের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে যে, মানুষ সেখান থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে পারে? সূরা মুরসালাত আল্লাহ বলেন–

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ– এই কোরআনের পরিবর্তে আর কোন কালাম এমন থাকতে পারে যে, যার প্রতি এসব মানুষ ঈমান আনবে?

কোরআন ব্যতীত হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণ করা এবং হেদায়াতের পথপ্রদর্শনের অপর কোন মাধ্যম নেই। সুতরাং, যারা এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করবে না তারা আর কোন মাধ্যম থেকে হেদায়াত পাবে না। সূরা বনী ইসরাঈলের ৯-১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا–وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا- আসলে এ কোরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভালো কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুসংবাদ দেয় এই মর্মে যে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আখিরাত অস্বীকার করে তাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

কোরআন সোজা পথপ্রদর্শন করে এবং এই কোরআন থেকে যারা হেদায়াত গ্রহণ করে তারা আল্লাহর কাছে বিরাট প্রতিদান লাভ করবে। আর যারা এই কোরআনকে হেদায়াত বলে বিশ্বাস করে না বা এর থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে না, তারা কিয়ামতের ময়দানে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিপতিত হবে। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কোরআন থেকে যারা হেদায়াত গ্রহণ করেনি, তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ-تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ-كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ-

তারা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে। তা তখন উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোসের অতিশয় তীব্রতায় জাহান্নাম যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম করবে। প্রতিবারে যখনই জাহান্নামের মধ্যে কোন জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে, তখন এর কর্মচারীরা সেই লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসেনি ? (সূরা মুলক-৭-৮)

কোরআন প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ যারা গ্রহণ করেনি, কোরআনকে যারা হেদায়াত হিসাবে অনুসরণ করেনি, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের মধ্যে যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করবে, কেন তোমরা এই কঠিন আযাবের মধ্যে এলে? এই ভয়াবহ আযাবের কথা কেউ কি তোমাদেরকে পৃথিবীর জীবনে বলেনি? আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হেদায়াত কি তোমরা লাভ করনি? সিরাতুল মুস্তাকিম কি তোমাদের সামনে ছিল না ? জাহান্নামীরা আক্ষেপ করে বলবে–

—৬

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَ نَا نَذِيْرٌ-فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ-اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ-

হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু আমরা তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আসলে তোমরা অতিমাত্রায় পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছো। (সূরা মুল্‌ক-৯)

অবশ্যই আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হেদায়াত নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের ধারক-বাহকগণ এসেছিল। কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করিনি বরং তাদেরকে বলেছি, আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন হেদায়াত অবতীর্ণ হয়নি। মানুষের জন্য কোন জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি, যদি কিছু করেই থাকেন, তা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা এই ধর্মকেই মানুষের জীবন ব্যবস্থা তথা যাবতীয় বিধি-বিধান হিসাবে পেশ করছো। মানুষকে তোমরা প্রগতি থেকে অধঃগতির দিকে নিয়ে যেতে চাও। তোমরা দেশ ও জাতিকে সামনের দিকে না নিয়ে পেছনের দিকে নিয়ে যাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তোমরা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট, তেমনি আল্লাহর বিধানের নামে গোটা মানব মন্ডলীকেও বিভ্রান্ত করতে চাও। আমরা এসব কথা বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদর্শন করা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করিনি এবং জাতিকেও পরিচালিত করার কোন চেষ্টা করিনি।

আল্লাহর দেয়া হেদায়াত থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে কাফির মুশরিকদের কাছ থেকে আমদানী করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। এই মতবাদের যারা অনুসারী এবং যারা সমর্থক, যারা আল্লাহর দেয়া হেদায়াত অনুসরণ করেনি, তারা আল্লাহর জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব দেখে আক্ষেপ করে বলতে থাকবে−

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ-

আর তারা বলবে, হায়−আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না। (সূরা মুল্‌ক)

যারা সত্য পথ অবলম্বন করে এই পৃথিবীতে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার আকাংখা পোষণ করে, এই কোরআন তাদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সুসংবাদ হিসাবে আগমন করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন−

وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ– এই কোরআন ঈমানদারদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে।(সূরা বাকারা-৯৭)

সাফল্যের এই সুসংবাদ পৃথিবীতে নতুন কোন বিষয় নয়–আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে কোরআনের পূর্বেও বিভিন্ন নবী-রাসূলদের ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করে সাফল্য ও সুসংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ নতুন কোন পথ নয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই পৃথিবী সিরাতুল মুস্তাকিমের সাথে পরিচিত হয়নি, ইতোপূর্বেও এই পথের সাথে পৃথিবীর পরিচয় ঘটেছে। প্রতিটি নবী-রাসূলই সেই একই সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

শান্তি ও নিরাপত্তার পথ

আল্লাহর এই কিতাব তাদেরকেই পথপ্রদর্শন করে, যারা অসংখ্য বাঁকা পথের অশুভ হাতছানি থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করে সহজ-সরল পথের সন্ধান লাভের জন্য চেষ্টা চালায়। আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়াদি ও শিক্ষাসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার। এসব শিক্ষা এতটাই পরিষ্কার যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলেই সত্যের অভ্রান্ত পথ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যারা কোরআন যথাযথভাবে অনুসরণ করে, এই কোরআন কত সুন্দর ও নির্ভুল পথপ্রদর্শন করে এবং এটা কত বড় রাহ্‌মতের ব্যাপার তা তাদের জীবনে ও কর্মে প্রত্যক্ষ করা যায়। কোরআন প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের প্রভাবে মানুষের মন-মানস, নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহারে যে স্বাভাবিক এক অতি উত্তম বিপ্লব সূচিত হয় তাও লক্ষ্য করা যায়। সূরা আ'রাফের ৫২ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ– এই কিতাব ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়াত ও রাহ্‌মত স্বরূপ।

এই কোরআনে অপরিসীম বিচক্ষণতার আলো প্রস্ফুটিত রয়েছে। এর অত্যধিক উজ্জ্বল সৌন্দর্য হলো, যারা এর হেদায়াত অনুসরণ করে তারা অতি সহজেই জীবনের সরল-সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যায় এবং তাদের নির্মল ও উত্তম চরিত্রে আল্লাহর অফুরন্ত রাহ্‌মতের নিদর্শন প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

বস্তুত এটা অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বলতম আলো, তোমাদের রব-এর কাছ থেকে অবতীর্ণ। এটা হেদায়াত ও রাহ্মত সেই লোকদের জন্য, যারা এটা মেনে নিবে। (সূরা আ'রাফ-২০৩)

এই পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় সমস্যাকে যদি রোগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, এসব রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যেই এই কোরআনের আগমন ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ-وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

হে মানব জাতি ! তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে নসীহত এসে পৌছেছে, এটা অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময় আর যে তা কবুল করবে, তার হেদায়াত ও রাহ্মত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (সূরা ইউনুস-৫৭)

আল্লাহর এই কোরআন–এটা এমনি এক হেদায়াত, যেসব মানুষের অন্তর কালিমা লিপ্ত হয়ে পড়েছে, সেই মসীলিপ্ত অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। এই কিতাবের কাছ থেকে যারা সিরাতুল মুস্তাকিম লাভ করতে চায়, তাদের জন্য হেদায়াত ও রাহ্মতের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করে রেখেছেন। মানুষ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানালো, তারা সত্য পথ তথা হেদায়াত লাভ করতে চায়। মহান আল্লাহ প্রার্থনা ম ুর করে তাদের হেদায়াতের জন্য পবিত্র কোরআন নবীর মাধ্যমে তাদের সামনে পেশ করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ-

আমি এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রাহ্মত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছে। (সূরা নাহ্ল-৮৯)

এই কোরআন এমন প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, যার ওপর হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এবং লাভ ও ক্ষতি নির্ভর করে, যা জানা সঠিক পথে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যারা কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন

করবে আল্লাহর কোরআন জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে, একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর রাহ্মত বর্ষিত হবে এবং এ কিতাব তাদেরকে এই সুসংবাদ দেবে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার দিন আল্লাহর আদালত থেকে তারা সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে।

অন্য দিকে যারা আল্লাহ কোরআনের অনুসরণ করবে না তারা যে শুধুমাত্র হেদায়াত ও রাহ্মত থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয়–বরং কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর নবী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে দাঁড়াবেন তখন এই দলীলটিই হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ নবী এ কথা প্রমাণ করে দিবেন যে, তিনি তাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছিলেন যার মধ্যে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিল।

মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার

মানুষের জন্য আল্লাহর এই কোরআন সবচেয়ে বড় দান, সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, সবচেয়ে বড় সম্পদ-নিয়ামত। মানুষের ব্যক্তি জীবন বা রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি স্বাভাবিক বিষয় দেখা যায়, কোন ব্যাপারে যদি একজন মানুষ অথবা একটি রাষ্ট্রের জনগণ সাফল্য লাভ করে, তাহলে ব্যক্তি যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি রাষ্ট্রও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। নিজ দেশের সেনাবাহিনী যখন শত্রু দেশের সৈন্যদেরকে নাস্তানাবুদ করে বিজয়ী হয়ে আসে, তখন বিজয়ী দেশের জনগণ আনন্দ-উল্লাসে দিশাহারা হয়ে যায়।

অর্থাৎ লাভের পরিমাণটা যত বেশী হয়, মানুষ তত বেশী আনন্দ প্রকাশ করে থাকে, এটা মানুষের স্বভাব। এই পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে মানুষকে সবচেয়ে অধিক লাভ করে দিতে পারে এই কোরআন। মানুষকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এই কোরআন প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষের সবচেয়ে বেশী আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত যে, তারা কোরআনের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার লাভ করে শয়তানী শক্তির ওপরে বিজয়ী হয়েছে। এই যমীন ও আকাশের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, এসব প্রতিটি বস্তুর যা মূল্য হবে, সেসব মূল্য একত্রিত করলে যে পরিমাণ দাঁড়াবে, আল্লাহর কোরআনের একটি অক্ষরের মূল্যের সাথেও তা তুলনীয় হবে না। এই কোরআন যে কত মূল্যবান, এটা মহান আল্লাহর যে কতবড় নিয়ামত, তা মানুষ অনুধাবন করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا-هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

হে নবী ! আপনি বলে দিন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এই কোরআন প্রেরণ করেছেন। এই জন্য তো লোকদের আনন্দ স্ফূর্তি করা উচিত। এই কোরআন সেসব জিনিস থেকে উত্তম যা লোকজন সংগ্রহ ও আয়ত্ত করে থাকে। (সূরা ইউনুস-৫৮)

এই কোরআনই সেই সিরাতুল মুস্তাকিম, মানুষ যা নামাজের মধ্যে বার বার কামনা করে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে আগ্রহী, আল্লাহর এই কোরআন তাদের যাবতীয় অভাব পূরণ করে। কোরআন মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দান করে। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ-يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রৌশনী এসেছে, সেই সাথে এমন একটি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও–যার সাহায্যে আল্লাহ তা'য়ালা তার সন্তোষ-সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (সূরা মায়িদা-১৫-১৬)

এই আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হলো, যে সিরাতুল মুস্তাকিম মানুষ লাভ করার জন্য আল্লাহর দরবারে অভিনন্দন পূর্বক দাবি পেশ করে, এই কোরআনই সেই সিরাতুল মুস্তাকিম। সূরা আল জাসিয়ার এগার আয়াতে এই কোরআনকে 'হাযা হুদা' অর্থাৎ হেদায়াত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটাই মানব জাতিকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে। শর্ত হলো, এই কোরআনের বিধানের সামনে মাথানত করে দিতে হবে।

মানুষের জীবন সফল হতে পারে তখনই যখন সে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সে মানুষের জানা নেই, কোন পথে সে নিজের জীবনকে

পরিচালিত করলে মহান আল্লাহ তার ওপরে সন্তুষ্ট হবেন। এই কোরআন এমনি এক হেদায়াত–যা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ, মানুষের কাংখিত পথপ্রদর্শন করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقِّ-وَيَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

হে নবী! জ্ঞানবানরা ভালো করেই জানে, যা কিছু তোমার রব-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, অ সম্পূর্ণ সত্য এবং তা (এই কোরআন) পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথপ্রদর্শন করে। (সূরা সাবা-৬)

কোরআন থেকে পথের দিশা লাভের উপায়

মানুষের হেদায়াতের জন্যে একমাত্র এই কোরআনকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মানুষ আল্লাহর দরবারে যে হেদায়াত কামনা করলো, সেই হেদায়াত হিসাবে তার কাছে ত্রিশপারা কোরআন দেয়া হলো এবং বলা হলো, এই কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করো। আল্লাহর এই কিতাব থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে হলে কতিপয় শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সেই শর্ত পূরণ না করলে কোনক্রমেই এই কিতাব থেকে হিদায়াত লাভ করা যাবে না।

কোন ব্যক্তি যদি মহাশূন্যে গমন করতে যায়, চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহে ভ্রমণ করতে চায়, তাহলে কাংখিত গ্রহে ভ্রমণের উপযোগী হিসাবে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। সেই গ্রহের উপযোগী পোষাক পরিধান করতে হয়। মহাশূন্যে কিভাবে আহার করতে হবে, ঘুমাতে হবে, মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয় তাকে অবগত হতে হয়। তারপর পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মহাশূন্যের পথে পা বাড়াতে হয়।

একই ভাবে কোন বস্তু থেকে উপকার বা কল্যাণ গ্রহণ করতে হলে সেই বস্তুর ব্যবহার বিধি মানুষকে অবশ্যই জানতে হয়। ব্যবহার বিধি না জেনে কোন বস্তু ব্যবহার করলে তা থেকে কল্যাণ লাভ করা যায় না। এই কোরআন আল্লাহ মানব জাতির জন্য হেদায়াত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলেও মানুষকে হেদায়াত লাভের উপযোগী হতে হবে, তারপর সে

এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভে সমর্থ হবে। এই কোরআন কোন ধরনের লোকদেরকে পথ নির্দেশ দান করবে, তা স্বয়ং কোরআন বলছে–

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ-هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ-

এগুলো কোরআনের ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও সুসংবাদ এমন মুমিনদের জন্য যারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং তারা এমন লোক যারা আখিরাতকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। (সূরা নাম্‌ল-১-৩)

আল্লাহর কিতাব শুধুমাত্র সেসব লোকদেরই পথনির্দেশনা দেয় এবং আনন্দদায়ক পরিণামের সুসংবাদও একমাত্র সেসব মানুষকে দেয়, যেসব মানুষ ঈমান আনে। ঈমান আনার অর্থ হলো, তারা কোরআন ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান কবুল করেন। এক আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, রব্ব, মা'বুদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই কোরআনকে আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তা মেনে নেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু নবী-রাসূল ও জীবনের অনুসরণের একমাত্র আদর্শ নেতা হিসাবে মেনে নেয়। সেই সাথে সে এই বিশ্বাসও অন্তরে পোষণ করে যে, পৃথিবীর জীবন শেষে মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন রয়েছে, সেই জীবনে এই পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে এবং প্রতিদান পেতে হবে।

কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে শুধু উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দিলেই হেদায়াত পাওয়া যাবে না। নিজের জীবনে বাস্তবে এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হবে। হেদায়াত লাভের জন্য উল্লেখিত দিকগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্যের প্রথম লক্ষণই হলো, হেদায়াত কামনাকারী ব্যক্তি নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দানের উপযুক্ত হলে যাকাত দান করবে।

এই কাজ যারা করবে, আল্লাহর কোরআন তাদেরকেই হেদায়াত দান করবে বা সত্য সহজ সরল পথের সন্ধান দান করবে। জীবন পথের প্রতিটি বাঁকে তাদেরকে সত্য আর মিথ্যা এবং ন্যায় আর অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিবে। মানুষ যদি কোনভাবে ভুল পথের দিকে অগ্রসর হতে চায়, কোরআন তাকে সতর্ক করবে।

তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করবে যে, সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করার ফলাফল এই পৃথিবীতে মিষ্ট বা তিক্ত যা-ই হোক না কেন, পরিশেষে এর বিনিময়ে চিরন্তন সফলতা তারাই অর্জন করবে এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের বিষয়টি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যেতে পারে। রোগী যদি ডাক্তারের কাছ থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী হয় তাহলে ডাক্তারকে নিজের চিকিৎসক হিসাবে গ্রহণ করে তার ব্যবস্থাপত্র (Prescription) অনুসারে রোগীকে চলতে হবে। তেমনি কেউ যদি কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে আগ্রহী হয়, তাকেও কোরআনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। আর মানুষ এই আনুগত্য যথার্থই করছে কিনা, তা নামাজ আদায় ও যাকাত দানের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়।

মানুষ যদি নামাজ আদায় না করে, সামর্থ থাকার পরও যাকাত আদায় না করে, তাহলে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়াত চায় না। অর্থাৎ এমন ধরনের ব্যক্তি সে, দেশের শাসককে শাসক হিসাবে মেনে নিলেও শাসকের আদেশ মানতে মোটেও প্রস্তুত নয়। কোরআনকে কোরআন হিসাবে স্বীকৃতি সে দেয়, কিন্তু কোরআনের বিধান মানতে আদৌ প্রস্তুত নয়। এমন ব্যক্তি কখনো কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হয় না।

মুত্তাকীদের গুণাবলী

পবিত্র কোরআন থেকে কোন শ্রেণীর লোক হেদায়াত লাভ করতে পারে এবং তাদেরকে কোন ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে, এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ্ ছুব্হানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন- ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ-فِيْهِ-هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-

এটা আল্লাহর কিতাব, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা সেই মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা বাকারা-২)

অর্থাৎ এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকী হবার শর্তপূরণ না হলে তার পক্ষে আল্লাহর কোরআন থেকে

হেদায়াত লাভ করা সম্ভব হবে না। মুত্তাকীদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। আর যে কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সেসবের প্রতি বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। (সূরা বাকারা-৩-৪)

এই আয়াতে মুত্তাকীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এসব গুণাবলী যাদের মধ্যে নেই, তারা আল্লাহর কিতাব থেকে পথ-নির্দেশ লাভ করতে সমর্থ হবে না। এই কিতাব থেকে পথনির্দেশনা লাভের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে বলেছেন, তার প্রথম গুণ হলো, ব্যক্তিকে অবশ্যই এই কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে এবং কোরআনের প্রতি আনুগত্য পরায়ণ হতে হবে। কোরআন যে জীবন বিধান দান করেছে, সেই বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া একান্ত জরুরী।

এই পৃথিবীতে যারা একান্তই পশুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতে চায়, পশু-প্রাণীর মতো দায়িত্ব-কর্তব্যহীন জীবন-যাপন করতে আগ্রহী, পৃথিবী যে রঙে রঙিন, সেই রঙে রঙিন হতে চায়, নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ড–তা কল্যাণকর অথবা অকল্যাণ কর, এ সম্পর্কে গুরুত্ব দেয় না, জীবন পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ পথের কোন তোয়াক্কা যারা করে না, মানুষ হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন চিন্তা করে না, এই পৃথিবীতে কে তাকে প্রেরণ করলো, কেন সে প্রেরিত হলো, সমস্ত সৃষ্টি কেন তার যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করছে, এসব সৃষ্টির পেছনে কোন গূঢ় রহস্য লুকায়িত রয়েছে ইত্যাদি বিষয় যাদের মন-মানসিকতাকে আলোড়িত করে না, তারা আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে মুত্তাকীদের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ নেই বিধায় আমরা এখানে এমন কতকগুলো একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করবো, যা অর্জন করতে সক্ষম না হলে আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা

কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম পরহেযগার হতে হবে। 'পরহেয' শব্দটি উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো, 'বিরত থাকা'। আর 'পরহেযগার' শব্দের অর্থ হলো, 'যিনি বিরত থাকেন।' ইসলামী সংস্কৃতিতে পরহেযগার তাকেই বলা হয়, যিনি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বৈধ করেছেন, হালাল করেছেন–তাই করেন আর যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, হারাম বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকেন।

অর্থাৎ পরহযেগার ব্যক্তি হয় সচেতন। প্রতিটি পদক্ষেপে সে ব্যক্তি সত্যের এবং ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে। কোনটি ভালো একং কোনটি মন্দ, কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি ক্ষতিকর ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা পরহেযগার ব্যক্তির মধ্যে থাকে। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার যোগ্যতা যেমন ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে, তেমনি তার মধ্যে এই মানসিকতা থাকতে হবে যে, তিনি অন্যায় পথে পরিচালিত হবেন না। সত্যের অনুসন্ধান করে তিনি সেই সত্যের অনুসরণ করবেন। গোটা পৃথিবী কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে, এ বিষয়ের প্রতি তিনি গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র সত্যের প্রতিই গুরুত্ব দিবেন। এক কথায় সত্যাশ্রয়ী মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণই আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হবেন এবং কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করার এটাই হলো প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

মুত্তাকী ব্যক্তির দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যক্তিকে গায়েব তথা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। আল্লাহর কোরআনে অদৃশ্য বলতে সেই সমস্ত বাস্তব সত্যকে বুঝায়, যা মানুষ তার নিজস্ব কোন শক্তির মাধ্যমে দেখতে পায় না বা তার কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করতে পারে না। অর্থাৎ যা মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়–অতিন্দ্রীয়, ধরা–ছোঁয়ার বাইরে, এসব শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে–গায়েবের প্রতি দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে। স্বয়ং আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। তিনি অসংখ্য ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেছেন, এসব ফেরেশ্তা তাঁরই আদেশের আজ্ঞাবাহী এবং তাঁরা আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

তিনি তাঁর ফেরেশ্তার মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করেছেন, এসব ওহীর প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। মানুষের ভালো-মন্দের পুরস্কার হিসাবে তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি

করেছেন, এসবের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাকদীদের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়সমূহ যা কিছু রয়েছে, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হতে হবে এবং এটাকেই বলা হয় গায়েবের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান বিল গায়েব। কোন ধরনের শর্ত ব্যতিতই গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। মুত্তাকী ব্যক্তিগণ গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী হন, আর যাদের গায়েবের প্রতি বিশ্বাস নেই, তারা এই কোরআন থেকে কোনভাবেই উপকার গ্রহণ করতে পারবে না বা হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হবে না।

মুত্তাকীদের তৃতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, ঈমান বিল গায়েবের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে তা মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার পর সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। যে অদৃশ্য শক্তি মহান আল্লাহকে সে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করলো এবং মৌখিকভাব স্বীকৃতি দিল, সেই আল্লাহর আইন-বিধানের প্রতি আনুগত্যের মাথা তাকে নত করে দিতে হবে। আর আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রথম নির্দশন হলো নামাজ। ব্যক্তিকে নামাজ কায়েম করতে হবে। নামাজ হলো যাবতীয় কাজের মডেল এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি ও ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

এক ব্যক্তি যদি যোহরের আজানের কিছুক্ষণ পূর্বে ইসলাম কবুল করে, তাহলে আজানের ধ্বনি তার কানে পৌছা মাত্র তার ওপরে সর্বপ্রথম ফরজ কাজ হিসাবে পালনীয় হয় নামাজ। নামাজ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, নামাজই হলো ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। অর্থাৎ যে নামাজ আদায় করলো সে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করবে বলে প্রমাণ দিল। আর যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো না, সে এ কথারই প্রমাণ দিল যে, সে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করবে না। অর্থাৎ সে কুফরীকেই পছন্দ করলো।

সুতরাং, কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে হলে ব্যক্তিকে নামাজী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামাজ আদায় অন্যতম শর্ত আর নামাজ আদায় বলতে যা বুঝায়–সেভাবেই নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ নামাজ মানুষকে যা শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষা অনুসারে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত করতে হবে। নামাজ আদায়ের তাগিদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, নামাজ মানুষকে একমাত্র আল্লাহর গোলামে পরিণত করে। আল্লাহর গোলাম কাকে বলে

এবং গোলামের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, এ সম্পর্কে আমরা ইবাদাত শব্দের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে নামাজ আদায় করতে হবে এবং এই নামাজ একাকী আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমষ্টিগত পর্যায়ে আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। জামায়াত বদ্ধ নামাজের যে শিক্ষা, তা নামাজের বাইরের জীবনে অনুসরণ করতে হবে।

মুত্তাকীদের চতুর্থ গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে। মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ–اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ–الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ–وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ–

সেই পথে তীব্র গতিতে চলো, যা তোমাদের রব-এর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সব সময়ই নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে, দুরবস্থায়ই হোক আর সচ্ছল অবস্থায়ই হোক, যারা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। এসব নেককার লোককেই আল্লাহ খুবই ভালোবাসেন। (সূরা ইমরাণ-১৩৩-১৩৪)

মুত্তাকী ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণমনা বা কৃপণ হয় না। পৃথিবীর বুকে তারা ধন-দৌলত, অর্থ-সম্পদের গোলামী করে না। মহান আল্লাহ তাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে সম্পদ তার একার ভোগ করার জন্য এবং যেভাবে খুশী সেভাবে ভোগ করার জন্য তাকে দেয়া হয়নি, এই অনুভূতি তার মধ্যে সক্রিয় থাকে। তার এই ধন-সম্পদে অভাবী লোকদের অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার আদায়ে মুত্তাকী ব্যক্তি সচেতন থাকে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত হয়, সে আন্দোলনে মুত্তাকী ব্যক্তি অকাতরে, উন্মুক্ত অবারিত হস্তে অর্থ ব্যয় করে। অর্থ-সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে সে বৈধ-অবৈধতার সীমারেখার

প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। মুত্তাকী ব্যক্তি অভাবগ্রস্থ হলেও সামর্থানুসারে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যেমন অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তেমনি সচ্ছল অবস্থায় থাকলেও করে। অর্থাৎ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা মুত্তাকী ব্যক্তির স্বভাবে পরিণত হয়। মুত্তাকী ব্যক্তির গুণাবলী সম্পর্কে সূরা ইমরাণের উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের কথা বলতে গিয়ে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রোধের পরিবর্তে তাদের চরিত্রে সৃষ্টি হয় বিনয়।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, মুত্তাকীরা হলো রাহ্মানের বান্দাহ্। আর রাহ্মানের বান্দাহ্গণ যমীনে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। অন্যরা যদি কোন অপরাধ করে, সে অপরাধ তারা ক্ষমা করে দেয়। এসব হলো মুত্তাকী ব্যক্তিদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার প্রশস্ততা আকাশ ও যমীনের বিস্তৃতির সমান। আল্লাহ তা'য়ালা এই মুত্তাকী ব্যক্তিদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। সুতরাং চরিত্রে এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে হবে, তাহলে আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা যাবে।

রাব্বুল আলামীনের কিতাব থেকে হেদায়াত লাভের পঞ্চম শর্ত হলো, কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন নবী-রাসূলদের প্রতি যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নবীজীর প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, ইতোপূর্বেও তিনি মানুষের জন্য হেদায়াত অবতীর্ণ করেছিলেন। সূরা ইমরাণের ২-৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ
التَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيْلَ-مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ-

তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এটা সত্যের বাণী নিয়ে এসেছে এবং পূর্বের সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতিপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়াতের ও জীবন ব্যবস্থা হিসাবে তওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী।

অর্থাৎ মানুষের হেদায়াতের জন্য ইতোপূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আল্লাহর এই কোরআন সেসব কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। এই ঘোষণা এই অর্থে যে, তা ছিল আল্লাহর বাণী–স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। আল্লাহর এই ঘোষণার অর্থ এটা নয় যে,

বর্তমানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে যেসব কিতাব রয়েছে, তা তারা আল্লাহর বাণী হিসাবে দাবি করছে এবং কোরআনও তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে–বিষয়টি এমন নয়।

বরং এসব জাতি আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি সাধন করেছে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। এসব কিতাব যে বিকৃত করা হয়েছে, তার ভেতরে অসংখ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে, এর প্রমাণ স্বয়ং সেসব কিতাবই দিচ্ছে। আল্লাহর বাণী এবং মানুষের বাণীর মধ্যে প্রতিটি দিক থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। বর্তমানে যে বাইবেল রয়েছে, তার ভাব ও ভাষা, বর্ণনা ভঙ্গী, উপস্থাপনা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এসব কিতাব কিভাবে এবং কত দূর পর্যন্ত বিকৃত করা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে এসব কিতাবে কিভাবে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তারা যেসব কথা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করে থাকে, কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছে–তখনই তাদের মনগড়া কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। সুতরাং, কোরআন পূর্বে অবতীর্ণকৃত যেসব কিতাবের প্রতি মানুষকে ঈমান আনতে বলে, সেসব কিতাব অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীতে নেই।

সূরা বনী ইসরাঈলের ৫৫ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আমিই দায়ূদকে যাবুর দিয়েছি।' এই যাবুর কিতাব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ–اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ–

আর যাবুর কিতাবে নসীহতের পর আমি লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধীকারী আমার সৎ বান্দারা হবে। এতে এক মহাসংবাদ নিহিত রয়েছে আবিদ বান্দাদের জন্য। (সূরা আম্বিয়া)

অর্থাৎ কোরআন যেমন ঘোষণা করছে, যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী, গোলামী, পূজা-উপাসনা, আনুগত্য-ইবাদাত করবে, তারাই এই পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হবে, তেমনি এসব বিষয় পূর্বের কিতাবসমূহেও উল্লেখ ছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি যেসব সহীফা ও কিতাব যেমন হযরত দায়ুদ আলাইহিস্ সালামের প্রতি যাবুর, হযত মুছা আলাইহিস্ সালামের প্রতি তওরাত এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি ইন্জিল

কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, এসবের প্রতি এ ধরনের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই মানুষের হেদায়াতের জন্য আগমন করেছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং যুগে প্রয়োজন অনুসারে ওহীর মাধ্যমে কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করতে হবে। মানব মন্ডলীর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কোন জীবন ব্যবস্থা বা বিধান অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যারা অস্বীকার করে, নিজেরা কোন মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাবে কিছুটা বিশ্বাস রাখে এবং সেই সাথে এ কথা বলে যে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকৃতি দিতেন, আমরা সেসব কিতাবকেই শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি' এ ধরনের কোন মানুষ কোরআন থেকে কখনো হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

যেসব মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে অবতীর্ণ হয় না এবং এটা আল্লাহর নিয়ম নয়–বরং নবী-রাসূলদের ওপরেই তা অবতীর্ণ হয় ও তাঁদের মাধ্যমেই গোটা মানব জাতির কাছে তা পৌছে থাকে–আর এটাই আল্লাহর নিয়ম। এই বিশ্বাস যাদের আছে, তারাই কেবল কোরআন থেকে হেদায়াত লাভে সক্ষম হবে। সুতরাং মুত্তাকীদের এটাও একটি গুণ যে, তারা পূর্বে অবতীর্ণ করা কিতাবের প্রতি এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের পূর্বেও মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন।

মুত্তাকীগণ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য এটা ষষ্ঠ শর্ত। মানুষ এই পৃথিবীতে কোন দায়িত্বহীন জীব নয় এবং সে মনিবহীন কোন সত্তাও নয়। তাঁর একজন ইলাহ, মা'বুদ ও রব্ব আছেন। সেই রব্ব-এর নির্দেশ অনুসারেই তাকে এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করতে হয়। এই পৃথিবীতে সে যা কিছুই করবে, তার প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তাকে মহান আল্লাহর কাছে দিতে হবে। কারণ এই পৃথিবীই একমাত্র জগৎ নয়–বরং ইন্তেকালের পরে আরেকটি জগৎ বিদ্যমান।

বর্তমানের এই পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়, এটা সৃষ্টি হয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য। একদিন এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান এই জগতটি

নিমিষে মহান আল্লাহর আদেশে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। কোনদিন এবং কখন এ পৃথিবী ধ্বংস হবে, সে সংবাদ একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত আর কারো জানা নেই।

এই পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটার পরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরেকটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করবেন, সে জগতের নাম আখিরাত। সেখানে পৃথিবীতে মানব আগমনের দিন থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যত সংখ্যক মানুষের আগমন ঘটেছিল, সমস্ত মানুষকে একই সময়ে পুনরায় সৃষ্টি করে একত্রিত করবেন। পৃথিবীতে এসব মানুষ যা কিছু করেছে, তার হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন। সৎকাজ যারা করেছিল তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং অসৎকাজ যারা করেছিল, তাদের শাস্তির বিধান করবেন। এভাবে সমস্ত মানুষের কর্মের প্রতিফল সেদিন দেয়া হবে। মানুষ তার কর্মফল অনুসারে কেউ জান্নাত লাভ করবে আবার কেউ ভয়াবহ শাস্তির স্থান জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে।

এই পৃথিবীতে যারা সম্মান-মর্যাদা লাভ করেছে, বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে, প্রভূত শিক্ষা অর্জন করেছে, দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভ করেছে অথবা সরকারী কোন সম্মানজনক পদে আসীন হয়েছে, দেশের কোন শিল্প-কারখানার সত্ত্বাধিকারী হয়েছে, বিশ্বব্যাপী বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সাধারণ মানুষ এই অবস্থাকেই জীবনে সফলতা অর্জন করেছে বলে ধারণা করে। আর কোন মানুষ যদি উল্লেখিত কোন কিছুরই সুযোগ লাভ না করে, পৃথিবীতে সে চরম অভাবের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে, এক কথায় কোন প্রাপ্তিই যদি এই পৃথিবীতে না ঘটে, তাহলে মানুষ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে, লোকটি জীবনে কোন সফলতাই অর্জন করতে পারলো না।

প্রকৃত পক্ষে বর্তমান পৃথিবীতে সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতা মানুষের জীবনে সফলতা অর্জনের কোন মাপকাঠি নয়। মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা হলো আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর বিচারালয়ে যে ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করেছে বলে বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিচারালয়ে গ্রেফতার হয়ে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে, সেই ব্যক্তির গোটা জীবনই ব্যর্থ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ প্রকৃত জয়-পরাজয় ও সফলতা-ব্যর্থতা নিরূপণ হবে আখিরাতের ময়দানে।

মুত্তাকীগণ উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং এসব বিষয়ের প্রতি যাদের বিশ্বাস রয়েছে, তারাই কেবল আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম। মুখে মুখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কোরআনের প্রতি বিশ্বাস, নবীদের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে বলে দাবি করলেই হেদায়াত লাভ করা যাবে না। বরং এসব বিশ্বাসের সমন্বয়ে চরিত্র সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে মুত্তাকী বা পরহেযগার হতে হবে। এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করবে।

আর যাদের চরিত্রে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত রয়েছে, তারা কোরআন থেকে হেদায়াত পাবে না। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে হলে ডাক্তারকে নিজের চিকিৎসক বলে স্বীকৃতি দিয়ে তার ব্যবস্থাপত্র অনুসারে চলতে হবে, তাহলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে।

তেমনি কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে এটাকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকৃতি দিয়ে এর প্রতি ঈমান এনে আনুগত্য করতে হবে, আর আনুগত্যের প্রথম নিদর্শন হলো নামাজ আদায় এবং যাকাত ফরজ হলে তা আদায় করতে হবে। তারপর আনুগত্য পরায়ণ মন-মানসিকতা নিয়ে হেদায়াত লাভের জন্য কোরআনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। তখন এ কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা যাবে এবং ঈমান বৃদ্ধি লাভ করবে। আল্লাহ বলেন–

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ–

যারা ঈমান এনেছে, প্রত্যেক অবতীর্ণ সূরাই তাদের ঈমান সত্যই বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা এ কারণে খুবই আনন্দিত হয়। (সূরা তওবা-১২৪)

আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকীদের অনেকগুলো গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। কোরআনে বলা হয়েছে–

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ–

আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী

উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য জমীনে পরিভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজদায় অবনত, ভালো কাজের আদেশদানকারী, খারাপ কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী। (সূরা তওবা-১১২)

এই আয়াতে মুমিন-মুত্তাকী লোকদের চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিন-মুত্তাকী লোকগন মানব জাতির বাইরের কোন সৃষ্টি নয়–তারাও মানুষ, মানবীয় দুর্বলতা তাদের মধ্যেও বিদ্যমান। এই মানবিয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা যখনই আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হয়, তৎক্ষণাত তারা আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর কাছে তওবা করতে থাকে। তারা একবার মাত্র তওবা করে না, বরং বারবার তওবা করে।

এ জন্যই বলা হয়েছে, তারা বারবার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এরা আল্লাহর বন্দেগী, ইবাদাত তথা তাঁর আইন-বিধান অনুসরণকারী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা আল্লাহর প্রশংসা করে। আল্লাহ তাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, সে অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে তারা আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে। অভাব দরজায় এসে মুখ ব্যদন করে দাঁড়ালেও তারা কোন অভিযোগ করে না বরং আল্লাহরই প্রশংসা করে। আল্লাহর কাছে অভাব থেকে মুক্তি চায়। সচ্ছলতা এলেও তারা অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে।

মুমিন-মুত্তাকীগণ পৃথিবীতে ভ্রমণ করলেও তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ভ্রমণ করে। নিছক আনন্দ লাভের জন্য তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অথবা কোন পীর-ওলীর মাজারে গিয়ে সাহায্য লাভের আশাতে ভ্রমণে বের হয় না। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করে। মুমিন-মুত্তাকী লোকগণ পবিত্র ও উন্নত ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং তাদের ভ্রমণের লক্ষ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ কারণে তাদের ভ্রমণও আল্লাহর ইবাদাত হিসাবেই পরিগণিত হয়।

তারা ভ্রমণ করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করার জন্য, ইসলামের শত্রু অধ্যুষিত এলাকা থেকে হিজরাত করার জন্য, কোরআনের আদর্শ প্রচার ও প্রসারে লক্ষ্যে, মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে, ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য, এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রস্ফুটিত আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আল্লাহ তা'য়ালা যে রিযক দান করেছেন, তা অন্বেষণের জন্য।

মুত্তাকী-মুমিনগণ একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করেন প্রকাশ্যে ও গোপনে। নামাজের প্রতি তারা অবহেলা প্রদর্শন করেন না বা তাড়াহুড়া করে নামাজ আদায় করেন না। ধীর স্থিরভাবে নামাজ আদায় করেন। গভীর রাতে নির্জনে নিভৃতে তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকু ও সেজদায় অবনত থাকেন।

এরা সৎকাজের তথা আল্লাহর বিধানের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানান। ক্ষমতা অনুযায়ী তারা মানব সমাজে সৎকাজের আদেশ দিয়ে থাকেন এবং অসৎকাজের প্রতি বাধা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ যে জীবন বিধান দান করেছেন, সে বিধানের প্রতি সজাগ থেকে তারা জীবন পরিচালিত করে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মকে আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে সীমিত রাখে। এই সীমা অতিক্রম করে তারা স্বেচ্ছাচারিতা করে না। আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের মনগড়া আইনের বা কোন মানুষের বানানো বিধানের অনুসরণ করে না।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা চেষ্টা-সাধনাকারী। আল্লাহর বিধান যারা লংঘন করে, এরা তাদের গতিরোধকারী। আল্লাহর বিধান বা নির্ধারিত সীমা রেখাকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর রাখার ব্যাপারে তারা অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালনকারী। এই ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিগণই মুত্তাকী এবং এরাই কেবলমাত্র আল্লাহর নাজিল করা কিতাব থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে। যারা শুধুমাত্র ধার্মিক হিসাবে পরিচিতি লাভের আশায় বা নিছক ধর্ম পালনের জন্য নামাজ, রোজা, হজ্জ আদায় করে, অভাবী লোকজন একত্রিত করে যাকাত দানের প্রদর্শনী করে, নামাজের সময়টুকু ব্যতিত দিন ও রাতের অবশিষ্ট সময় মানুষের বানানো আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহর কোরআনের হেদায়াত তাদের নছীবে হয় না।

আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করার জন্য যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করার কথা বলা হয়েছে, তা অর্জন করে যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে পারবে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ–

বস্তুত এই ধরনের লোকজনই তাদের রব-এর কাছ থেকে অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ লাভের অধিকারী। (সূরা বাকারা-৫)

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক

মানুষ জানে না, কে সে? কোথেকে তার আগমন? কোথায় তাকে পুনরায় যেতে হবে? এই পৃথিবীতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? কে তার মনিব? সে কার দাসত্ব করবে? এসব প্রশ্নের জবাব মানুষের জানা নেই। পরম করুণাময় আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর নবীর মাধ্যমে মানব মনের এসব স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করেছেন। সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মুনিব এবং গোলামের সম্পর্ক। মানুষ আল্লাহর গোলাম−এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়, এই পরিচয় দেয়ার মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তুমি তোমার পরিচয় এভাবে পেশ করো−

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

আমরা কেবল তোমরাই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

অর্থাৎ সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী তুমি, তোমার একান্ত অনুগ্রহেই তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমাদের জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ তুমিই প্রতি মুহূর্তে সরবরাহ করছো। তুমিই আমাদের রব−তুমি আমাদের মনিব, আমাদের ইলাহ−আমাদের মাবুদ, তুমিই আমাদের শাসক। তুমিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমরা তোমারই গোলাম। আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করি, তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি। কেননা, তুমি ব্যতীত সাহায্য করার কেউ নেই। আমরা অপারগ, আমরা শক্তিহীন, দুর্বল, অসহায়, তোমারই মুখাপেক্ষী। তুমি মহীয়ান, গরীয়ান, সর্বশক্তিমান। তুমি আমাদের মনিব এবং আমরা তোমার গোলাম−এ কারণে আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। যাবতীয় ব্যাপারে আমরা তোমারই মুখাপেক্ষী। আর এটাই হলো আমাদের পরিচয়।

বান্দাহ্ এভাবে তাঁর মনিবের কাছে নিজের পরিচয় পেশ করলো, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।' পরিচয়টা এভাবে দেয়া হলো না যে, 'আমরা তোমার দাসত্ব করি।' পরিচয় পেশ করা হলো এভাবে যে, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।' তোমার শব্দটির সাথে 'ই' যোগ করে 'তোমারই' শব্দ ব্যবহার করে

একথাই দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হলো যে, আমরা অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করি না, আমরা শুধু তোমরাই গোলামী করি এবং যে কোন প্রয়োজনে আমরা তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ এই কথাটি উচ্চারণ করে সে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি দিয়ে দিল, সে অন্য কোন শক্তির আইন মানে না। সে দেশ, জাতি ও সামাজের প্রচলিত কোন প্রথা, পূর্ব পুরুষ কর্তৃক প্রচলিত কোন প্রথা, মানুষের বানানো কোন আইন সে মানে না। কারো বানানো কোন আইনের কাছে সে মাথানত করে না। সে একমাত্র মাথানত করে মহান আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে। এ কথার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলো এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র দাস বলে স্বীকৃতি দিয়ে নিজের পরিচয় পেশ করলো।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, অনন্ত অসীম মহাশক্তিধর কল্পনাতীত গুণাবলীর অধিকারী আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষুদ্র এই মানুষের অবস্থান কোথায়? মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর মানুষের কাছে নিজের যে শক্তি ও গুণাবলীর পরিচয় পেশ করেছেন, এর প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে মানুষকে কোন ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে? মানুষ সেই আল্লাহ্‌কে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে একজন মহাবিজ্ঞানী কুশলী স্রষ্টা মান্য করবে না তাঁকে মানুষ নিজের গোটা জীবনের দাসত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী মাবুদ, আইনদাতা, বিধানদাতা, প্রতিপালক এবং সার্বভৌম প্রভু বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই অবতীর্ণ করা জীবন বিধান অনুসরণ করবে? আল্লাহ্‌র প্রশংসা পর্ব শেষ করার পর পরই এ ধরনের নানা প্রশ্ন এসে মানুষের মনকে দোলায়িত করতে থাকে। এসব প্রশ্নের যুক্তি সংগত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তর লাভ না করা পর্যন্ত মানুষের অনুসন্ধানী মন কোন ক্রমেই স্থির হয় না বা হতে পারে না।

এ জন্য মানুষকে সন্দেহ-সংশয়ের আবর্ত থেকে উদ্ধার করে তার মন-মানসিকতাকে স্থির করার জন্যই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেয়া হলো, তুমি একমাত্র আল্লাহ্‌র গোলাম এবং সেই মহান স্রষ্টার গোলামী করাই তোমার সমগ্র জীবনের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য–যে স্রষ্টার প্রশংসা তুমি করলে, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অসীম দাতা ও দয়ালু এবং বিচার দিবসের অধিপতি–যাঁর কাছে তোমাদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজের চুলচেরা হিসাব দিতে তোমরা বাধ্য।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই–সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এ কথা মানুষকে শিখিয়ে দেয়ার অর্থই হলো, মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হলো যে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কটা কি। মানুষকে জানিয়ে দেয়া হলো, তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব করবে এবং আমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে–অর্থাৎ তোমরা কেবলমাত্র আমারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। আর এ কথাও পরিষ্কার যে, আমার মুখাপেক্ষী না হয়ে থেকেও তোমাদের কোন গত্যন্তর নেই, বিষয়টি তোমরা ভালোভাবে অবগত আছো। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত ক্ষণকালও তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারো না, আমার অনুগ্রহের ওপরেই তোমাদের সার্বিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এ জন্য তোমরা একমাত্র আমারই কাছে সাহায্য কামনা করবে এবং আমারই দাসত্ব করবে, এটাই তোমাদের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বস্তুত মানুষ কোন পশু বা প্রাণীর মতো জীব নয়। যারা পৃথিবীতে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যে, মানুষের অধঃস্তন পুরুষ হলো পশু। তারা মূলতঃ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কৌশল অবলম্বন করে গোটা পৃথিবীতে ভোগের এক ঘৃণ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞানবান মানুষই নিজের এই ঘৃণ্য অবস্থান কল্পনাও করতে পারে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এ কথা আল্লাহর কোরআন মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়ে বলেছে, মানুষকে আল্লাহর গোলামী করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ জন্য তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইতর প্রাণীর যেমন কোন ভবিষ্যৎ নেই, মানুষ তেমনি ভবিষ্যৎহীন সৃষ্টি নয়। মানুষকে বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

পূর্বেই এ কথা আমরা পবিত্র কোরআন থেকে উল্লেখ করেছি যে, এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। একটি বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা গোপন রাখা হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ–

আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, শুধুমাত্র এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই দাসত্ব করবে। (সূরা আয-যারিয়াত-৫৬)

বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। আর মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা হতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, মানুষ নিজেকে একমাত্র আল্লাহর মালিকানাধীন সত্তা স্বীকার করে নিবে এবং নিজেকে সেই গোলাম হিসাবে প্রস্তুত করবে।

কারণ মানুষ স্বয়ং নিজে উপাস্য, দাসত্ব লাভের অধিকারী, মনস্কামনা পূরণকারী, আইনদাতা ও বিধানদাতা তথা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোনক্রমেই হতে পারে না। এই অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর। মানুষ যদি আল্লাহর দাসত্ব করা ত্যাগ করে অন্য কোন সত্তার পূঁজা-উপাসনা করে, মূল সৃষ্টি কাজে অথবা বিশ্ব-পরিচালনায়, রিযিকদানে, সৃষ্টি রক্ষায় ও সামঞ্জস্য বিধানে, প্রার্থনা মঞ্জুর করার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কোন শক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে, তাহলে তা আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে শির্ক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পক্ষান্তরে মৌখিকভাবে এসব দিক দিয়ে আল্লাহকে স্বীকার করেও মানুষের ব্যবহারিক জীবন তথা বাস্তব জীবনের প্রতিটি বিভাগে, আইন-বিধান দান এবং সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন শক্তিকে-যেমন রাজনৈতিক নেতা, পীর-আলেম, বিচারক, সমাজপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানকে মেনে নেয়া হয় বা তাদের আনুগত্য করা হয়, তাহলেও তা মারাত্মক শির্ক হবে। মৌখিকভাবে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে, নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করে সেই সাথে মানুষের বানানো আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দিলে আল্লাহর ইবাদাত করা হয় না।

কারণ মানুষকে যে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র হৃদয়গত বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মাধ্যমে অর্জন হতে পারে না এবং শুধুমাত্র এর নামই ইবাদাত নয়। ইবাদাতের কাজে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে বাস্তবে তা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দু'চারটি দিক পালন করা হলো আর গোটা জীবন বিধানই মসজিদ মাদ্রাসায়

বন্দী করে রেখে আল্লাহর ইবাদাত যেমন করা হলো না, তেমনি নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে প্রস্তুত করাও হলো না। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিভাগেই আল্লাহর গোলামী করবে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করবে এবং সে বিধান গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করবে। এ লক্ষ্যেই সূরা ফাতিহায় আল্লাহর শিখানো ভাষায় বান্দাহ্ নিজের পরিচয় পেশ করছে–হে আল্লাহ! আমরা কেবল মাত্র তোমারই গোলাম, আমরা তোমারই দাসত্ব করি।

মহান আল্লাহও তাঁর বান্দাহ্কে জানিয়ে দিলেন, আমি মানুষকে সৃষ্টিই করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্ব করার লক্ষ্যে, মানুষ অন্য কারো দাসত্ব করবে, এ জন্য তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি। মানুষ আমার দাসত্ব করবে এ জন্য যে, আমি তাদের স্রষ্টা। অন্য কোন শক্তি যখন তাদেরকে সৃষ্টি করেনি, তখন অন্য কোন শক্তির কি অধিকার থাকতে পারে যে, তারা আমার সৃষ্টি করা মানুষের দাসত্ব লাভ করবে? মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমি–আমিই তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আর সেই মানুষ অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করবে, এটা কি করে যুক্তি সংগত ও বৈধ হতে পারে? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমার অন্যান্য সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করেছি, আর মানুষকে কেবলই আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি।

সমস্ত সৃষ্টি মানুষেরই জন্য

বস্তুতঃ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিজগতের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের খেদমতে নিয়োজিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا-

প্রকৃতপক্ষে তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিই এই মানুষের সহযোগিতায় নিয়োজিত। মানুষ যাবতীয় বস্তু নিচয়কে যেভাবে খুশী ব্যবহার করছে। কোন বস্তুই মানুষের সাথে বিদ্রোহ পোষণ করছে না। এমনটি কখনো হয়নি যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে অথচ ধাতব পদার্থ গলছে না। কোন বৃক্ষ কর্তন করা হচ্ছে, অথচ তা পূর্বের মতোই তার নিজস্ব অবস্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে থাকলো। আহারের উদ্দেশ্যে কোন

প্রাণীকে জবেহ দেয়া হচ্ছে, অথচ উদ্দেশ্যে অর্জন করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ যে বস্তুকে যেভাবেই ব্যবহার করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যাবতীয় বস্তু সেভাবেই সাড়া দিচ্ছে।

কেননা এসব মানুষের খেদমতের লক্ষ্যে সৃষ্টি করে তা মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মানুষের প্রতি এই আদেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে অনুসারে মানুষ পৃথিবীর জীবন অতিবাহিত করবে, যাবতীয় বস্তু নিচয় আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এভাবে মানুষ যদি নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহলে মানুষের জীবন সার্থক হবে, আর যদি সে দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচয় দেয় বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে–এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি–এই কথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা নামাজ আদায় করি, তোমাকে সেজ্‌দা করি, রমজান মাসে রোজা পালন করি, পশু কোরবানী দিয়ে থাকি, সামর্থ হলে হজ্জও আদায় করি, তোমার নামের যিকির করে থাকি অর্থাৎ এভাবেই আমরা ইবাদাত সম্পাদন করে থাকি। আসলে ইসলামে ইবাদাত বলতে যা বোঝানো হয়েছে, সেই ইবাদাত কি–তা না বুঝার কারণেই মাত্র গুটি কয়েক আনুষ্ঠানিক কাজকেই মানুষ ইবাদাত হিসাবে গণ্য করেছে। ইবাদাত শব্দটি 'আব্‌দ' শব্দ থেকে নির্গত। আব্‌দ বলা দাস ও বান্দাহ্‌কে। যেমন কোরআন যে আল্লাহর বাণী এ বিষয়ে মহান আল্লাহ অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ–

আমি আমার বান্দাহর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না, সেই বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো। (সূরা বাকারা-২৩)

উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত আব্দ শব্দ দিয়ে 'বান্দাহ্কে' অর্থাৎ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনি শুধু রাসূল ও নবীই নন-তিনি আল্লাহর একজন বান্দাও বটে। আরবী আব্দ ধাতুর মৌলিক অর্থ হলো, কোন শক্তির প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার মোকাবিলায় নিজের স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করা, নিজের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য নিঃশেষ করে দেয়া, সেই শক্তির ইচ্ছার কাছে অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করা। মূলতঃ দাসত্ব-গোলামী বা বন্দেগী করার মূল বিষয়ই এটি। একজন আরব বা আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই আব্দ শব্দ শোনার সাথে সাথে প্রাথমিক যে ধারণা লাভ করে তাহলো, দাসত্ব বা বন্দেগীর ধারণা। দাসের প্রকৃত কাজই হলো নিঃশর্তভাবে স্বীয় মুনিবের আনুগত্য আদেশানুবর্তিতা।

এভাবেই বিষয়টি থেকে আনুগত্যের ধারণা জন্ম নেয়। একজন দাস শুধু নিজের মুনিবের দাসত্ব, আনুগত্য এবং বন্দেগীর ভেতরে নিজেকে সমর্পিতই করে না, তার নিজের সমগ্র সত্তার সবটুকুই সমর্পণ করে দেয়। প্রতি মুহূর্তে সে মুনিবের প্রশংসা করতে থাকে, মুনিবের প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে থাকে। মুনিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সে সন্তুষ্ট চিত্তে দেহ-মন-মানসিকতা অবনত করে দেয়। মুনিবের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, মুনিবের ইচ্ছার বিপরীত পথে চলে, মুনিবের বিরোধিতা করে, সে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে।

ইবাদাত বলতে আনুগত্য করা, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং বান্দাহ্ হয়ে থাকা বুঝায়। আর যিনি আনুগত্য, পূজা-উপাসনা ও দাসত্বের ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তিনিই হলেন আব্দ বা বান্দাহ্। আরবী ভাষায় সাধারণতঃ 'ইবাদাত' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দাসত্ব ও গোলামী, আনুগত্য ও আদেশানুবর্তিতা এবং পূজা-উপাসনা। সূরা ফাতিহার উল্লেখিত আয়াতে 'ইবাদাত' শব্দটি একই সময়ে ঐ তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি-এই বাক্যটি উচ্চারণ করে বান্দাহ্ মহান আল্লাহকে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই পূজা করি। আমরা একমাত্র তোমারই অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু তোমারই আদেশ অনুসরণ করে চলি। আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি-তোমরাই গোলামী করি। আমাদের সাথে তোমার পূজা,

দাসত্ব-গোলামী, বন্দেগী, আনুগত্যের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে শুধু তাই নয়–এই সম্পর্ক অন্য কারো সাথে নেই এমনকি এই সম্পর্কের ব্যাপারে অন্য কারো সাথে আমাদের দূরতম সম্পর্কও নেই–একমাত্র তোমারই সাথে আমাদের ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করা, তসবীহ্ ও যিকির করার নামই ইবাদাত নয়–সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন অনুসরণ করার নামই হলো ইবাদাত। আল্লাহ বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ–

হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষেই একমাত্র আল্লাহরই বান্দাহ্ হয়ে থাকো, তাহলে যে সব পবিত্র দ্রব্য আমি তোমাদের দান করেছি, তা অসংকোচে খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো। (সূরা বাকারা-১৭২)

আরবের ইতিহাসেই শুধু নয়, গোটা পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, মানুষ নানা ধরনের প্রথার অনুসরণ করে আসছে। পূর্বপুরুষগণ যেসব প্রথা অনুসরণ করেছে, সেসব প্রথাসমূহ কোন ধরনের বিচার বিবেচনা ব্যতিতই অন্ধভক্তির সাথে পালন করা হচ্ছে। এই পৃথিবীতে মানুষ কোন কোন দ্রব্য আহার করে জীবন ধারণ করবে, সে ব্যাপারেও মানুষ নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। কোন কোন জনগোষ্ঠী নির্বিচারে যে কোন পশু-প্রাণী আহার করছে, আবার কোন জনগোষ্ঠী কিছু সংখ্যক পশু-প্রাণীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে তা আহার করা থেকে বিরত থাকছে। এ ধরনের প্রথা সে যুগে আরবেও বিদ্যমান ছিল। ইসলাম কবুল করে মুসলমান হিসাবে নিজেদেরকে দাবী করার পরে কোন ধরনের আইন-বিধান বা প্রথার অনুসরণ করার কোন অবকাশ আর থাকে না।

এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ঈমান এনে মানুষ যদি একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে মুখে মুখে সে দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজপতি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে আসা অবাঞ্ছিত প্রথা, আইন-বিধানের যে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

যা বৈধ করেছেন, তা অসংকোচে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে অবশ্যই দূরে অবস্থান করতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের হক আদায় হবে এবং মুসলমান হওয়া যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ আদায় করে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ করা জন্তু আহার করে সে মুসলমান।' অর্থাৎ নামাজ আদায় করা ও কিবলার দিকে মুখ করার পরও একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে জাহিলী যুগের সমস্ত বাধা-নিষেধ, পূর্বপুরুষদের অবাঞ্ছিত প্রথাসমূহ, মানুষের বানানো আইন-বিধানের প্রাচীর চূর্ণ না করবে এবং মানব সৃষ্ট অমূলক ধারণা বিশ্বাস ও কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ইসলামের অমীয় সুধায় সঞ্জীবিত হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বলে দাবী করার পরও মানুষের বানানো বাধা-বন্ধনের প্রভাব যার ভেতরে বর্তমান থাকবে, তাহলে বুঝতে হবে-সে ব্যক্তির শিরা-উপশিরায় মানব সৃষ্ট বিধানের বিষাক্ত ঘৃণিত ভাবধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, তা উল্লেখিত আয়াত স্পষ্ট করে দিল যে, তোমরা যদি সত্যই আমার গোলাম হয়ে থাকো, প্রকৃতপক্ষেই যদি তোমরা নেতা-নেত্রীদের আনুগত্য, আদেশানুবর্তিতা পরিত্যাগ করে আমার আনুগত্য গ্রহণ করে থাকো, তাহলে যে কোন ব্যাপারে নেতা-নেত্রীদের মনগড়া বিধানের পরিবর্তে আমার দেয়া বিধান অনুসরণ করতে হবে।

ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। ইবাদাত বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবনে যদি আমরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখি, তাহলে আমাদের মানব জন্ম বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে চিরতরে হারিয়ে যাবে। পরিণামে আদালতে আখিরাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো। মানুষের জীবনে সফলতা আর ব্যর্থতা নির্ভর করে এই ইবাদাত করার ওপর। ইবাদাত হলো, মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধার সৃষ্টি করে, সে শক্তিকে কোরআনের ভাষায় তাগুত বলা হয়।

তাগুত হলো সেই শক্তি, যে শক্তি শুধু নিজেই আল্লাহর আইন অমান্য করে না–অন্যদেরকেও অমান্য করতে বাধ্য করে। এই তাগুতকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে ইবাতাদের পরিপূর্ণ হক যেমন আদায় করা যাবে না, তেমনি ইবাদাতও হবে শির্ক মিশ্রিত। আর শির্ক মিশ্রিত ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। তা ধূলার মতোই উড়িয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহর নাজিল করা বিধান পালনের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাকেই তাগুত বলা হয়। আল্লাহর আইন অনুসারে এক ব্যক্তি তার ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন পরিচালিত করতে চায়, এ ক্ষেত্রে যদি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তারা হবে তাগুত। সামাজিক জীবনে সে আল্লাহর বিধান পালন করতে চায় অথচ সমাজপতি এ ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পালন করতে চায়, রাষ্ট্র তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। দলীয়ভাবে সে কোরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে চায়, অথচ সে দল আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে তাকে অগ্রসর করাতে চায়।

এভাবে যে শক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তারাই আল কোরআনের ভাষায় তাগুত হিসাবে চিহ্নিত হবে। এখন আল্লাহর আদেশ অনুসরণ না করে যারা তাগুতের আদেশ অনুসরণ করেছে, তাগুতের ইচ্ছার কাছে মাথানত করেছে, তারা আল্লাহর গোলাম না হয়ে তাগুতের গোলাম হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাঁরা তাগুতের গোলামী থেকে মানুষকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলাম বানানোর লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ–

তোমার পূর্বে আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁকে আমি ওহীর দ্বারা অবগত করেছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। (সূরা আম্বিয়া-২৫)

যত সংখ্যক নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁরা সবাই মানুষের প্রতি ঐ একই আহ্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন এক আল্লাহর ইবাদাত করে। একমাত্র

আল্লাহকেই ইলাহ বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর অনুসরণ করে। সমস্ত নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ জাতির প্রতি এভাবে আহ্বান জানিয়েছেন–

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ–

হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতিত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। (সূরা আল আরাফ-৮৫)

ইলাহ যেমন দু'জন হতে পারে না–তেমনি ইবাদাতও দু'জনের করা যেতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন–

وَقَالَ اللّٰهُ لاَ تَتَّخِذُوْاۤ اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ–اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ–فَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ–وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا–اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ–

আল্লাহর আদেশ হলো, দুই ইলাহ গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো। সমস্ত কিছু তাঁরই, যা আকাশে রয়েছে এবং যা রয়েছে এই পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই নিয়ম-পদ্ধতি সমগ্র বিশ্ব জাহানে চলছে। এরপরও কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে? (সূরা আন্ নাহ্‌ল-৫১-৫২)

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবাদাতের অর্থ হলো–মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা। কেউ যদি রাজনীতি করতে চায় বা রাজনৈতিক দলের একজন হয়ে কাজ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই কোরআনের বিধান অনুসারে তা করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে তথা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করবে, তারা অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর দাস হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে তাগুতের গোলাম হিসাবে চিহ্নিত হবে। জীবনের একটি বিভাগে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে, আর অন্যান্য বিভাগে তাগুতের ইবাদাত করা হবে, এ ধরনের শিরকপূর্ণ ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا–

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের রব-এর দীদার প্রত্যাশা করে, তার উচিত সৎকর্ম করা এবং নিজের রব-এর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো ইবাদাতকে শরীক না করা। (সূরা সূরা কাহ্ফ-১১০)

নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ বারবার এই স্বীকৃতিই দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে, আর নামাজ শেষেই সেই ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত করছে আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন দিয়ে, বিচারকের আসনে আসীন হয়ে বিচার কার্য পরিচালিত করছে মানুষের বানানো আইন দিয়ে, রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনীতি করছে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করছে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে, দেশের জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস–আল্লাহর মোকাবিলায় এ ধরনের শির্কমূলক কথা বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে, এভাবে আল্লাহর সাথে যারা মোনাফেকী করছে, তারা অবশ্যই তাগুতের গোলামী করছে।

ইবাদাতকে সীমিত কোনও একটি অর্থে সীমিত করা মূলতঃ ইসলামকেই সীমিত করার নামান্তর। যারা এই সীমিত ধারণা নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাদের ইবাদাত হবে অসম্পূর্ণ–অসমাপ্ত। মনে রাখতে হবে, এই অসম্পূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার জন্য কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সাহাবায়ে কেরাম রক্ত দিয়েছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত দিয়েছেন পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার জন্যেই। শির্কপূর্ণ ইবাদাত উৎখাত করে পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টিগত স্বভাব

মিরাজ উপলক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের যে চৌদ্দটি মূলনীতি দান করেছিলেন, তা সূরা বনী ইসরাঈল-এ বর্ণিত হয়েছে। সেই চৌদ্দটি মূলনীতির প্রথম নীতিই হলো–

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ–

তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারো ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

অর্থাৎ তোমার রব-এর পক্ষ থেকে এটা চূড়ান্ত রূপে ফায়সালা হয়ে গিয়েছে যে–দাসত্ব, গোলামী ও আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর গোলামী ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করা যাবে না। পূজা-উপাসনা করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর, অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন ধরনের গোলামী, দাসত্ব-আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করার কোন অবকাশ মানুষের জন্য নেই। এখন আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে, এই গোলামী, দাসত্ব-আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা কি জিনিস এবং মানুষকে কেন এটা করতে হবে।

এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মানুষ কারো না কারো আনুগত্য করতে চায়। মানুষ যত বড় শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, একটা অবলম্বন সে চায়। কোন অসহায় দুর্বল মুহূর্তে সে একটা অবলম্বন চায়। মনস্তত্ত্ববিদগণ গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন, প্রতিটি মানুষের মনই চেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, এমন একটি শক্তিকে অবলম্বন করতে চায়–যে শক্তির কাছে সে নিজেকে নিবেদন করবে। তার মনের একান্ত কামনা-বাসনাগুলো সে নিবেদন করে নিজেকে ভারমুক্ত করবে। প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণায় মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, সে যন্ত্রণা মানুষ কারো না কারো কাছে নিভৃতে নির্জনে ব্যক্ত করতে চায়।

দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এমন একটি অবলম্বন সে পেতে চায়, যার কাছে সে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে, নিজের মনকে হালকা করতে চায়। তার মনের অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলো, অবিকশিত কথাগুলো কারো কাছে ব্যক্ত করে, বিকশিত করে নিজেকে বোঝা মুক্ত করতে চায়। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিগত স্বভাব।

ঠিক তেমনি, মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে স্বাধীন রাখতে পারে না এবং সে ক্ষমতা মানুষের নেই। যেহেতু কোন মানুষই প্রবৃত্তি মুক্ত নয়–প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট করেই মানুষকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। মানুষের এই প্রবৃত্তির মধ্যেই সৃষ্টিগতভাবে নিহিত রয়েছে অন্য কারো আনুগত্য করা।

অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো, সে কাউকে অসীম শক্তিধর, ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করবে এবং কারো না কারো আনুগত্য করবে, কাউকে একান্ত আপন ভাববে, কারো কাছে সাহায্য কামনা করবে, কারো আদেশ-নির্দেশের মুখাপেক্ষী হবে, চরম বিপদের মুহূর্তে সে কোন শক্তিকে একমাত্র অবলম্বন মনে করবে। এই স্বভাব মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে প্রবিষ্ট করে দেয়া

হয়েছে। এ জন্য আনুগত্য করা, কোন প্রয়োজনের সামনে নিজেকে নত করে দেয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। খাদ্য গ্রহণ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। ক্ষুধা অনুভূত হলে সে অনুভূতি দূরিভূত করার লক্ষ্যে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করলেই ক্ষুধার অনুভূতি দূর হয়ে যায়।

অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হলে মানুষ খাদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ঠান্ডা অনুভূত হলে মানুষ শীতবস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। উষ্ণতা অনুভূত হলে মানুষ শীতলতা অনুসন্ধান করে অর্থাৎ শীতল বাতাস বা পরিবেশের আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃষ্টি তাকে সিক্ত করে দিতে পারে, এ জন্য সে মাথার ওপরে কোন আচ্ছাদনের আশ্রয় গ্রহণ করে।

নিজের মনের কথা ব্যক্ত করার প্রয়োজনে অর্থাৎ ভাবের আদান-প্রদান করার জন্য সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে। ভীতিকর অবস্থা থেকে মানুষ নিরাপত্তার অনুসন্ধান করে। এসব হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাড়িত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে পূজা-উপাসনার প্রেরণা-অনুভূতি প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কারো না কারো সামনে সে মাথানত করে নিজেকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবে, কারো আনুগত্য করবে, এই প্রেরণা মানুষের সমগ্র চেতনার মধ্যে বিরাজ করছে।

বন্দেগী এবং আনুগত্যের মূল বিষয় হচ্ছে, নিজেকে কোন উচ্চতর শক্তি বা সত্তার সামনে মাথানত করে দেয়া। আরবী ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, ইযহারে তাযাল্লুল। অর্থাৎ নিজেকে ছোট করা। এই নিজেকে ছোট করার বিষয়টি কিন্তু মোটেও তুচ্ছ করার বিষয় নয়। মাথানত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যেমন শ্রেষ্ঠ–তার মাথাও নত হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির সামনে। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

সুতরাং তাঁর সামনেই কেবল মানুষ মাথানত করতে পারে, অন্য কোন শক্তির সামনে অবশ্যই নয়। পৃথিবীর পশু-প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আহার গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা মাথা নীচু করে খাদ্যের কাছে নিয়ে যায়, তারপর খাদ্য গ্রহণ করে। গরু, ছাগল, উট, ঘোড়া মাথা নীচু করে খাদ্য গ্রহণ করে। হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য পাখী খাদ্যের সামনে মাথা নীচু করে খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের

ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। সে খাদ্যের সামনে মাথা নীচু করবে না, তাকে হাত দেয়া হয়েছে। হাত দিয়ে খাদ্য উঠিয়ে সে মুখে দিবে। এই বিষয়টি থেকে মানুষের জন্য শিক্ষনীয় হলো, মানুষের এই মাথা কারো কাছে নত হবে না। যিনি খাদ্যদান করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরই কাছে মাথানত হবে।

সংসদে মাথা নীচু করে প্রবেশ করা

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। ১৯৯৬ সনে আমাকে যখন আমার নিজের এলাকা ফিরোজপুর সদর এক নম্বর আসন থেকে এলাকার জনগণ পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদে পাঠালো, তখন পার্লামেন্টে একটি বিষয় আমি অবাক-বিস্ময়ে অবলোকন করলাম। কারণ ইতোপূর্বে আমি কখনো পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে সংসদ ভবনে প্রবেশ করিনি। সংসদ সদস্য হিসেবে জীবনের সর্বপ্রথম আমি সংসদ ভবনে প্রবেশ করার সময় অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্য সংসদে প্রবেশ করার সময় মাথা নীচু করে প্রবেশ করছে এবং বের হবার সময়ও ঐ একই ভঙ্গিতে বের হচ্ছে।

মনে হচ্ছে তারা যেন রুকু সেজদা দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। বিষয়টি আমাকে অবাক করলো। বিস্মিত দৃষ্টিতে বিষয়টি আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। সে মুহূর্তে বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে প্রবীণ একজনকে আমি প্রশ্ন করলাম, লোকজন এভাবে রুকু সেজদা দেয়ার মতো করে আসা-যাওয়া করছে কেন?

তিনি আমাকে জানালেন, পার্লামেন্টের রুল্‌স অব প্রসিডিওর-এ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে যে, এভাবে মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে হবে এবং বের হবার সময়ও সেই একই ভঙ্গিতে বের হতে হবে। যে বিধি-বিধান দিয়ে সংসদ পরিচালনা করা হয়, আমি সেই রুল্‌স অব প্রসিডিওর গ্রহণ করে তা পাঠ করে দেখলাম তার ভেতরে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৭ (২) বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের সংসদে প্রবেশ ও সংসদ থেকে বের হওয়ার সময় মাথা ঝুঁকানোর নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি আমাকে চরমভাবে ব্যথিত করলো। কারণ এই রীতি বা নির্দেশ ইসলামের বিধানের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। একজন মুসলমান

একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো কাছে মাথানত করতে পারে না। কেউ যদি তা করে তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ শির্ক। এই বিধি কোন মুসলমান অনুসরণ করতে পারে না। সংসদে কেউ ইচ্ছে করলেই কথা বলতে পারে না। কথা বলতে হলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে কথা বলতে হয়। আমি কার্যপ্রণালী বিধি পড়লাম। বাংলাদেশের সংবিধান পড়লাম।

এভাবে বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে কয়েক দিন পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করলাম। আমি স্পীকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললাম, এই সংসদের একটি বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে–যা সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে কার্যপ্রণালী বিধিতে যা উল্লেখ রয়েছে, সেটা আবার দেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম ধারায় উল্লেখ রয়েছে–সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সংবিধানে যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি–বলা হয়েছে, সেখানে এই সংসদে তার বিপরীত প্রথা চালু করা হয়েছে। মাথানত করে আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের যে রীতি এই সংসদে প্রচলিত রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এবং শির্ক। কারণ মানুষ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথানত করতে পারে না। মাথানত করে সম্মান প্রদর্শন করার এই প্রথা সম্পূর্ণ শির্ক–আর শির্ক সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ। নিঃসন্দেহে শির্ক হলো বড় ধরনের জুলুম। (সূরা লুকমান-১৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, তোমার দেহকে যদি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়, তোমাকে যদি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়, তবুও তুমি শির্কের প্রতি স্বীকৃতি দিবে না। সুতরাং এই সংসদে স্পীকারকে মাথানত করে সম্মান প্রদর্শনের যে প্রথা চালু রয়েছে, তা সম্পূর্ণ শির্ক, এটা কবীরা গোনাহ্–এই প্রথা হারাম। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি থেকে এই প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার প্রতি এটা দায়িত্ব ছিল এই শির্কের প্রতিবাদ করা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। যদি সেই হারাম বিধি বিলুপ্ত করা না হয়

তাহলে আপনি এবং এই সংসদে যারা আছেন, যারা এই প্রথা অনুসরণ করবেন- তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আসামী হিসাবে পরিগণিত হবেন।

আল হাম্‌দুলিল্লাহ্‌- ২০০১ সালের নির্বাচনের পর চার দলীয় জোট সরকার এই শির্‌কমূলক প্রথার ব্যাপারে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখন পার্লামেন্টের কোনো সদস্য পার্লামেন্টে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় স্পিকারের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকাতে বাধ্য নয়।

ইযহারে তাযাল্‌লুল-মানুষ নিজেকে ছোট করবে একমাত্র আল্লাহর সামনে-অন্য কারো সামনে নয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে মানুষ মাথানত করতে পারে না। বিভিন্ন দেশের আদালতে উকিল বিচারককে লক্ষ্য করে বলে থাকে, 'মাই লর্ড-My lord অর্থাৎ আমার প্রভু। মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রভু হলেন একমাত্র আল্লাহ। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের প্রভু কোনক্রমেই হতে পারে না। এভাবে কাউকে সম্বোধন করা সম্পূর্ণ হারাম। এসব হারাম প্রথা অমুসলিমগণ আবিষ্কার করে তা চালু করেছে। এসব প্রথা কোন মুসলমানের জন্য অনুসরণ করা বৈধ নয়।

প্রাকৃতিক আইন বনাম ইবাদাত

বন্দেগী বা আনুগত্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন চাকর তার মনিবের আনুগত্য করে। মনিব যা আদেশ করে, চাকর তা নিঃশর্তভাবে পালন করে থাকে। আনুগত্যের বিষয়টিকে আরো বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করতে গেলে বলা যায়, একটি দেশের জনগণ সে দেশের সরকারের আনুগত্য করে থাকে। প্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইনের আনুগত্য জনগণ করে থাকে।

মানুষ চেতনভাবেই হোক বা অবচেতনভাবেই হোক সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে, বিচারালয়ে, স্থলপথে যান-বাহনে, আকাশ যানে, শিক্ষাঙ্গনে, রাজপথে তথা সর্বত্র দেশের সরকারের আনুগত্য করে থাকে। আকাশ যান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আইন প্রচলিত রয়েছে, তার বিপরীত কোন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারে না। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় যাত্রীকে সে আইন অনুসরণ করেই আকাশ যানে পরিভ্রমণ করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, যত সংখ্যক

মানুষ যে সরকারের কর্তৃত্ব সীমায় বসবাস করে এবং সরকারী আইনের অনুবর্তন করে, তারা সরকারের আনুগত্য করছে। এ কথাটিকে আরবীতে বলতে গেলে বলতে হবে, জনগণ সরকারের ইবাদাত করছে, আনুগত্য করছে, গোলামী করছে—দাসত্ব করছে।

ইবাদাতের এই ধারণাকে আরো বিস্তৃত অঙ্গনে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সৃষ্টির সর্বত্রই একটি নিয়ম ক্রিয়াশীল। সমস্ত সৃষ্টিই একটি বিশেষ নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃক্ষ, তরু-লতা, সাগর-মহাসাগর, বিশাল জলধী, মৃদু-মন্দ বেগে বা দ্রুত বেগে প্রবাহিত সমীরণ, জীব-জগতের প্রতিটি স্পন্দন, পাহাড়-পর্বত, অটল-অচল হিমাদ্রী, উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গাম ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বর্ধিতকরণ, সবুজ শ্যামল বনানীতে পাখীর কুঞ্জন, জীবের বংশবৃদ্ধিকরণ ও নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে তার অপসারণ, মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহের নিয়ন্ত্রিত বিচরণ, বায়ুমন্ডলের কার্যকরণ, গ্যাসীয় স্তরসমূহের সতর্ক বিচরণ, তাপের আধার সূর্যতাপের ভূ-পৃষ্ঠে নিয়ন্ত্রিত আগমন—এসবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, তারা নিঃশর্তভাবে কারো আইন অনুসরণ করছে, আইনের আনুগত্য করছে তথা কোন শক্তির ইবাদাত করছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন—

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্যের পন্থা পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর নির্দেশের অধীন হয়ে আছে। (সূরা আলে ইমরান-৮৩)

মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি আমার দেয়া জীবন ব্যবস্থা ত্যাগ করে অন্যের বানানো জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করো ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, তার সব কিছুই আমার সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছে।

এই ভূ-পৃষ্ঠের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে শুরু করে ঐ বিশাল বিস্তৃত মহাশূন্যে বিচরণশীল দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান গ্রহ-উপগ্রহ-নিহারিকাপুঞ্জ, নক্ষত্র জগৎ অবধি যা কিছু যেখানে রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর নিয়মের আনুগত্য করছে

তথা আল্লাহর ইবাদাত করছে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা যে আইন জারী করেছেন, তার বিপরীত কিছু করা বা তার ব্যতিক্রম করার কোন অবকাশ নেই। এমনটি নয় যে, সৃষ্টির এসব কিছু মানুষের মতো ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর আইন কিছুটা অনুসরণ করছে আবার অন্যের আইনও কিছুটা অনুসরণ করছে। সৃষ্টির এসব বস্তু শির্‌ক মিশ্রিত ইবাদাত করছে না, তারা পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত রয়েছে। এভাবে গোটা বিশ্বচরাচর ইবাদাত, দাসত্ব, গোলামী, আনুগত্য, পূজা-উপাসনা করছে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি কারো নেই। এটাকেই ইংরেজী ভাষায় বলা হয় Law of nature। আরবী ভাষায় বলা যেতে পারে কানুনে ফিতরাত আর বাংলায় বলা হয় প্রাকৃতিক আইন। এই আইনকে লংঘন করার ক্ষমতা কারো নেই।

সমগ্র সৃষ্টিজগৎ যে আইন অনুসরণ করে চলেছে অর্থাৎ সৃষ্টি জগতসমূহ ও তার যাবতীয় বস্তু যে বন্দেগী বা ইবাদাত করছে, পবিত্র কোরআন এই ক্রিয়াশীল পদ্ধতিকে তথা বন্দেগী বা ইবাদাতকে নানা শব্দে উপস্থাপন করেছে। কোরআন কোথাও এটাকে সরাসরি ইবাদাত হিসাবে উল্লেখ করেছে, আবার কোথাও তাক্‌দীস বলেছে, কোথাও তাস্‌বীহ আবার কোথাও সুজুদ শব্দে প্রকাশ করেছে। কোন কোন স্থানে কুনুত শব্দেও বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুই আল্লাহর এবং যেসব ফেরেশ্‌গণ তাঁর নিকটে রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করছে। বন্দেগী করার ভেতরে কোন ধরনের ত্রুটি করছে না। তারা রাত দিন তাঁর প্রশংসা কীর্তনে মাথানত করে কোন ধরনের শৈথিল্য ছাড়াই আল্লাহর আনুগত্য করছে।'

ফেরেশ্‌তাদের মানুষের ন্যায় বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, তারা বিরামহীনভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে যাচ্ছে। কত সংখ্যক ফেরেশ্‌তা আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন, তার কোন পরিসংখ্যান জানার কোন উপায় মানুষের কাছে বিদ্যমান নেই। অসংখ্য ফেরেশ্‌তা সেজদায় নিয়োজিত রয়েছেন, রুকু সেজদায় রয়েছেন, দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তারা সে দায়িত্ব কোন ধরনের শৈথিল্য ছাড়াই বিরামহীন গতিতে পালন করে যাচ্ছেন। এভাবে সৃষ্টির সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর আনুগত্য করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে সৃষ্টির সমস্ত কিছুর আনুগত্যকে ইবাদাত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই ঐ মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ মহাপবিত্র শাসকের গুণ-কীর্তন করছে।'

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর গোলামী করছে

সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছু আল্লাহর আনুগত্য করছে, এ বিষয়টিকে পবিত্র কোরআনে তাস্‌বীহ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ইউছাব্বিহু লিল্লাহি-আল্লাহর তাস্‌বীহ পড়ছে, ছাব্বাহা-ইউছাব্বিহু-তাছ্‌বিহান-অর্থাৎ তাস্‌বীহ পড়েছে, তাস্‌বীহ পড়ছে এবং তাস্‌বীহ পড়বে। এই পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আকাশ ও যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই আল্লাহর তাস্‌বীহ পড়তে থাকবে। হযরত ইউনুছ আলাইহিস্ সালাম ঘটনাক্রমে মাছের পেটে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জীবিত থাকবেন এমন আশা ছিল না। বিশাল আকৃতির মাছ তাকে পেটে নিয়ে সাগরের অতল তলদেশে অবস্থান করছিল। তিনি মাছের পেটে গভীর অন্ধকারে অবস্থান করে শুনতে পেলেন, সমস্ত দিক থেকে মহান আল্লাহর তাস্‌বীহ পাঠ করা হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের ক্ষুদ্র বালুকণা, শৈবালদাম, পাথরের নুড়িসহ সমস্ত কিছু আল্লাহ নামের যিকির করছে। এভাবে গোটা সৃষ্টিজগত থেকেই আল্লাহ নামের আওয়াজ ভেসে আসছে। এই যিকির শোনর মতো কান যাদের আছে, তাঁরা শুনতে পান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ-وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ-

সাত আকাশ-যমীন এবং তার মধ্যে যতসব বস্তু আছে-সকলেই আল্লাহর তসবীহ পড়ছে। এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রশংসা-স্তুতির সাথে তাঁর তসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পারো না। (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৪)

এ আয়াতেও তসবীহ শব্দ দিয়ে সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু যে ইবাদাতে রত রয়েছে-আনুগত্য করছে, তা বুঝানো হয়েছে। সূর্য-চন্দ্র, বৃক্ষ, তরু-লতা আল্লাহর বন্দেগী, দাসত্ব বা আনুগত্য করে যাচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ-وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ-

চন্দ্র-সূর্য সবাই পরিক্রমণে নিয়োজিত। তারকামালা ও বৃক্ষরাজি আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে আছে। (সূরা রাহ্মান-৫-৬)

এ আয়াতে ইয়াছজুদান শব্দের মাধ্যমে প্রকৃতির সকল বিষয়ের আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। উদ্ভিদরাজি আল্লাহর তসবীহ পাঠ করছে। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অকারণে বৃক্ষের পত্র-পল্লব ছিন্ন করবে না। কারণ বৃক্ষের পত্র-পল্লব আল্লাহর তসবীহ পাঠে রত রয়েছে।' প্রয়োজনে গাছ কাটা যেতে পারে, কিন্তু অকারণে তার পাতা ছেঁড়া যাবে না। গোটা প্রকৃতি আল্লাহর আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব, পূজা-উপাসনা করছে–এ বিষয়টি পবিত্র কোরআন কুনুত শব্দ দিয়েও উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালা বলেন–

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ-

আকাশ ও পৃথিবীতে যতো কিছু রয়েছে, তা সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর সবকিছুই তাঁর আদেশের অনুগত। (সূরা রূম-২৬)

এই পৃথিবী পৃষ্ঠের সামান্য একটি ধূলিকণা থেকে শুরু করে ঐ তুষার আবৃত অটল-অচল হিমাদ্রী, মহাশূন্যের কোয়াশার, বিশাল আকৃতির অদৃশ্য দানবীয় ব্লাকহোল, ছায়াপথ আল্লাহর গোলামী করছে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ঐ আল্লাহর নির্দেশেই নিয়মিত হয়ে চলেছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত, জোয়ারের টানে এই লবণাক্ত পানি নদীর মিষ্টি পানির সাথে মিশে যায়। আবার ভাটির টানে নদীর মিষ্টি পানি সমুদ্রের লবণাক্ত পানির সাথে মিশে যায়। এর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

অথচ লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির ভেতরে মিশ্রিত হয়ে মিষ্টি পানির মৌলিক গুণাগুণ পরিবর্তন করতে পারে না। আবার মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির মধ্যে মিশ্রিত হয়ে লবণাক্ত পানির মৌলিক গুণাগুণ নষ্ট করে দিতে পারে না। রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে আবর্তিত হচ্ছে। সময়ের যে মুহূর্তে পৃথিবীর যে এলাকায় রাত অবস্থান করে, সেই মুহূর্তে সেখানে দিনের আলো প্রকাশিত হয়না। আবার যেখানে যে মুহূর্তে দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেখানে রাতের ঘনকালো অন্ধকার ছেয়ে যায় না। এসব কিছু আল্লাহর ইবাদাত করছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ-وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে অতিক্রম করে, রাতের ক্ষমতা নেই দিনকে অতিক্রম করে; এসব কিছুই মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৪০)

আল্লাহর নিয়মে পরিবর্তন হয় না

আল্লাহ রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্যের প্রতি যে দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তারা কোন ধরনের বিশ্রাম ব্যতীতই পালন করে যাচ্ছে। পবিত্র কোরআন বলছে, ইলা আজালিম্ মুছাম্মা-অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা এভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকবে। তারপর একদিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ যে জিনিসকে যেভাবে ইবাদাত করার আদেশ দিয়েছেন, গোটা প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসই সেভাবেই ইবাদাত করে যাচ্ছে। নারকেল গাছ কখনো তাল দেবে না, আম গাছ কখনো লিচু দেবে না। কাঁঠাল গাছ কখনো বেল দেবে না। গোটা প্রকৃতি জুড়ে আল্লাহ তা'য়ালা যে নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তার পরিবর্তন কখনো হবে না-হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً-

আল্লাহর নিয়ম-যা পূর্ব থেকেই কার্যকর রয়েছে, আর কখনও আল্লাহর এ নিয়মে কোন ধরনের পরিবর্তন দেখবে না। (সূরা ফাতাহ্)

অর্থাৎ আমার প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে, আমার Law of nature-এর মধ্যে কখনো কোন পরিবর্তন হবে না। এমনটি হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে। কিন্তু সেই ব্যক্তি তার মুখের যে জিহ্বা দিয়ে মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে, সেই জিহ্বাও আল্লাহর ইবাদাত করছে। কিভাবে করছে-জিহ্বার প্রতি মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, তার কাজ হচ্ছে যে বস্তুর যে স্বাদ তা গ্রহণ করে জিহ্বা ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুভূতির ভেতরে তা সঞ্চারিত করা। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ব্যক্তি যে জিহ্বা ব্যবহার করে উচ্চারিত করলো, 'আল্লাহ নেই' সেই ব্যক্তি যদি তার জিহ্বার ওপরে কোন তিক্ত, কটু বা অম্ল জাতিয় বস্তু রেখে আদেশ দিল, এই বস্তুগুলোর প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করে তা আমার অনুভূতিতে সঞ্চারিত করতে পারবে না।' অথবা বস্তু তার প্রকৃত স্বাদ

সঞ্চারিত না করে ভিন্ন স্বাদ তাকে সঞ্চারিত করবে—এ ধরনের কোন আদেশ কি জিহ্বা পালন করবে? নাস্তিক ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগের স্থলে অর্থাৎ টয়লেটে প্রবেশ করে তার ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় নাসিকার প্রতি লক্ষ্য করে গুরু গম্ভীর স্বরে আদেশ করলো, 'দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি আমার হাত দিয়ে নাক চেপে ধরার মতো কাজটি করতে অস্বস্তি বোধ করছি। সুতরাং তুমি দুর্গন্ধ গ্রহণ করে আমার অনুভূতিতে ছড়িয়ে দিবে না, পারলে তা সুগন্ধিতে পরিণত করে আমার অনুভূতিতে ছড়িয়ে দাও।'

এভাবে দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি যত আদেশই দেয়া হোক না কেন, শরীরের কোন একটি অঙ্গই তাতে সাড়া দেবে না। কারণ তারা শরীরের অধিকারী ব্যক্তির ইবাদাত করে না, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মহান আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রয়েছে। যাকে যে ক্রিয়া সম্পাদনের আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা তাই পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতি যে ইবাদাত করে যাচ্ছে, যে আনুগত্য প্রদর্শন করছে, তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। এভাবে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই মহান আল্লাহর ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা করার মাধ্যমে জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে অঙ্গুলী সংকেত করছে—আল্লাহ আছেন এবং আমরা যেভাবে তাঁর গোলামী করছি, তোমরাও সেভাবে আল্লাহর গোলামী করো।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কোন শক্তির আনুগত্য করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বা জন্মগত স্বভাব। গোটা সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করে এবং তা একটি নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, আনুগত্য করছে তা অবলোকন করে মানুষের মনে অবচেতনভাবেই সুপ্ত আনুগত্যের প্রবণতা জাগরিত হয়েছে। যারা প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে বা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে, তারা দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান কোন শক্তিকে স্রষ্টা বা স্রষ্টার প্রতিনিধি অনুমান করে তার পূজা-উপাসনায় নিয়োজিত হয়েছে।

এভাবে কেউ বিশাল আকৃতির গাছের, অগাধ জলধীর, সূর্য-চন্দ্রের, নিজ হাতে নির্মিত মৃত্তিকা মূর্তির, তারকামালার, পশু-প্রাণীর এবং পৃথিবীর মাটিকে নিজের মা মনে করে পূজা-উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। পূজা-উপাসনা করতে করতে মানুষ এতটা নীচের স্তরে নেমে গিয়েছে যে, দেহের প্রধান প্রজনন অঙ্গকে শক্তির প্রতীক মনে করে সেটারও পূজা মানুষ করছে। মানুষ এসবকে নিজের ইলাহ মনে করে তার

পূজা-অর্চনা করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন- إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ-

আমি-ই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং, তুমি কেবল আমারই ইবাদাত করো। (সুরা ত্বা-হা-১৪)

মানুষের সৃষ্টিগত প্রবৃত্তি আনুগত্য করা

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি আনুগত্য করা। কিন্তু আনুগত্যের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষ নিজের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এসব প্রাকৃতিক শক্তিকে ইলাহ মনে করে তার আনুগত্য, পূজা-উপাসনা করে থাকে। চিন্তা করে দেখে না, এসবের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। তারা যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, যাদেরকে তারা শক্তির উৎস মনে করে পূজা-উপাসনা, আনুগত্য করছে, তারাও তেমনি ঐ আল্লাহরই সৃষ্টি। এসব কিছুই ঐ মহান আল্লাহর আনুগত্য করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যার পূজা-উপসনা, আনুগত্য করছে, তারাও তাদেরই অনুরূপ আমার গোলাম। (সূরা আল আরাফ-১৯৪)

অর্থাৎ তোমরা যাকে ইলাহ মনে তার আনুগত্য করছো, বন্দেগী করছো, ইবাদাত করছো, ওটাও আমারই ইবাদাত করছে এবং তুমি যেমন আমার গোলাম, তুমি যার ইবাদাত করছো, সেটাও আমারই গোলাম। সুতরাং আমার সৃষ্টির গোলামী ত্যাগ করে আমার গোলামী করো। তোমরা যাদেরকে ডাকছো, তারা এ সংবাদ পর্যন্ত জানে না যে, তোমরা তাকে ডাকছো এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা তোমাদের ডাকের সাড়া দিতে পারবে না। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ-

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে-এ সংবাদ পর্যন্ত যাদের জানা নেই। (আহ্কাফ-৫)

আনুগত্য প্রবণতার কারণে একশ্রেণীর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের আনুগত্য বা ইবাদাত করে থাকে, তারা মানুষের কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করতে সমর্থ নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ–

এবং তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। (সূরা ইউনুস-১৮)

একশ্রেণীর নির্বোধ মানুষ যাদের আনুগত্য, ইবাদাত করে থাকে, তারা কোন ক্ষতিও করতে পারে না, আবার কোন উপকারও করতে পারে না। এদের ওপরে যদি একটি মাছিও বসে, এরা সে মাছিকেও তাড়িয়ে দিতে অক্ষম। আল্লাহ বলেন–

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا–

বলো! তোমরা কি আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত পূজা-উপাসনা করছো? যারা না পারে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে, না পারে কোন উপকার করতে। (সূরা মায়েদাহ্-৭৬)

একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারো কোন কল্যাণ-অকল্যাণ সাধিত হতে পারে না। যেহেতু তিনিই মানুষের প্রতিপালক। তাঁরই গোলামী করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ-لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوْهُوَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ–

সে আল্লাহই তোমাদের রব। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি সমুদয় বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করো এবং তিনি সব জিনিস সম্পর্কে যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। (সূরা আনআম-১০২)

মানুষ যাদেরকে আনুগত্য, বন্দেগী, গোলামী ও ইবাদাত লাভের যোগ্য মনে করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি হয়ে আরেক সৃষ্টির দাসত্ব-গোলামী করা নির্বুদ্ধিতা বৈ আর কিছু নয়। একশ্রেণীর মানুষ আগুনকে শক্তির প্রতীক মনে করে তার পূজা করে থাকে। অথচ সেই আগুনের মধ্যে যখন মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো, তখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিজেকে আগুনে ফেলে দেয়ার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। কারণ তিনি জানতেন,

তিনি যে আল্লাহর গোলামী করেন, এই আগুনও সেই আল্লাহরই গোলাম। আগুনকে যদি আল্লাহ আদেশ করেন, তাহলে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করতে পারে। আর আল্লাহ যদি আগুনকে আদেশ না করেন, তাহলে আগুনের ক্ষমতা নেই তার দেহের একটি পশমকে পুড়িয়ে দেয়। সেই চরম মুহূর্তে আল্লাহর ফেরেশ্তাগণ এসে তাঁকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল, এক আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ফেরেশ্তাদের সাহায্য প্রস্তাব বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, আল্লাহ আগুনকে আদেশ দিলেন ইবরাহীমের প্রতি আরামদায়ক হয়ে যাওয়ার জন্যে, আগুন আরামদায়ক হয়ে গেল। উত্তপ্ত অগ্নিকুন্ড পরিণত হলো চিত্তাকর্ষক মনোরোম দৃশ্য সম্পন্ন পুষ্প উদ্যানে। বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বিষয়টি এভাবে প্রকাশ করেছেন–

আজ ভি হো যো ইবরাহীম কা ইমাঁ পয়দা
আগ্ কার ছাক্তি হ্যায় এক আন্দাজ গুলিস্তা পয়দা।
ইবরাহীমের ঈমান যদি আজও কোথাও হয় বিদ্যমান
গড়তে পারেন অগ্নিকুন্ডে খুব সুরত এক গুলিস্তান।

অর্থাৎ এখনো যদি ইবরাহীমের মতো ঈমান কারো ভেতরে জাগ্রত হয় এবং তাকে যদি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে অগ্নিকুন্ড পুষ্প কাননে পরিণত হতে পারে। সুতরাং গোলামী করতে হবে মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'য়ালার। একজন গোলাম হয়ে আরেকজন গোলামের কাছে হাত বাড়ালে সে হাত অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে। একজন দাস আরেকজন দাসকে কিছুই দিতে পারে না। একজন পথের ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে কিভাবে ভিক্ষা দিতে পারে?

সৃষ্টিজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, একটি পশু আরেকটি পশুর আইন মানে না, আনুগত্য করে না, দাসত্ব করে না, ইবাদাত করে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হয়ে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সামনে কিভাবে মাথানত করতে পারে? কিভাবে মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষের বানানো আইনের গোলামী করতে পারে? সুতরাং, বিশ্বপ্রকৃতি–প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ, প্রাকৃতিক আইন মানুষকে যেদিকে–যে শক্তির ইবাদাত করার জন্য নীরব নির্দেশ করছে, মানুষের স্বভাবজাত সেই আনুগত্যকে সেদিকেই প্রদর্শন করতে হবে।

আত্মার বিকাশ ও ইবাদাত

এই পৃথিবী বা সৃষ্টিজগতে ক্রিয়াশীল যে নিয়ম রয়েছে, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এসব কিছু অনুভব করার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের শ্রবণ শক্তি-দর্শন শক্তি দান করেছেন। চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ-

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দান করেছি। তাকে শ্রবণ শক্তি দান করেছি। দৃষ্টি শক্তিদান করেছি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি।

জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, চোখ, কান খেল-তামাশার জন্য দেয়া হয়নি। প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি কোন দিকে, কোন মহাশক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, তা অনুধাবন করে তাঁর গোলামী-দাসত্ব করার জন্যই দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়লো, কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টার প্রতি তার দাসত্বের অঙ্গুলি সংকেত ধরা পড়লো না। এই কান দিয়ে মানুষ প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু শুনলো, কিন্তু মহান আল্লাহর আহ্বান সে শুনলো না, তার কানে মহাসত্যের ডাক প্রবেশ করলো না।

যে জ্ঞান মানুষকে দেয়া হলো, সে জ্ঞান প্রয়োগ করে সে দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলো, মানুষ যেন শকুনের থেকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দূর-বহু দূরের বস্তু দর্শন করতে সক্ষম হয়। সে আকাশ যান আবিষ্কার করলো যেন পাখির চেয়ে দ্রুত গতিতে মহাশূন্যে উড়তে পারে। স্থলপথে দ্রুত যান আবিষ্কার করলো যেন সে চিতা বাঘের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে পারে। সে সাবমেরিন আবিষ্কার করলো যেন মহাসাগরের অতল তলদেশে মাছের থেকেও দ্রুত গতিতে চলতে পারে।

মৃত্তিকা গভীরে কোথায় কি অবস্থান করছে, শতকোটি দূরে মহাশূন্যে কোন গ্রহের কি অবস্থা, তা পর্যবেক্ষণ করছে, মহাশূন্যে উড়ন্ত পাখী যেখানে পৌঁছতে সক্ষম নয়, মানুষ সেখানে তার গর্বিত পদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে–অথচ তার আত্মার বিকাশ সাধনে সে চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে। এক আল্লাহর আনুগত্যের, দাসত্বের, গোলামীর মাধ্যমে মানুষের আত্মার বিকাশ সাধিত হয়, মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় এবং এটাই মানব জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত সাফল্য–এই ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যর্থতার গ্লানী বহন করছে। আল্লাহর গোলামীর মাধ্যমে মানুষের মনুষত্ব বিকশিত হতে না দেখে কবি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

মুঝে এ ডর হ্যায় কে দিলে জিন্দা তু না মর যা–য়ে
কি জিন্দেগানী ইবারাত হ্যায় তেরে জিনেছে।

হে আমার জাগরিত আত্মা, আমি তোমার অপমৃত্যু ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করছি। সত্যই যদি তোমার অপমৃত্যু ঘটে, তাহলে আমার জীবিত থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই।

বর্তমানে আমরা আমাদের আত্মার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কোন ভূমিকা পালন করছি না। আমাদের অসাবধানতার কারণে, আমাদের অসচেতনতা–অবহেলার কারণে জীবন্ত আত্মার অপমৃত্যু ঘটছে। মানুষ তার দেহের সৌন্দর্য বর্ধিত করার লক্ষ্যে অসংখ্য উপকরণ আবিষ্কার করেছে। পোষাক-পরিচ্ছদের উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিদিন নিত্য-নতুন ফ্যাশন বের করছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকশিত করার লক্ষ্যে আত্মার উন্নতি সাধন করার জন্য কোন ধরনের প্রচেষ্টা নেই।

মানুষকে হৃদয় দেয়া হলো, চোখ-কান দেয়া হলো, চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দেয়া হলো, এসব প্রয়োগ করে তারা বস্তুগত উন্নতি সাধন করলো। অথচ প্রধান যে দিকটির উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে এসব দান করা হয়েছিল, সেদিকে তারা দৃষ্টিপাত করলো না। যারা এ ধরনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, পবিত্র কোরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ এরা সব চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। (সূরা আরাফ)

কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব তথা আত্মার বিকাশ সাধিত হলে মানুষ তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজের আত্মার পরিচিতি যখন লাভ করে, তখন সে তার প্রতিপালকের পরিচয়ও অবগত হতে পারে। কিন্তু আত্মাকে চেনা বা মনুষ্যত্বের

বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে মানুষের কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। এ জন্যই পবিত্র কোরআন এই শ্রেণীর মানুষকে পশুর সাথে তুলনাই শুধু করেনি, পশুর থেকেও অধম হিসাবে উপস্থাপন করেছে। কারণ এক শ্রেণীর মানুষ তার মনিবের পরিচয় না জানলেও পশু তার মনিবের পরিচয় জানে। কুকুর তার মনিবকে চিনে এবং মনিবের আদেশ পালনে তৎপর থাকে। অথচ একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহকে চিনে না, তাঁকে অস্বীকার করে। সুতরাং ঐ অস্বীকারকারী মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণীর সম্মান ও মর্যাদা মনিবের কাছে অনেক বেশী।

মানুষের আত্মার খাদ্য

মানুষের আত্মা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে বিকশিত হবে, তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ এই আত্মার অবস্থান, তার আকার-আকৃতি সম্পর্কে মানুষ অবগত নয় এবং সে জ্ঞানও মানুষের নেই। সুতরাং যে জিনিস সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক কোন জ্ঞান নেই, সেই জিনিসের উন্নতি ও বিকাশ সাধন মানুষ করবে কিভাবে?

এ জন্য আত্মার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আত্মার যিনি স্রষ্টা–যিনি আত্মার আকার-আকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন, তিনিই পদ্ধতি দান করেছেন। একটি বিষয়ের প্রতি মানুষকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষসহ জীবকুলের জীবিত থাকার প্রয়োজনে, জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অসংখ্য খাদ্য উপকরণের একটিও মহাশূন্যে পাওয়া যাবে না। সমস্ত খাদ্য পাওয়া যায় জল-স্থলে। খাদ্যসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রই হলো পানি আর মাটি। কারণ মানুষের দেহ নির্মিত হয়েছে মাটির সার-নির্যাস থেকে। যা দিয়ে দেহ নির্মিত হয়েছে, দেহের প্রয়োজনে তা থেকেই উৎপাদিত খাদ্য দেহ গ্রহণ করে দেহের উন্নতি সাধিত হয়।

কিন্তু দেহের চালিকা শক্তি হলো আত্মা বা রুহ্। এই রুহ্ মাটির সার-নির্যাস দিয়ে প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে মাটি থেকে উৎপাদিত কোন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রুহের নেই। মৃত্তিকা থেকে রুহ্ আহরোণ করে দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়নি, এ জন্য মাটিতে উৎপাদিত কোন খাদ্য দ্বারা রুহের বিকাশ সম্ভব নয়। যেখান থেকে রুহ্ মানব দেহে প্রেরণ করা হয়েছে, সেই স্থান থেকেই রুহের খাদ্যও প্রেরণ করা হয়েছে। রুহ্কে এই খাদ্যদান করলেই কেবল রুহ্ বিকশিত হয় তথা মনুষ্যত্বের উন্নতি সাধন হয়। এই রুহ্ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার কোন শেষ নেই। আল্লাহর

রাসূলকেও রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ-قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً-

এরা আপনাকে রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দিন, এই রুহ্ আমার রব্ব-এর আদেশে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো।

এই রুহ্কে বিকশিত করার জন্য এর খাদ্য প্রয়োজন। রুহ্ আল্লাহর আদেশে আগমন করেছে আলমে আরওয়াহ্ থেকে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার খাদ্যও প্রেরণ করেছেন লৌহ মাহ্ফুজ থেকে। লৌহ মাহ্ফুজ থেকে প্রেরিত রুহের সেই খাদ্যের নাম হলো কোরআন। এই কোরআন সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভরে তিলাওয়াত করতে হবে, এর আদেশ-নিষেধ একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করতে হবে। রুহের খাদ্যই হলো আল্লাহর কোরআন। দেহকে খাদ্য না দিলে দেহ যেমন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে, কর্মের উপযোগী আর থাকে না, তেমনি আত্মাকেও খাদ্য না দিলে আত্মা দুর্বল নির্জীব হয়ে পড়ে। বাহন হিসেবে বা কৃষি কাজের জন্য যারা চতুষ্পদ জন্তু ব্যবহার করে, এসব জন্তুকে প্রয়োজনীয় খাদ্য দিতে হয়। নতুবা জন্তু কর্ম উপযোগী থাকে না। খাদ্য না দিয়ে জন্তুকে কর্মে নিয়োগ করলে জন্তু অক্ষমতার পরিচয়ই দিবে।

তেমনিভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও আত্মার উন্নতিকল্পে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য না দিলে সে নিজেকে এবং তার বাহন দেহকে কিভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত করবে? আত্মাকে তার প্রকৃত খাদ্য না দিলে আত্মা কি নিজেকে বিকশিত করতে পারে না? অবশ্যই পারে। মানুষ যেমন তার প্রকৃত খাদ্য না পেলে বা দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার লোকজন অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করে নিজেদেরকে দুর্বল করে, তেমনি আত্মা তার প্রকৃত খাদ্য লাভ না করলে অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করবে অর্থাৎ আত্মা কদর্য রূপে গর্হিত পথে ধাবিত হবে। আত্মার প্রকৃত খাদ্য কোরআন যদি সে লাভ করতো, তাহলে সে নিজেকে বিকশিত করতো সুন্দর ও কল্যাণের পথে। সে আত্মার দ্বারায় পৃথিরীতে মানবতার কল্যাণ সাধিত হতো। গোটা পৃথিবী জান্নাতের এক উদ্যানে পরিণত হতো।

কোরআন নামক খাদ্য লাভকারী আত্মা সুন্দর আর কল্যাণের সুষমায় বিকশিত হয়ে শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন মুক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ, ভীতিহীন সুখী সমৃদ্ধশালী এক পৃথিবী

মানবতাকে উপহার দিতে সক্ষম হতো। ইসলামের সোনালী যুগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সে সময়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের শাসকগোষ্ঠী পর্যন্ত সবাই দেহকে অতিরিক্ত খাদ্য দিয়ে স্ফিত না করে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্ট করতেন। ফলে তারা পৃথিবীতে সত্য আর কল্যাণের পতাকা উড্ডিন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুদূর অতীতে এবং বর্তমানেও যারা আত্মাতে তার প্রকৃত খাদ্য না দিয়ে দেহকে বৈধ-অবৈধ খাদ্য দিয়ে স্ফিত করেছে বা করছে, তারা সত্য, সুন্দর আর কল্যাণের হন্তারক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপী শোষণ, নির্যাতন আর অশান্তির দাবানল বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এসব আত্মা প্রকৃত খাদ্য যখন লাভ করছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই আত্মা অখাদ্য আর কুখাদ্য লাভ করে অন্যায় অসুন্দরের পথেই ধাবিত হচ্ছে।

এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে আশে-পাশে বিচরণশীল মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে–অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআনের বিধান অনুসারে চলে, তারা সত্য সুন্দর আর কল্যাণ পিয়াসী। আর যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে না–অর্থাৎ কোরআনের বিপরীত পথে চলে, তারা সত্য সুন্দর কল্যাণের হন্তারক, অশান্তি সৃষ্টিকারী, অরাজকতা সৃষ্টিকারী ও মানবতার ধ্বংস সাধনকারী। এই কোরআনই আত্মার একমাত্র উৎকৃষ্ট খাদ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব এনে দিয়েছি যাকে আমি জ্ঞান-তথ্যে সুবিস্তৃত বানিয়েছি এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। (সূরা আরাফ-৫২)

এই কোরআন মানুষকে নিরাময়তা দান করে। কলুষিত আত্মাকে সুন্দর শুভ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মার কলুষ-কালিমা দূর করে। আল্লাহ বলেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

আমি এই কোরআন নাজিল প্রসঙ্গে এমন কিছু নাজিল করি যা ঈমানদারদের জন্য নিরাময়তা ও রহমত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২)

এই কোরআন মানুষকে সত্য সহজ সরল পথপ্রদর্শন করে। মানুষকে নিরাময়তা দান করে প্রকৃত সত্যে উপনীত করে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ–

এদেরকে বলো, এই কোরআন ঈমানদার লোকদের জন্য তো হেদায়াত ও নিরাময়তা। (সূরা হামিম সিজদা)

এই কোরআন মানুষের আত্মাকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্যবোধ শিক্ষা দেয়। কোরআন প্রদর্শিত পথে যে আত্মা ধাবিত হয়, সে আত্মার দ্বারাই পৃথিবীতে মানবতা বিকশিত হয়। সুতরাং কোরআন তেলাওয়াত করে এবং এর বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে আত্মাকে বিকশিত করতে হবে, তাহলেই কেবল ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা সম্ভব হবে।

গোলামী হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য

ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। এই ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাতের মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ–

(হে রাসূল !) আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাত করো। (সূরা যুমার-২)

এ আয়াতে আল্লাহ্র ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সে ইবাদাত হতে হবে এমন, যা আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ আয়াতে ইবাদাত শব্দের পরে দ্বীন শব্দের ব্যবহার করে এ কথাই দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ইবাদাত বা দাসত্বের সাথে মানুষ যেন আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত না করে, বরং সে যেন একমাত্র আল্লাহ্রই পূজা-উপাসনা, বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্ব করে। একমাত্র তাঁরই আদেশ অনুসরণ করে। ইবাদাত তো কেবল তারই করা যেতে পারে, যিনি অসীম শক্তিশালী এবং অক্ষয়-চিরঞ্জীব। যা ভঙ্গুর এবং ক্ষণস্থায়ী তার ইবাদাত করা যেতে পারে না। কোরআনে সূরা মু'মিনের ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

هُوَ الْحَيُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টিজগতের রব্ব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহই হলেন বাস্তব ও প্রকৃত সত্য। তিনি অনন্ত এবং অনাদি। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর সত্তা ব্যতিত আর কারো সত্তাই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। সমস্ত কিছুর অস্তিত্বই আল্লাহ প্রদত্ত, মরণশীল ও ধ্বংসশীল। সুতরাং ইবাদাত হতে হবে একমাত্র সেই সত্তার জন্য, যিনি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ তাঁরই ইবাদাত করবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তাঁরই আদেশ অনুসরণ করবে এবং তাঁরই আনুগত্য করবে।

এই ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে বলেই বর্তমানে মানুষ ইবাদাত বলতে শুধু কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মকেই একমাত্র ইবাদাত বলে মনে করেছে। নামাজ আদায় করা যেমন ইবাদাত তেমনি নামাজ আদায় না করাও ইবাদাত। রোজা পালন করাও ইবাদাত এবং রোজা পালন না করাও ইবাদাত। নামাজ সঠিক ওয়াক্তে আদায় করার নাম ইবাদাত। আবার নিষিদ্ধ সময়ে অর্থাৎ সূর্য উদয়ের সময়, অস্তের সময় এবং সূর্য ঠিক যখন মাথার ওপরে অবস্থান করে, এ তিন সময়ে নামাজ আদায় না করাও ইবাদাত। এই তিন সময়ে সেজ্দা করা জায়েয নেই–হারাম করা হয়েছে। সক্ষম হলে গোটা বছর রোজা পালন করলে ইবাদাত হবে, কিন্তু বছরে পাঁচ দিন রোজা পালন না করা ইবাদাত। এই পাঁচ দিন রোজা পালন করা হারাম করা হয়েছে।

মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মই ইবাদাত

মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মকেই ইবাদাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মানুষের চোখের চাওনি-এটাও ইবাদাতে পরিণত হতে পারে। এই চোখের দৃষ্টি দিয়ে কোন সন্তান যদি তাঁর গর্ভধারিণী মাতা ও জন্মদাতা পিতার দিকে পরম মমতাভরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আল্লাহর রাসূল বলেন, সে সন্তানের আমলনামায় একটি কবুল নফল হজের সওয়াব লেখা হবে। উপস্থিত সাহাবাগণ জানতে চেয়েছেন, কোন সন্তান যদি প্রতিদিন একশত বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে কি সে একশত কবুল নফল হজের সওয়াব লাভ করবে?

আল্লাহর রাসূল জবাব দিলেন, তোমরা জেনে রেখো, মহান আল্লাহর রাহমতের ভান্ডার অফুরন্ত। আল্লাহর কোন বান্দাহ্ যদি প্রতিদিন তার মাতা-পিতার দিকে

একশত বার মমতা আর শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে বান্দার আমলনামায় প্রতিদিন একশত কবুল নফল হজ্জের সওয়াব লেখা হবে। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মই ইবাদাত।

উঠা-বসা, হাঁটা-চলা, কথা বলা, কথা শোনা, দাঁড়ানো, ঘুমানো, আহার করা, বিশ্রাম করা, মলমূত্র ত্যাগ করা, স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করা, সন্তান প্রতিপালন করা, চাকরী করা, ব্যবসা করা, শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করা, যুদ্ধ করা, যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা, আন্দোলন-সংগ্রাম করা, নেতৃত্ব দেয়া, কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করা, বিচার-মীমাংসা করা, দেশ শাসন করা, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা, জনসেবা করা, কল্যাণকর কোন কিছু আবিষ্কার করা তথা যে কোন ধরনের বৈধ কর্মকান্ড করাই হলো ইবাদাত। শর্ত শুধু একটিই যে, সমস্ত কর্ম হতে হবে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়। এ জন্যই সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে–আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব বা ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

আরবী না'বুদু শব্দের মধ্যে দুটো কাল রয়েছে। একটি বর্তমান কাল এবং অন্যটি ভবিষ্যৎ কাল। নামাজের মধ্যে বান্দাহ্ ইয়্যা কানা'বুদু বলে এ কথারই স্বীকারোক্তি করে যে, আমি তোমার আদেশে এখন নামাজ আদায় করছি। ক্ষণপূর্বে আমার জন্য যেসব কাজ হালাল ছিল, নামাজের মধ্যে আমার জন্য সেসব হালাল কাজগুলো হারাম হয়ে গিয়েছে। তোমার দেয়া বৈধ খাদ্যগুলো আমার জন্য আহার করা বৈধ ছিল, নামাজ আদায়ের সময়ে তোমার আদেশে সে বৈধ খাদ্য গ্রহণ করা আমি আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি। তুমি আমাকে বাকশক্তি দান করেছো, আমার জন্য কথা বলা বৈধ ছিল।

আমি এইক্ষণে তোমার আদেশ অনুসারে কথা বলা হারাম করে দিয়েছি। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে দৃষ্টিশক্তি দান করেছো। চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করা আমার জন্য বৈধ ছিল। নামাজ আদায়ের এই মুহূর্তে এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা তোমার আদেশে আমি আমার জন্য হারাম ঘোষণা করে তা থেকে বিরত রয়েছি। আমি আমার জন্য চিরস্থায়ী হালাল বিষয়গুলো নামাজ আদায়ের মুহূর্তে স্বল্প সময়ের জন্য যেমন তোমার আদেশে হারাম করেছি, তেমনি তুমি যে বিষয়গুলো চিরস্থায়ীভাবে হারাম করে দিয়েছো, নামাজের বাইরে আমি আমার জীবনে সে বিষয়গুলোও হারাম ঘোষণা করবো।

ইয়্যা কানা'বুদু–বলে বান্দাহ তাঁর আল্লাহর কাছে বর্তমান কালে যা করছে এবং ভবিষ্যতে কি করবে, সে কথারই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। অর্থাৎ যেভাবে তোমার আদেশে নামাজ আদায় করছি, নামাজের বাইরের জীবনও তোমারই আদেশ অনুসারেই পরিচালিত করবো। আল্লাহকে সেজ্‌দা দিলেই সওয়াব লাভ কার যায়। কিন্তু আল্লাহর দেয়া নিয়ম হলো, নামাজের এক রাকাতের মধ্যে সেজদা দিতে হবে দুটো।

কোন ব্যক্তি যদি দুটো সিজদার পরিবর্তে অধিক সওয়াবের আশায় পাঁচ ছয়টি সেজদা দেয়, তাহলে তার নামাজই হবে না। ফজরের ফরজ নামাজ দুই রাকাত আদায় করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি দুই রাকাতের স্থলে চার রাকাত আদায় করে তাহলে তা ইবাদাত হবে না।

এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি যদি যোহরের ফরজ নামাজ চার রাকাতের স্থলে ছয় রাকাত আদায় করে, মাগরিবের ফরজ নামাজ তিন রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত আদায় করে, তাহলে সে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর আইন লংঘন করেছে বলে বিবেচিত হবে এবং সে হবে আল্লাহদ্রোহী। যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করাই হলো ইবাদাতের সঠিক তাৎপর্য। এই তাৎপর্য অনুধাবন করেই আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদাত করতে হবে।

মানুষ নামাজ আদায় করে যার আদেশে, সে তার গোটা জীবন পরিচালিত করবে একমাত্র তাঁরই আদেশে। যাঁর আদেশে নামাজ আদায় করা হচ্ছে, তাঁরই আদেশে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত হবে। নামাজে সেজ্‌দা দেয়া হচ্ছে যাঁর আদেশে, একমাত্র তাঁরই আদেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, স্বরাষ্ট্র নীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প-বাণিজ্য নীতি পরিচালিত হবে। নামাজ যাঁর আদেশে আদায় করা হচ্ছে, দেশের সরকার ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট একমাত্র তাঁরই আদেশ অনুসারে পরিচালিত হতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা হবে। এগুলো যদি না হয়, তাহলে এই অসম্পূর্ণ ইবাদাত দিয়ে সফলতা আশা করা বৃথা।

সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে আনুগত্যের মস্তক নত করে দিতে হবে ঐ মহান আল্লাহর সামনে–যিনি সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর পরিচালক, শাসক ও প্রতিপালক। আল্লাহর ওপরে বান্দার যেমন হক রয়েছে, তেমিন রয়েছে বান্দার ওপরে আল্লাহর

হক। আল্লাহর রাসূল বলেন, বান্দার ওপরে আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দাহ্ কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব বা ইবাদাত করবে, এই ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাত মিশ্রিত করবে না, ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন শির্‌ক করবে না। গোলামী, বন্দেগী, ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর। এটাই হলো বান্দার ওপরে আল্লাহর হক। আর আল্লাহর ওপরে বান্দার হক হচ্ছে, সেই ইবাদাতকারী আবেদ বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়ে জান্নাত দান করবেন।

নেতা-নেত্রীর ইবাদাত করা

আল্লাহর বিধান এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করে কোন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, আইনবিদের বিধান ও নেতৃত্ব অনুসরণ করা এবং এসব চিন্তাবিদগণকে বা নেতাদেরকে মৌখিকভাবে আল্লাহর শরীক বলে ঘোষণা না দিলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাদেরকে শরীক করারই শামিল। বরং এসব ব্যক্তিত্বদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেও যদি আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় তাদের বানানো আইন-বিধানের আনুগত্য করা হয়, তাহলেও আনুগত্যকারী শির্‌কের অপরাধে অভিযুক্ত হবে-এতে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় যেসব মানুষ ভিন্ন বিধান অনুসরণ করতে আদেশ দেয়, অনুপ্রাণিত করে, কোরআন এদেরকে শয়তান হিসাবে ঘোষণা করেছে। অথচ মানুষ শয়তানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে থাকে। এভাবে অভিশাপ দেয়ার পরও যারা এসব মানুষরূপী শয়তানদের অনুসরণ করবে, কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছে-তোমরা শয়তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছো। এই শির্‌ককে বিশ্বাসগত শির্‌ক না বলে-বলা হয় কর্মগত শির্‌ক। এই ধরনের কর্মগত শির্‌ক যারা করছে, কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হবে এবং এদের সম্পর্কে কোরআনের সূরা আহ্‌কাফের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে -

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا-

তাহলে সেদিন এরা কি করবে যেদিন এদের রব এদেরকে বলবেন, ডাকো সেই সব সত্তাকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে?

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, যেমন প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এই লক্ষ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রণয়ন করে নেতৃবৃন্দ এবং দলের কর্মীরা তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ময়দানে তৎপরতা চালায়। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, কর্মীরা ময়দানে তাই পালন করে। এখন এসব নির্দেশ যদি ইসলামের বিপরীত হয় এবং কর্মীরা যদি তা পালন করে, তাহলে তারা পরোক্ষভাবে ঐ দলের নেতৃবৃন্দকেই নিজেদের প্রভু বলে মেনে নিল এবং তারা নেতৃবৃন্দের ইবাদাত করলো। অথচ এই কর্মীরা মুখে আল্লাহকেই প্রভু বলে স্বীকার করে। এটাই হলো কর্মগত শিরক। এই শিরক থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান যারা দিল, তারাই হলো তাগুত। এদের বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করার জন্যই কোরআন মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। কোরআন বলছে–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-لاَ انْفِصَامَ لَهَا-

যারা তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা এমন শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে যে, যা কখনোই ছিঁড়ে যাবার নয়। (সূরা বাকারা-২৫৬)

মুখে মুখে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। প্রথমে অন্যের তথা তাগুতের আনুগত্য অস্বীকার করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে। তারপর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরই নিরঙ্কুশ আনুগত্য–ইবাদাত করতে হবে। আরবী ভাষায় কারো ফরমানের অনুগত হওয়া এবং তার ইবাদাতকারী হওয়া প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কারো বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করে সে যেন তারই ইবাদাত করে।

এভাবে ইবাদাত শব্দটির তাৎপর্যের ওপর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাঁর ছাড়া অন্য সবার ইবাদাত পরিত্যাগ করার যে আদেশ নবী-রাসূলগণ তাঁদের মহান আন্দোলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন, তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ কি ছিল তা অনুধাবন করা যায়। তাঁদের কাছে ইবাদাত নিছক কোন পূজা-উপাসনার অনুষ্ঠান ছিল না। তাঁরা মানুষকে এই আহ্বান জানাননি যে, তোমরা আল্লাহর পূজা-উপাসনা করো এবং দেশ ও জাতির নেতৃবৃন্দের বা অন্য দার্শনিক-চিন্তাবিদ বা ভিন্ন কোন শক্তির বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে থাকো। বরং তাঁরা যেমন মানুষকে

আল্লাহর পূজারী হিসাবে গড়তে চাইতেন সেই সাথে সাথে আল্লাহর আদেশের অনুগতও করতে চাইতেন। ইবাদাত শব্দের এই উভয় অর্থের দিক দিয়ে তাঁরা অন্য কারো ইবাদাত করাকে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্টতা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইবাদাত শব্দের অর্থ দাসত্ব ও আনুগত্য বুঝায় এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদদের কথায়। মূসা ও হারুন আলাইহিস্ সালামের আহ্বানের জবাবে তারা বলেছিল–

فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ–

আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন লোকের প্রতি ঈমান আনবো? আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস। (সূরা মু'মিনুন-৪৭)

অর্থাৎ যে জাতিকে ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদগণ শাসন করতো, সে জাতিকে তারা নিজেদের গোলাম বা দাস মনে করতো। হযরত মুছা ও হারুন আলাহিস্ সালাম ছিলেন ফেরাউনের অধীনস্থ জাতির সন্তান। এ জন্য তারা তাদের কথার মধ্যে উল্লেখ করেছিল, এরা দু'জন নিজেদেরকে নবী হিসাবে দাবী করে নিজেদেরকে আমাদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে, এরা আমাদের মত মানুষই শুধু নয়–যারা আমাদের আইন-বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য, আমাদের আনুগত্য, বন্দেগী, গোলামী ও ইবাদাত করে–অর্থাৎ আমাদের দাস, সেই দাস সম্প্রদায়ের সন্তান এরা।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা গেল, কোন শাসকের শাসনাধীনে বাস করে শাসকের আনুগত্য করাকেও ইবাদাত বলা হয়। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামও তাঁর জাতিকে বলেছিলেন–

اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ–

তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করে চলো এবং আমার আনুগত্য করে কাজ করো। (সূরা নূহ-৩)

তিনি তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন, সমস্ত কিছুর বন্দেগী, দাসত্ব ও গোলামী সম্পূর্ণ পরিহার করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহকেই নিজের একমাত্র মা'বুদ মেনে শুধু তাঁরই পূজা-উপাসনা-আরাধনা করবে। একমাত্র তাঁরই দেয়া আইন-বিধান, আদেশ-নিষেধের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো আনুগত্য করবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের ওপরে কোরআন

অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও যেসব জাতির কাছে আল্লাহর বিধান নবী-রাসূলদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের প্রতিও একই আদেশ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন–

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ–

আর তাদেরকে এই আদেশ ব্যতীত অন্য কোন আদেশই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করবে নিজেদের দীনকে তাঁরই জন্য খালেছ করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। (সূরা বাইয়্যেনা-৫)

উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট ইবাদাত

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি–সূরা ফাতিহায় বান্দাহ এ কথাটি আল্লাহর কাছে নিবেদন করলো। কিন্তু বান্দাহ্ জানে না দাসত্ব করা ও সাহায্য প্রার্থনা করার সঠিক পদ্ধতি কোনটি এবং তার ইবাদাতের লক্ষ্য কি। এ জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে বান্দাহ্কে অনুগ্রহ করে সঠিক পদ্ধতি অবগত করেছেন বান্দার ইবাদাত কাকে লক্ষ্য করে করা হবে, তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

তোমরা প্রতিটি ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকো, নিজের দীনকে শুধুমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। (সূরা আল আ'রাফ-২৯)

এ আয়াতে ইবাদাত ও প্রার্থনা সম্পর্কে লক্ষ্য স্থির করতে বলা হয়েছে। ইবাদাতের লক্ষ্য নির্ভুল না হলে সমস্ত ইবাদাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইবাদাতের লক্ষ্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগীর সামান্যতম অংশও যেন আল্লাহর ইবাদাতের সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। প্রকৃত মাবুদ ব্যতিত অন্য কারো প্রতি আনুগত্য, দাসত্ব, বিনয় ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা যেন কোনক্রমেই মনে স্থান লাভ করতে না পারে। পথ-প্রদর্শন, সাহায্য ও মদদ লাভ এবং সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করতে হবে। কিন্তু ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনা করার পূর্ব শর্ত হলো, নিজের দীনকে পরিপূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

জীবনের গোটা ব্যবস্থা চলবে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ অনুসারে, রাজনীতি-অর্থনীতি পরিচালিত হবে ইসলাম বিরোধী শক্তির নির্দেশ অনুসারে,

আল্লাহ্ বিরোধী নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা হবে, আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহের দাসত্বের ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত বিভাগ চলবে আর দোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয়া হবে, এ ধরনের ইবাদাত আর দোয়া-সাহায্য প্রার্থনার সামান্যতম কোন মূল্য নেই। আর এটাই হলো ইবাদাতের লক্ষ্য ভ্রষ্টতা। এ ধরনের দ্বিমুখী ইবাদাত করা আর আল্লাহর কাছে এভাবে সাহায্য চাওয়া, 'রাব্বুল আলামীন, আমরা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, এই যমীন থেকে তোমার ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার কর্মসূচী ঘোষণা করেছি, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো-আমরা যেন আমাদের আন্দোলনে সফল হই'–সমান কথা।

সুতরাং ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহ্। তাঁরই ইবাদাত ও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। মানুষ যে কোন কাজে সফল হবার পূর্বে প্রথমে তার টার্গেট বা লক্ষ্য স্থির করে। পৃথিবীতে কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে হলেও সর্বপ্রথমে টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়। টার্গেট নির্ধারণ বা লক্ষ্য স্থির না করলে কোন কাজে সফলতা অর্জন করা যায় না।

দাসত্ব, বন্দেগী, আনুগত্য, পূজা-উপাসনা, দোয়া প্রার্থনার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে, আমি কার দাসত্ব করবো এবং কার কাছে সাহায্য চাইবো। মুসলমান নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এ কথারই স্বীকৃতি দেয়, আমি লক্ষ্য স্থির করেছি–আমার দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনা হবে একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য। আমি একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবো এবং যে কোন প্রয়োজেন একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবো।

নামাজে এভাবে বলা হলো, আর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সাহায্যের জন্য, সন্তান লাভের আশায়, চাকরী লাভের আশায়, ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য, নির্বাচনে বিজয়ের লক্ষ্যে ছুটে গেল মাজারে, পীর-মাওলানা, জ্যোতিষী-গণকদের কাছে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, এদের ইবাদাত ও সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে কোন লক্ষ্য স্থির নেই–এরা লক্ষ্যভ্রষ্ট। অর্থাৎ কে যে এদের মাবুদ, এরা কার ইবাদাত করবে এবং কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, সে ব্যাপারে এরা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এ ধরনের লক্ষ্যহীন লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

أُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ-

এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী মনে করো, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না। এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রব-এর নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রাহ্মতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৬-৫৭)

ইবাদাত ও দোয়া প্রার্থনার ব্যাপারে মানুষ যখন লক্ষ্য স্থির করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে অসংখ্য মাবুদের গোলামী করতে থাকে। ক্ষণকালের জন্য আল্লাহর গোলামী করে, আবার পীর-অলী, মাজারের গোলামী করে, জ্বিনের গোলামী করে, নেতা-নেত্রীর গোলামী করে তথা অসংখ্য মাবুদের গোলামী করতে থাকে। এরা যাদের কাছে সাহায্য চায়, যাদেরকে এরা নিজেদের আশাপূরণকারী বলে মনে করে, তারা নিজের অজান্তেই এদেরকে মাবুদ বানিয়ে নেয়। আল্লাহ বলেন, এদের এসব মাবুদ কোন ক্ষমতাই রাখে না। এরা নিজেরাই তো আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সত্য পথের সন্ধানে রয়েছে। এরা আমার ভয়ে থরথর করে আর আমার রাহ্মত লাভের প্রত্যাশায় প্রহর অতিবাহিত করছে। সুতরাং একমাত্র আমারই দাসত্ব করো এবং আমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।

অতএব ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করার পূর্বে লক্ষ স্থির করতে হবে যে, প্রকৃতই মাবুদ, ইলাহ ও রব কে? আমি কার ইবাদাত করবো, কে আমার দাসত্ব লাভের অধিকারী, আমার আনুগত্যের লক্ষ্য কোন শক্তি, কে আমার প্রার্থনা কবুল করতে পারে এবং সাহায্য করতে পারে। এভাবে লক্ষ্য স্থির করে তারপর নিজেকে ইবাদাতে নিয়োজিত করতে হবে এবং সাহায্যের আশায় প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে লক্ষ্য স্থির করলেই, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই'-নামাজে সূরা ফাতিহায় বলা কথাটি মুসলমানের জীবনে সফলতা ও সার্থকা বয়ে আনবে।

গোলামীর লক্ষ্য হবেন একমাত্র আল্লাহ

মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং তিনিই মানুষের একমাত্র প্রতিপালক। এই মানুষ কার দাসত্ব করবে, কোন শক্তিকে লক্ষ্য করে মানুষ ইবাদাত করবে–এ সিদ্ধান্ত কোন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। যিনি মানুষে স্রষ্টা এবং প্রতিপালক, তিনিই কেবল সিদ্ধান্ত জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করেন, তাঁর সৃষ্টি মানুষ কার আনুগত্য, ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সে সিদ্ধান্ত অনুগ্রহ করে পবিত্র কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ–

হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই রব্ব-এর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা। (সূরা আল বাকারা-২১)

দাসত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র লক্ষ্য হবেন আল্লাহ–তাঁর সামনেই মাথানত করতে হবে, আনুগত্যের মস্তক একমাত্র তাঁর সামনেই নত করে দিতে হবে। তাঁর দাসত্ব করার ব্যাপারে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে কোন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا–

আর তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। (সূরা নেছা-৩৬)

দাসত্ব করার ব্যাপারে যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অকল্যাণের ভয়ে–কল্যাণের আশায় লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষ যাদের আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করে, তাদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَيَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا–

তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই জিনিসের ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করো, যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার? (মায়িদা-৭৬)

সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণ করছেন আল্লাহ, এ ব্যাপারে অন্য কোন শক্তির সামান্য কোন ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না। তিনিই রব্ব এবং ইলাহ–দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে যে আনুগত্যের প্রবণতা রয়েছে, আল্লাহ আনুগত্যের যে স্বভাব মানুষের ভেতরে দান করেছেন, তা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় এবং মানুষ যেন ইবাদাতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই লক্ষ্য স্থির করে, সে জন্য বলে দেয়া হয়েছে– ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ-لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ–

এই হচ্ছেন আল্লাহ–তোমাদের রব–তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা সুতরাং তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। (সূরা আন'আম-১০২)

ইবাদাত বা দাসত্ব করার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষগুলো অসংখ্য কল্পিত মাবুদের বন্দেগী করে থাকে। নির্জীব পদার্থসমূহকে তারা শক্তির প্রতীক কল্পনা করে পূজা আরাধনা করে থাকে। কেউ কল্পনা করেছে স্বয়ং স্রষ্টার সন্তান রয়েছে, ফেরেশতারা তার কন্যা, সৃষ্টি কাজে জ্বিন ও ফেরেশ্তাগণ অংশীদার, অতএব এসবের পূজা অর্চনা করতে হবে। কোরআন অবতীর্ণের পূর্বে অন্যান্য জাতিকে নবী-রাসূলগণ ইবাদাত করার ব্যাপারে যে লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন, তারা কালক্রমে নিজেদের সেই লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে কেউ হযরত উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে আবার কেউ হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে কল্পনা করেছে। এভাবে তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। এদের ইবাদাতের প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতে বলেন–

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلٰهًا وَّاحِدًا-لَاإِلٰهَ إِلَّاهُوَ-سُبْحَانَهُ عَمَّايُشْرِكُوْنَ-

অথচ এদেরকে এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কেউ-ই বন্দেহী-দাসত্ব লাভের অধিকারী নয়। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরিকী কথাবার্তা থেকে, যা তারা বলে।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। মানব জাতির পিতা প্রথম মানব আদমের মধ্যে ইবাদাত, বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ ছিল না। তিনি তার ইবাদাতের লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। সমগ্র মানবতার জন্যেও সেই

একই লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তী কালে এই মানুষ সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আম্বিয়ার ৯২-৯৩ নং আয়াতে বলেন–

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً-وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ-وَتَقَطَّعُوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ-

তোমাদের এই উম্মত প্রকৃত পক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব্ব। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত করো। কিন্তু নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্য লোকজন পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

এই আয়াতে তোমরা শব্দের মাধ্যমে পৃথিবীর সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মানব গোষ্ঠী! তোমরা সবাই প্রকৃতপক্ষে একই দল ও একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁরা একই আদর্শ ও জীবন বিধানসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদের সবারই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহই মানুষের রব এবং এক আল্লাহরই ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করতে হবে। পরবর্তী কালে ধর্মের নামে যেসব বিকৃত আদর্শ, মতবাদ ও মতাদর্শ তৈরী হয়েছে, তা সমস্ত নবী-রাসূলদের আনিত অভিন্ন আদর্শকে বিকৃত করে তৈরী করা হয়েছে। কোন চিন্তানায়ক নবীদের আদর্শের একটি দিক মাত্র নিয়েছে, কেউ দুটো দিক গ্রহণ করেছে আবার কেউ গুটিকতক নিয়ে তার সাথে নিজের চিন্তা-চেতনা মিশ্রিত করে কিম্ভুতকিমাকার একটা কিছু নির্মাণ করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে।

এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মমতের এবং মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েছে নানা জনগোষ্ঠীতে। বর্তমানে মানুষের তৈরী করা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের ভিত্তি দান করেছেন এবং নবী-রাসূলগণই মানুষকে নানা ধর্মে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন–এসব কথা ছড়িয়ে মূলতঃ পবিত্র নবী-রাসূলদের ওপরে মারাত্মক অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে।

এসব বিকৃত আদর্শ ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং ইবাদাতের ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করছে বলেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিভিন্নতা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত পবিত্র নবী

রাসূলদেরই সৃষ্টি। এসব কথা বলা ও এসব কথা বিশ্বাস করা বড় ধরনের অপরাধ। আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ একের অধিক কোন মতবাদ মতাদর্শ প্রচার করেননি এবং ইবাদাত, দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিলেন না। তাঁরা সবাই এক আল্লাহরই ইবাদাত করার আদেশ দান করেছেন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী এই লক্ষ্যেই আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত করেছেন।

একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করতে হবে

একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত, দাসত্ব ও বন্দেগী করা জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতিরই দাবী। মানুষের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালনের ব্যাপারে যাদের কোনই ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না, তাদের ইবাদাত করা মূর্খতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এটাই হলো যুক্তি ও বিবেকের দাবী। বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাই হলেন আল্লাহ এবং তিনিই হলেন প্রকৃত মা'বুদ। তিনিই প্রকৃত মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মা'বুদ হওয়া উচিত।

রব অর্থাৎ মালিক, মুনিব, শাসনকর্তা এবং প্রতিপালক হবেন একজন আর ইলাহ্ অর্থাৎ আনুগত্য, বন্দেগী ও দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হবেন অন্যজন, এটা একেবারেই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধির অগম্য যুক্তি। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার কল্যাণ ও অকল্যাণ, তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া, তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন–তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথানত করা মানুষের প্রকৃতিরই মৌলিক দাবী। এটাই তার ইবাদাত তথা দাসত্বের মৌলিক কারণ। মানুষ যখন একথাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত বা দাসত্ব না করা এবং ক্ষমতাহীনের আনুগত্য বা ইবাদাত করা দুটোই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী।

কর্তৃত্বশালী–ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগকারী আনুগত্য, দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হন। যাদের কোন ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্ব নেই, কোন কিছু করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই, তারা আনুগত্য বা দাসত্ব লাভের অধিকারী হন না। এসব দুর্বল সত্তার দাসত্ব বা আনুগত্য করে এবং তাদের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে শুধু নিরাশই হতে হয়–কিছু পাওয়া যায় না। কারণ একজন ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে ভিক্ষা

দিতে পারে না। মানুষের কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ক্ষমতাই দুর্বল সত্তাদের নেই। এদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহাকরে মাথানত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ, যেমন কোন ব্যক্তি শাসনকর্তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার কাছে আবেদন পেশ করার পরিবর্তে তারই মতো অন্য আবেদনকারীগণ সেখানে আবেদন-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা।

দাসত্ব লাভ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি শুধু পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে। তাঁর প্রতিপালনের কারণেই সমস্ত কিছু বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অসীম কল্যাণে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। পৃথিবী ও আকাশের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। (সূরা আয যুমার-৬৩)

যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক, প্রতিপালক এবং যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি, তাঁরই ইবাদাত লাভের যোগ্যতা রয়েছে, আর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের ইবাদাত করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহরই গোলাম। গোলাম হয়ে যারা গোলামদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছে, এদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূর্খ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّيْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ-

এদেরকে বলে দাও, হে মূর্খেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে? (সূরা যুমার-৬৪)

মহান আল্লাহর ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিকারী-প্রার্থনা মঞ্জুরকারী এবং এ জন্যই তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ বলেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-اِنَّ الَّذِيْنَ

يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ-

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যেসব মানুষ অহঙ্কার বশতঃ আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মু'মিন-৬০)

নামাজ আদায় কালে মানুষ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে নিজেকে নিবেদন করে বলে, 'আমরা একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে আমরা তোমারই কাছে দোয়া করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই–অন্য কারো কাছে নয়।

আসলে মানুষ দোয়া করে কেবল সেই শক্তিরই কাছে, যে শক্তি সম্পর্কে সে ধারণা করে, 'আমি যার কাছে দোয়া করছি, তিনি সমস্ত কিছুই শোনেন–দেখেন এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী। নীরবে-সরবে, নির্জনে, প্রকাশ্যে, মনে মনে যে কোন অবস্থায়ই দোয়া করি না কেন, তিনি তা দেখছেন এবং শুনছেন।' মূলতঃ মানুষের আভ্যন্তরীণ এই অনুভূতি, এই চেতনাই তাকে দোয়া করতে প্রেরণা যোগায়-উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এই পৃথিবী তথা বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন মানুষের কোন দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট নিবারণ অথবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়ার জন্য মানুষের অবচেতন মন অস্থির হয়ে ওঠে। বিষয়টি সে সময় মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং সেই অদৃশ্য অথচ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে ডাকতে থাকে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি স্থানে এবং সর্বাবস্থায় ডাকে।

নির্জনে একাকী ডাকে, উচ্চস্বরে ডাকে, নীরবে নিভৃতে ডাকে এবং মনে মনে একান্ত তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষ এভাবে তাঁর স্রষ্টাকে ডাকতে থাকে। সেই বিশ্বাসটি হলো, সে যে সত্তাকে ডাকছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন এবং তাঁর মনের গহীনে যে কথামালার গুঞ্জরণ সৃষ্টি হচ্ছে, সাহায্যের প্রত্যাশায় তার মন যেভাবে আর্তনাদ করছে, মনের জগতের এই আর্তচিৎকার পৃথিবীর কোন কান না শুনলেও তাঁর স্রষ্টার কুদরতী কান অবশ্যই শুনতে পাচ্ছে। সে যে সত্তাকে ডাকছে, তিনি এমন অসীম ক্ষমতার

অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি তাকে সাহায্য কতে সক্ষম। তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় কল্যাণে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম।

আল্লাহর কাছে দোয়া করার, তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করার এই তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য এ বিষয়টির মধ্যে আর কোন জটিলতা থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া করে বা সাহায্যের আশায় ডাকে, তার নামে মানত করে সে প্রকৃত পক্ষেই নিরেট বোকা এবং সে নির্ভেজাল শির্‌কে লিপ্ত হয়। কারণ যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে। আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলী নির্দিষ্ট, সে তাদেরকে ঐসব গুনাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করতো না এবং সাহায্য চাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো উদয় হতো না।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই এ কথা মনে করে বসে যে, সে অনেক প্রচন্ড ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক, তাহলে অনিবার্যভাবেই তার কল্পিত ব্যক্তি বা সত্তা ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি অবিচল বাস্তবতা, একটি দৃশ্যমান বাস্তব বিষয় যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রকৃত ক্ষমতার মালিককে কেউ মালিক মনে করুক বা না করুক, স্বীকৃতি দিক বা না দিক–তাতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না, প্রকৃতই যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে মালিক, সে সর্বাবস্থায়ই মালিক থাকবে। আর যে সত্তা কোন ক্ষমতার মালিক নয়, কেউ তাকে ক্ষমতার মালিক মনে করলেও, তার মনে করার কারণে সে সত্তা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতাবান হবে না।

এটাই অটল বাস্তবতা যে, একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্তাই সর্বশক্তিমান, গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক, শাসক, প্রতিপালক, সংরক্ষণকারী, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তিনিই সামগ্রিকভাবে যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিপতি। সমগ্র বিশ্ব জগতে দ্বিতীয় এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই, যে সত্তা দোয়া শোনার সামান্য যোগ্যতা রাখে, সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে, বা তা মঞ্জুর করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

মানুষ যদি এই অটল বাস্তবতার পরিপন্থী কোন কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, অলী-মাওলানা, জ্বিন-ফেরেশতা, গ্রহ-উপগ্রহ ও মাটির তৈরী দেব-দেবীদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অংশীদার কল্পনা করে, তাহলে প্রকৃত বাস্তবতার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না। ক্ষমতার অধিকারী মালিক যিনি–তিনি মালিকই থাকবেন, তাঁর মালিকানায় এসব ব্যর্থ ও বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। আর নির্বোধদের কল্পনা শক্তি কখনো ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন গোলামকে মালিক বানাতে পারে না, গোলাম গোলামই থাকে।

দোয়া করা ও সাহায্য কামনা করার বিষয়টি সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। মনে করা যাক কোন রাজার দরবার থেকে সাহায্য দান করা হয় এবং রাজা প্রার্থনা শুনে থাকেন। সেখানে প্রজাদের মধ্য থেকে যার যে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে অনেকেই উপস্থিত হয়েছে। এই প্রজাদেরই একজন যদি সাহায্যের আবেদন নিয়ে রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে–সাহায্য প্রত্যাশী অন্য প্রজাদের একজনের সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তার গুণকীর্তন করতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য তার কাছে কাতর কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির এই ধরনের আচরণকে কি বলা যেতে পারে? এর থেকে চরম ধৃষ্টতা কি আর হতে পারে?

বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক, রাজার দরবারে রাজার উপস্থিতিতে তারই একজন প্রজা আরেকজন প্রজাকে রাজা কল্পনা করে তার কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছে, সাহায্য প্রার্থনা করছে, রাজার মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে তা ঐ প্রজা সম্পর্কে উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। আর যে প্রজার কাছে এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, সেই প্রজা বেচারী রাজার সামনে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে, বিব্রতবোধ করছে এবং বারবার নির্বোধ প্রজাকে বলছে, 'তুমি আমার গুণকীর্তন কেন করছো, আমার কাছে কেন দোয়া করছো, কেন আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছো, আমি তো রাজা নই–তোমার মতো আমিও এই রাজার একজন প্রজামাত্র এবং রাজ দরবারে তোমার মতো আমিও একজন সাহায্য প্রার্থী। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার চোখের সামনে যে আসল রাজা দরবারে অধিষ্ঠিত আছেন, সাহায্য তার কাছে চাও।'

বেচারী এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজাকে বার বার বুঝাচ্ছে–কিন্তু কে শোনে কার কথা! হতভাগা তবুও চোখ-কান বন্ধ করে তারই মতো সেই প্রজার কাছে স্বয়ং রাজার

সামনে সাহায্য প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়েছে ঐ নির্বোধ হতভাগা প্রজার মতোই। আল্লাহর যেসব বাকহীন গোলামদের দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা এরা করছে, তারা নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে, 'আমরা তোমারই মতো এক গোলাম। আমাদের আনুগত্য না করে, আমাদের কাছে প্রার্থনা না করে, আমরা যার আনুগত্য করছি, যার কাছে সাহায্য কামনা করছি, সেই আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাও।'

আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো

দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং যে কোন প্রয়োজনে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। দোয়া করতে হবে শুধু তাঁরই কাছে। মনে রাখতে হবে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনারই অনিবার্য দাবী। যারা তাঁর কাছে দোয়া করে না, এর অর্থ হলো-তারা গর্ব আর অহঙ্কারে নিমজ্জিত। এ কারণে তারা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর কাছে দোয়া না করা, সাহায্য না চাওয়া চরম অপরাধ। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন-আল্লাহর রাসূল বলেছেন, দোয়াই ইবাদাত। আরেক হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। (তিরমিজী)

দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষের মনে তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, 'কল্যাণ ও অকল্যাণ যাবতীয় কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনিই তাকদীরের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই তো অনিবার্যভাবে মানুষের জীবনে ঘটবেই। অতএব নতুন করে আবার আমরা দোয়া করবো কেন এবং দোয়া করলে কি আমাদের তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটবে?' মানুষের এই ধারণা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে সাহায্য চাওয়া ও দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে দেয়। এই ভুল ধারণা হৃদয়-মনে

পালন করে মানুষ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, দোয়া করে, তাহলে সেসব দোয়ার মধ্যেও যেমন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না তেমনি কোন প্রাণও থাকে না। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা মু'মিনের ৬০ নং আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন–

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ–

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।

এভাবে পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই বলা হয়েছে, আমি বান্দার অত্যন্ত কাছে অবস্থান করি, বান্দাহ্ যখন আমাকে ডাকে আমি সে ডাকের সাড়া দিয়ে থাকি। কোরআনের এসব ঘোষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার দোয়া ও আবেদন, নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি শুনে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই সংরক্ষণ করেন। এ কথা চিরসত্য যে, বান্দাহ আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ এড়িয়ে যেতে পারে না বা তাঁর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

সুতরাং দোয়া কবুল হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় দোয়ার অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কোন দোয়া-ই বৃথা যায় না। একটি না একটি কল্যাণ অবশ্যই লাভ করা যায়। সে কল্যাণের ধরণ হলো, বান্দাহ্ তার মালিক, মনিব, প্রভু, প্রতিপালকের সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে, সাহায্য কামনা করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা, অপারগতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এই স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত বা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দা যে সাহায্য চাইলো বা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক, তার আশা পূরণ হোক বা না হোক, কোন অবস্থায়ই তার দোয়ার প্রতিদান থেকে সে বঞ্চিত হবে না। তিরমিজী হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– لايرد القضاء الا الدعاء দোয়া ব্যতীত আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোন কিছুর মধ্যেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন, যখন বান্দাহ্ কাতর

কণ্ঠে তাঁর কাছে দোয়া করে, সাহায্য চায়। তিরমিজী হাদীসে এসেছে, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع با هم او قطيعة رحم–
বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ্ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন অথবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন–যদি সে গোনাহের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে।

মুছ্নাদে আহ্মাদে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু সা'ঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما من مسلم يدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله احدى ثلث–اما ان يعجل له دعوته–واما ان يد خرها له فى الا خرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها–

একজন মুসলমান যখনই কোন দোয়া করে তা যদি কোন গোনাহ্ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তা তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এই পৃথিবীতেই কবুল করা হয়, নয় তো আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোন বিপদ আসা বন্ধ করা হয়।

বোখারী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شئت–ارحمنى ان شئت–ارزقنى ان شئت–وليغزم مسئلته–

তোমাদের কোন ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে, হে আল্লাহ আল্লাহ! আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো।

তি.মিজী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম থেকে বর্ণনা করেন– ادعوا الله وانتم موقنون بالا جابة আল্লাহ

দোয়া কবুল করবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দোয়া করো। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

يستجاب للعبد مالم يدع باثم اوقطيعة رحم مالم يستعجل ـ قيل يارسول الله ما الاستعجال-قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم اريستجاب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়োর বিষয়টি কি? তিনি জানালেন, তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু দেখছি আমার কোন দোয়াই কবুল হচ্ছে না। এভাবে সে অবসন্নগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা থেকে বিরত থাকে।

তিরমিজী শরীফে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–يسأل احدكم ربه حاجته كله حتى يسأل شسع نعله اذا انقطع–
তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রব-এর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

তিরমিজীর হাদীস–হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ليس شيئ اكرم على الله من الدعاء
আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর কিছুই নেই।

তিরমিজী ও মুছনাদে আহ্মদ শরীফের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে উমর ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য।

তিরমিজীর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–سلوا الله مفضله فان الله يحب ان يسآل আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ্ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে তা অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এমন অনেক দোয়া রয়েছে। মানুষ যে বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বলে ধারণা করে সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ বা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। কারণ, কোন বিষয়ে মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনা-তদবীরই আল্লাহর রহমত, তাঁর সহযোগিতা ও তাওফিক এবং সাহায্য ব্যতিত সফল হতে পারে না। চেষ্টা-সাধনা শুরু করার পূর্বে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হলো, বান্দাহ্ সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে।

সে যে আল্লাহর বান্দাহ্, একমাত্র আল্লাহ্‌রই দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করছে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহর কল্পনাতীত ক্ষমতা, সম্মান-মর্যাদার কথা দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই কথাগুলোই সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজে বারবার বিনয়ের সাথে বলতে থাকে, হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

সম্রাট শাহ্জাহানের ঘটনা

যে কোন ব্যাপারে সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখন মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহকে সেজদা দেয়, তখন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং কোন কিছুর প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। সম্রাট শাহ্জাহানের জীবনীর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কোন একজন ভিক্ষুক কিছু পাবার আশায় তার দরবারে আগমন করেছিল।

অভাবী লোকটি সম্রাটকে না পেয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, তিনি মসজিদে নামাজ আদায় করছেন। লোকটি মসজিদের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো, দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক সম্রাট শাহ্জাহান নামাজ শেষে দুটো হাত তুলে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করছেন, আর তার দু'চোখের কোণ বেয়ে শ্রাবণের বারি ধারার মতই অশ্রু ঝরছে। অশ্রু ধারায় তার দাড়ি সিক্ত হয়ে বুকের কাছে শরীরের জামাও ভিজে গিয়েছে।

মুনাজাত শেষ করে সম্রাট মসজিদ থেকে বাইরে এলেন। ভিক্ষুক লোকটি সম্রাটকে সালাম জানালো, তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর লোকটি সম্রাটের কাছে কোন কিছু আবেদন না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে যেতে লাগলো। সম্রাট অবাক হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, তার কাছে এসে কেউ তো কোন নিবেদন না করে ফিরে যায় না-কিন্তু এ লোকটিকে দেখতে তো অভাবী মনে হয়। কিন্তু লোকটি কিছু না চেয়ে ফিরে যাচ্ছে কেন ? ভিখারী লোকটি চলে যাচ্ছে আর সম্রাট বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্বিৎ ফিরে পেতেই তিনি লোকটিকে ডাক দিলেন। লোকটির কানে সম্রাটের আহ্বান পৌঁছা মাত্র লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে সম্রাটের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষমতাধর সম্রাট লোকটির চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতাভরে প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে এসে কোন ব্যক্তি কিছু না চেয়ে তো চলে যায় না, তোমাকে দেখে তো অভাবী মনে হচ্ছে। তুমি আমার কাছে কিছু না চেয়ে কেন চলে যাচ্ছিলে ?

লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে জানালো, সত্যই আমি অভাবী। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি। আপনার কাছেও এসেছিলাম ভিক্ষার আশায়। আপনার কাছ থেকে বড় রকমের কিছু সাহায্য পাবো, যেন বাকি জীবনে আমাকে আর ভিক্ষা করতে না হয়। কিন্তু আপনার কাছে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম, আপনি আমার থেকে নগণ্য ভিক্ষুকের মতো পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটদের সম্রাটের কাছে দু'হাত তুলে ভিখারীর মতো অনুনয়-বিনয় করে কাঁদছেন। এই দৃশ্য দেখে আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলা, সম্রাট কাঁদে যে সম্রাটের কাছে, আমিও তাঁরই কাছে কাঁদবো। আমি বাকি জীবনে ঐ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ ব্যতিত আর কারো কাছে কখনো কিছুই চাইবো না।

আনুগত্য বনাম ইবাদাত

পবিত্র কোরআনে ইবাদাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। নামাজের মধ্যে বারবার পড়তে হয়–ইয়্যাকা না'বুদু-অর্থাৎ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, এই আয়াতে যে না'বুদু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আনুগত্য অর্থে ইবাদাত শব্দটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এখন আমরা তা দেখার প্রয়াস পাবো। সূরা ইয়াছিনের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

হে আদম সন্তানেরা ! আমি কি তোমাদের তাগিদ করিনি যে তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াছিন-৬০)

এই পৃথিবীতে বোধহয় এমন একজন মানুষও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি শয়তানকে ভালো বলে। সবাই শয়তানকে গালাগালি দেয়। কোন মানুষের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হলে, অন্য মানুষ তাকে শয়তান বলে গালি দেয়। এভাবে শয়তানের প্রতি সবাই অভিশাপ দিয়ে থাকে। শয়তানকে মানুষ অভিশাপ দেয়–কেউ তার ইবাদাত করে না।

শয়তানের পূজা-উপাসনা, ইবাদাত, বন্দেগী, আনুগত্য করতে কেউ রাজি হয় না–এর পরিবর্তে শয়তানের ওপরে শুধু চারদিক থেকে অগণিত কণ্ঠে অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে। শয়তান নামক এই অশুভ-অপশক্তির প্রতি লা'নত হতে থাকে। মানুষ অপরাধ করে, পাপের সাগরে ডুবে যায়, পাপ-পঙ্কিলতার কদর্যতায় অবগাহন করতে থাকে মানুষ আর দোষ চাপিয়ে দেয় শয়তানের ঘাড়ে। মানুষের এই স্বভাব দেখে কবি বলেন–

কিয়া হাঁসি আ-তি হায় মুঝে হযরতে ইনছান প্যর
ফেলে বদ তু খোদ ক্যরে লা'নাত ক্যরে শয়তান প্যর।

বিদ্রুপের হাসি আসে আমার, মানুষের স্বভাব দেখে। এরা নিজেরা অপরাধমূলক কর্ম করে দোষ চাপিয়ে দেয় শয়তানের প্রতি।

এই শয়তান যেন ফুটবলের মতো। ফুটবলের সৃষ্টিই হয়েছে লাথির আঘাত সহ্য করার জন্য, তেমনি এই শয়তানের সৃষ্টিই হয়েছে শুধু অভিশাপ, লা'নত আর গালাগালি শোনার জন্য। অথচ এই মানুষের প্রতি তার স্রষ্টার পক্ষ থেকে বার বার আদেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করবে না। শয়তানের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে–এ কথার অর্থ হলো, শয়তান যা বলে তা করা যাবে না। শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা যাবে না। এই অপশক্তির আনুগত্য করা যাবে না। কোরআন ও হাদীসের আদেশ অনুসরণ করার পরিবর্তে শয়তানের আদেশ অনুসারে জীবন পরিচালিত করা যাবে না।

শয়তান মানুষকে যেভাবে প্ররোচনা দেয়, সেই প্ররোচনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করার অর্থই হলো, শয়তানের ইবাদাত করা বা শয়তানের আনুগত্য করা। সূরা ইয়াছিনের উল্লেখিত আয়াতে যে তা'বুদু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো আনুগত্য করা, দাসত্ব করা বা ইবাদাত করা। যারা পৃথিবীতে শয়তানের ইবাদাত করেছে তথা শয়তানের প্ররোচনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলছে,–

أُحْشُرُ الَّذِيْنَ ظَلَمُ وَاَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَهْدُوْ هُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ–

পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তান এবং অন্য সত্তাদের আনুগত্য করেছে, তাদের সবাইকে একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (কোরআন)

আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব, আনুগত্য বা ইবাদাত না করে, শয়তানের আনুগত করেছে, ইবাদাত করেছে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ শয়তানের ইবাদাত বা আনুগত্য করার নির্মম পরিণতি এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এ কারণে যে, মানুষ যেন কোনক্রমেই শয়তানের আনুগত্য না করে। মানুষ আনুগত্য করবে কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং তাঁর প্রেরিত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। শর্তহীনভাবে কোন নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা যাবে না। কারো আনুগত্য করতে হলে, কারো মতামত গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই কোরআন সুন্নাহ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ-وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا-لاَاِلٰهَ اِلاَّهُوَ-سُبْحَانَهُ عَمَّايُشْرِكُوْنَ-

তারা নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ব্যতিত আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, সেই আল্লাহ–যিনি ব্যতীত অন্য কেউ দাসত্ব লাভের অধিকারী নন। (সূরা তওবা-৩১)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদেরকে রব্ব বানিয়ে নেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য না করে, তাদের আনুগত্য করা। এসব ব্যক্তিদের আদেশ-নিষেধ নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা। আল্লাহর বিধান অনুসন্ধান না করে, পীর, মাশায়েখ, আলেম-ওলামাদের মতামত অনুসরণ করা। হাদীস শরীফে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টের বিকৃত আদর্শ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহর রাসূলের কাছে কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন।

উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে তিনি জানতে চান, 'আমরা খৃষ্টানরা আমাদের আলেম-ওলামা ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিলাম বলে কোরআন যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে, এর প্রকৃত অর্থ কি?' জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'এটা কি সত্য নয় যে, তোমাদের আলেম-ওলামা, দরবেশগণ যে বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা দিত তা তোমরা অবৈধ হিসাবে গণ্য করতে?' হযরত আদী বললেন, 'হ্যাঁ–অবশ্যই আমরা তা করতাম।'

হযরত আদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জবাব শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–এ ধরনের করলেই তো তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়া হলো। উল্লেখিত আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, আল্লাহর কিতাবের সনদ ব্যতিতই যারা মানব জীবনের জন্য হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণ করে, আসলে তারা নিজেদের ধারণা অনুসারে নিজেরাই রব-এর আসন দখল করে বসে।

আর যারা তাদেরকে এভাবে আইন-বিধান রচনা করার অধিকার দেয় বা অধিকার আছে বলে মেনে নেয়, মূলতঃ তারাই তাদেরকে রব বানায়। আলেম-ওলামা,

পাদ্রী-পুরোহিতদের রব বানিয়ে নেয়ার মূল অর্থ হলো, তাদেরকে আদেশ-নিষেধকারী হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন ব্যতীতই তাদের কথা শিরোধার্য করে নেয়া হয়েছে।

আলেম-ওলামা, পীর-দরবেশ, ওস্তাদ-মাশায়েখ, নেতা-নেত্রী তথা যে কোন ব্যক্তি হোক না কেন, তিনি যে কথাটি বলবেন–সে কথার প্রতি কোরআন ও হাদীস সমর্থন করে কিনা, তা না জেনে কোনক্রমেই গ্রহণ করা যাবে না। পীর সাহেব বা কোন মাওলানা সাহেব যদি বলেন, মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করতে হবে পনের হাত। শুধু পনের হাত কেন, এর অধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে–কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কোন সাহাবা এ ধরনের বিশালাকৃতির কোন পাগড়ী ব্যবহার করেছেন কিনা।

পীর সাহেব শিখিয়ে দিলেন, এই ধরনের পদ্ধতিতে সকাল-সন্ধ্যায় বা গভীর রাতে যিকির করতে হবে। যিকির অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু প্রথমে এটা অনুসন্ধান করতে হবে, পীর সাহেব যে পদ্ধতিতে করতে বললেন, সে পদ্ধতিতে আল্লাহর রাসূল বা তাঁর কোন সাহাবা জীবনে ক্ষণিকের জন্যও যিকির করেছেন কিনা। যদি দেখা যায় তাঁরা করেছেন, তাহলে পীর সাহেবের কথার প্রতি আনুগত্য করা যেতে পারে–তার পূর্বে নয়।

একজন মাওলানা সাহেব ফতোয়া দিলেন, তার সে ফতোয়া কোরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা–এটা সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কোন হুজুর, কোন পীর সাহেব, কোন মুরুব্বী কি বলেছেন, কোন কিতাবে কি লেখা রয়েছে–এসব অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন মুসলমানদের নেই। মুসলমানদের অনুসরণ করার প্রয়োজন, একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ। এ দুটো ব্যতিত অন্য কোন কিতাবের কথা, কোন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করা যেতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তির কথা ও কিতাবের লেখার সাথে কোরআন-সুন্নার বিধানের সংঘর্ষ না ঘটে, তাহলে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। এর নামই হলো আনুগত্য এবং আল্লাহর ইবাদাত। কোরআন-সুন্নাহ অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোন কিছুর অন্ধ অনুকরণ করা যাবে না–এর নামই হলো ইবাদাত। কেবলমাত্র চোখ বন্ধ করে আল্লাহর বিধানের সামনে মাথানত করতে হবে, আনুগত্য করতে হবে।

পূজা বনাম ইবাদাত

এই পৃথিবীতে কোন মানুষকে বা জড়-অজড় পদার্থকে ক্ষমতার উৎস মনে করে বা ক্ষমতাশালী মনে তার কাছে দোয়া করা, প্রার্থনা করা, নিজের দুঃখমোচনের লক্ষ্যে তাকে ডাকা, যেমনভাবে আল্লাহকে ডাকা উচিত, নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের আশায়, বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায় ডাকা পূজার অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ শিরক। কাউকে সম্মান প্রদর্শের উদ্দেশ্যে রুকু সিজদা করা, তার সামনে দু'হাত বেঁধে দাঁড়ানো, কোন মাজার বা কবরে তাওয়াফ করা, কোন আস্তানায় চুমো দেয়া, কারো সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন দেয়া, কোরবানী করা এবং এ জাতিয় যে কোন অনুষ্ঠান করা–যা সাধারণতঃ পূজার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, এসবই হলো শির্ক।

কারণ পূজা-উপাসনা লাভের অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। নিজের যে কোন প্রয়োজনের জন্য একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ-وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার কাছে আমার রব্ব-এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব-জাহানের রব-এর সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি। (সূরা মুমিন-৬৬)

এ আয়াতে ইবাদাত ও দোয়াকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নবীর মাধ্যমে এ কথা বলে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পূজা করা ত্যাগ করে যাদের পূজা করছো, যাদের সামনে পূজা-উপাসনা করছো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আমি যেন তাদের পূজা-উপাসনা না করি। এ ব্যাপারে আমার কাছে আমার রব-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার মাথা বিনয়ের সাথে একমাত্র তাঁরই সামনে নত করি, যিনি গোটা জাহানের রব্ব এবং তাঁরই সামনে সমস্ত সৃষ্টি আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে, সমগ্র সৃষ্টিলোক তাঁরই পূজা-উপাসনা করছে।

এভাবে যেসব মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যাদের পূজা-উপাসনা করে থাকে, এরা হলো সবচেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ–وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ–

সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট কে–যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ। যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা নিজেদের আহ্বানকারীর শত্রু হয়ে যাবে এবং ইবাদাতকারীদের অস্বীকার করবে। (সূরা আহ্কাফ-৫-৬)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মানুষ মাজারে গিয়ে মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের কাছে, মূর্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, নানা আশাপূরণ করার জন্য দোয়া করে, এসব লোক হলো পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে অগ্রগামী দল। মাজারে গিয়ে, দরগায় গিয়ে, মন্দিরে মূর্তির কাছে গিয়ে তাদেরকে উপাস্য তথা আশাপূরণকারী, সাহায্যদানকারী মনে করে যেসব নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে অথবা তাদের কাছে দোয়া করে, তারা আবেদনকারীর আবেদনে কোন প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাস্তব তৎপরতা প্রদর্শন করতে সক্ষম নয়।

এসব আহ্বানকারীদের আহ্বান আদৌ তাদের কানে পৌঁছে না। এদের নিজের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, এরা নিজের কানে আদেবদনকারীর আবেদন শোনে বা এমন কোন সূত্র নেই, যে সূত্রে তারা অবগত হতে পারে যে, তাদের কাছে কেউ দোয়া করছে বা আবেদন করছে।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্য সত্তার কাছে আবেদন-নিবেদন করে, এসব স্বকপোলকল্পিত সত্তা সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়ে তাকে। প্রথম প্রকার হলো, একশ্রেণীর মানুষ যেসব মূর্তি নিজ হাতে নির্মাণ করে এদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দেয়। এদের কাছে মনের ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা নিবেদন করে। এসব সত্তা প্রাণহীন জড়পদার্থ। স্বাভাবিকভাবেই এদের কোন শক্তিই নেই। আবেদনকারীর কোন আবেদন এদেরকে স্পর্শও করতে পারে না।

—১১

দ্বিতীয় যেসব সত্তার পূজা-অর্চনা, উপাসনা একশ্রেণীর মানুষ করে, তারা হলো সেই সব ব্যক্তি–যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা ও বন্দেগী করে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা প্রতি নিয়ত সংগ্রাম-মুখর জীবন অতিবাহিত করতেন। এসব সম্মানিত ও মর্যাদাবান বুযর্গ লোকগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে একশ্রেণীর স্বার্থলোভী মানুষ এদের কবরকে ঘিরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান শুরু করে দিল এবং এসব লোক সম্পর্কে নানা ধরনের কাল্পনিক অলৌকিক ঘটনার কথা অজ্ঞ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলো।

যেন লোকজন এসব মাজারে এসে সাহায্য কামনা করে, বিপদ থেকে মুক্তি চায় এবং সেই সাথে উপহার-উপঢৌকন দেয়, অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিতে থাকে। এসব বুযর্গ ব্যক্তিও আবেদনকারীর কোন আবেদন শুনতে পান না। কারণ তারা মৃত এবং মৃত লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ তুমি মৃত লোকদের কোন কথা শোনাতে পারবে না। (কোরআন)

আল্লাহর ওলীগণ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে আল্লাহর কাছে তারা এমন একটি জগতে অবস্থান করছেন, যেখানে কোন মানুষের আওয়াজ সরাসরি পৌঁছে না। কোন ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় না যে, 'আপনাদের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বা সেজদায় অবনত হয়ে লোকজন আপনার কাছে দোয়া কামনা করছে।' এসব সংবাদ এজন্য তাদেরকে দেয়া হয় না যে, তারা তাদের গোটা জীবনকাল ব্যাপী আন্দোলন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, মানুষ যেন কেবলমাত্র এক আল্লাহর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করে।

এখন যদি তারা জানতে পারেন যে, তিনি যেসব বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, মানুষ উল্টো তারই কবরকে কেন্দ্র করে ঐসব বিষয় অনুষ্ঠিত করছে, তার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছে। তাহলে তারা মনোকষ্ট লাভ করবেন–আর আল্লাহ তাঁর কোন প্রিয় বান্দাকে সামান্য কষ্টেও নিক্ষেপ করেন না।

স্বার্থান্বেষী লোকগণ আল্লাহর ওলীদের মাজারকে কেন্দ্র করে শিরকের উৎসের স্থলে পরিণত করেছে। এসব লোকদের নামের পূর্বে 'পীর-মাওলানা' শব্দও ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই ধরনের পীর ও মাওলানা উপাধিধারী মাজার পূজারী লোকগণ

নিজেদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে দল তৈরী করেছে। মানুষ যেন এদেরকে নবীর সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারী মনে করে, এ জন্য তারা তাদের দলের নাম দিয়েছে, 'আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত।' অর্থাৎ এটা সেই দল–যে দল সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকে।

মানুষের অর্থ-সম্পদ শোষনের লক্ষ্যে এরা সুন্নাতের নামাবলী গায়ে দিয়ে বলে থাকে, 'মাজারে যিনি শুয়ে আছেন, তিনি জীবিতকালে যতটা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, ইন্তেকাল করার পরে তার শক্তি আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি লাভ করেছে, কারণ এখন তো তারা সরাসরি আল্লাহর দরবারে যাতায়াত করার অনুমতি পত্র লাভ করেছেন।'

এই সব স্বার্থান্বেষী কর্মবিমুখ-বিভ্রান্ত লোকজন, শ্রমলব্ধ উপার্জন কষ্টকর মনে করে অজ্ঞ মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার কৌশল হিসাবে মাজারে বিশালাকৃতির বৃক্ষ তৈরী করেছে। লোকজনকে বলা হয়েছে, অমুক নির্দিষ্ট দিনে এসে এই বৃক্ষের গোড়ায় অমুক অমুক জিনিস উপহার দিয়ে গেলে মনের আশা পূরণ হবে। বৃক্ষের শাখায় কোন ভারী পাথর বা ইট বেঁধে দিলে গর্ভে সন্তান আসবে। এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে, পাথর বা ইট যেমন ওজনদার, তেমনি সন্তানের ভারে গর্ভ ভারী হবে, গর্ভ স্ফিত হয়ে উঠবে। মাজারের পাশে জলাশয় নির্মাণ করে সেখানে মাছ, কুমির, কাছিম ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বিধান তথা ইবাদাত সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের ভেতরে এই ধারণার জন্ম দেয়া হয়েছে যে, এসব মাছ, কাছিম আর কুমিরকে খাদ্য প্রদান করলে, চুমো দিলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে, মনের আশা পূরণ হবে, নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করবে। এভাবে মানুষকে আল্লাহর পূজা-অর্চনা ও উপাসনা থেকে বিরত রাখা হয়েছে এবং শির্‌কে নিমজ্জিত করা হয়েছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ মুখী না করে মাজার মুখী করা হয়েছে।

দুঃখ-বিপদ আল্লাহর নির্দেশে আসে

মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিরত করে এমন সব শক্তির ইবাদাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যাদের কোনোই শক্তি নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ–

এবং তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। আর বলে, এরা আল্লাহর দরবারে আমাদের সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুস-১৮)

যারা এ ধরনের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত তারা বলে থাকে, আমরা এসব দরগাহ্ আর মাজারে এ জন্য প্রার্থনা করি যে, আল্লাহর এসব ওলীগণ আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন এবং এরা হলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। পৃথিবীতে একটি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন কোন একক ব্যক্তির পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না, সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্য মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওপরে নানা রকম দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে এক একটি শক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আমরা সেসব শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই তাদের পূজা-উপাসনা করি, তাদের দরবারে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করি।

উল্লেখিত ধারণা একটি ভয়ঙ্কর ধারণা। কোন মুসলমান যদি এমন ধারণা পোষণ করে, তাহলে সে আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর একজন থাকবে না। সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে। এরা মানুষের সীমিত ক্ষমতার মতো আল্লাহর ক্ষমতাকেও সীমিত মনে করে। মানুষ দুর্বল, তার ক্ষমতা সীমিত−এ জন্য মানুষ একা দেশের সমস্ত কাজের আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয় বলে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তো অসীম ক্ষমতার অধিকারী−সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর যে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে চান, তাঁর সে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তিনি কুন বললেই তাঁর ইচ্ছা সাথে সাথে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় অন্য কোন শক্তির পূজা-উপাসনা করার কোনই প্রয়োজন নেই। সরাসরি তাঁরই পূজা-উপাসনা, আনুগত্য, বন্দেগী বা ইবাদাত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ কারো কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছুই করতে পারে না। কোন পীরের এমন ক্ষমতা নেই, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে কোন মানুষের দেহের একটি পশমের কোন ক্ষতি করতে পারে। এভাবে কোন দেব-দেবী বা অন্য কোন কল্পিত সত্তারও কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন−

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ-وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

কোন দুঃখ ও বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর মর্জিতেই হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। (সূরা আনআ'ম-১৭)

মানুষের জীবনে যে কোন বিপদ আসে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং সে বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। যখন কোন কল্যাণ আসে সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এ জন্য পূজা-উপাসনা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ-وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ-يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ-وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। (সূরা ইউনুস-১০৭)

পবিত্র কোরআনের এসব আয়াত যেমন মূর্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য তাদের পীর, মাজার-দরগার ব্যাপারে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'য়ালা নিজের জন্য যেসব কাজ নির্দিষ্ট রেখেছেন, সেসব কাজের ব্যাপারে কারো মধ্যে কোন ক্ষমতা বন্টন করেননি। তিনি কাউকে এজেন্সি দান করেননি যে, যে কেউ ইচ্ছা করলেই কোন নিঃসন্তানকে সন্তান দান করতে পারে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারে বা কৃষিতে অধিক উৎপাদন করে দিতে পারে। ইবাদাতের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস এতটা নিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছে যে, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়, সম্মান-মর্যাদা লাভের আশায় পীর সাহেবের পা ধোয়া পানি পর্যন্ত কেউ কেউ পান করে। পীর সাহেব গোসল করলে সেই গোসলের পানিও তারা পানা করে। এমনকি নিজের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে পীর সাহেবের খেদমতে নিয়োজিত করা হয়।

পীরের প্রতি এমন সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়, যে সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হলেন আল্লাহ। পূজার মাধ্যমে পীরকে এরা আল্লাহর আসনে বসিয়ে ছেড়েছে।

কোন পীরের এ ক্ষমতা নেই যে, তারা কোন তদবীর দিয়ে কাউকে দশতলার মালিক বনিয়ে দিবে, শিল্প কারখানার মালিক বানাবে। আল্লাহ যদি রাজি না থাকেন, তাহলে কারো ভাগ্য কেউ পরিবর্তন করে দিতে পারে না। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় তথাকথিত পীরকে পূজা করা শির্ক। এই শির্ক থেকে নিজেকে হেফাজত করার জন্য একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ-فَانْ فَعَلْتَ فَانَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমাকে কোন উপকার করে দিতে পারে না, তোমার কোন ক্ষতি সাধনও করতে পারে না। তুমিও যদি তাই করো তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুস-১০৬)

আল্লাহ রাজি না থাকলে কারো দোয়ায় ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। সুতরাং কোন মূর্তি নির্মাণ করে যেমন তার পূজা অর্চনা করা যাবে না, তেমনি কোন পীরের, মাজারের ও দরগারও পূজা করা যাবে না। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যারা পূজা অর্চনা করে, মূর্তির কাছে যারা নিজেদেরকে নিবেদন করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوْا دُعَاءَ كُمْ-وَلَوْسَمِعُوْا مَااسْتَجَابُوْا لَكُمْ

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই কাছে দোয়া করো, তাদের কেউ-ই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। এরপরও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো, তাদের কাছেই দোয়া করো, তবুও তারা তোমাদের ডাকও শুনতে পারে না, শুনতে পারে না তোমাদের দোয়া। (সূরা ফাতির)

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, কিছু সংখ্যক মানুষ পূজা-উপাসনার ব্যাপারে তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে তারা–যারা নিষ্প্রাণ মূর্তির বা জড়পদার্থের পূজা করে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সেসব বুযর্গ, যারা মাজারে শায়িত রয়েছেন। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ঐ সব ব্যক্তি, পৃথিবীতে যারা আল্লাহ বিরোধী মতবাদ-মতাদর্শ সৃষ্টি করেছে, নেতা হিসাবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এসব চিন্তানায়কগণ বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জীবিত থাকা অবস্থায় কখনো আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি এবং তাদের অনুসারীদেরকেও অনুসরণ করতে বলেনি। আল্লাহ বিরোধী চিন্তা-চেতনা অনুসারে তারা পরিচালিত হয়েছে এবং কর্মীদেরকেও পরিচালিত করেছে। এদের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীগণ এদের মূর্তি নির্মাণ করে বা বিশালাকারের ছবি বানিয়ে উপাস্যের আসনে বসিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করে থাকে। এসব ছবিতে বা এদের নামে নির্মিত স্তম্ভে ফুল দেয় এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে থাকে।

এসব আল্লাহ বিরোধী প্রয়াত নেতাদের নামে নির্মিত স্তম্ভে, ছবিতে ফুল দিয়ে পূজা করার ব্যাপারে বা কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের মাধ্যমে যে পূজা-উপাসনা করা হলো, এদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলো, এসবের মাধ্যমে তাদের আত্মার তো উপকার হলোই না, এমনকি তারা জানতেও পারে না-তাদেরকে এভাবে তার অনুসারীরা পূজা করছে। এদের ব্যাপারে যে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে সেখানে তাদের সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা করা হলো, এসব সংবাদও তারা জানতে পারে না। কারণ এরা নিজেদের মারাত্মক অপরাধের কারণে আল্লাহর বন্দীশালায় বন্দী রয়েছে। বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে এসব জালিম আত্মাগণ। সেখানে পৃথিবীর কোন আবেদন-নিবেদন পৌঁছে না। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণও তাদেরকে এ সংবাদ দেন না যে, তোমরা পৃথিবীতে যে ভ্রান্ত চিন্তা চেতনার প্রবর্তন করে এসেছো, তা খুবই সফলতা লাভ করেছে এবং তোমার অনুসারীরা ফুল দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে, সেমিনারের আয়োজন করে তোমার প্রতি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করছে।'

এ সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছলে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভ্রান্ত চিন্তাধারার প্রবর্তক, আল্লাহ বিরোধী নেতাদের কলুষিত আত্মার খুশীর কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালা কোন জালিমের কখনো খুশী চান না। এখানে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদাতকারী বান্দাদের আত্মার কাছে পৃথিবীর মানুষের প্রেরিত সালাম এবং তাদের রহমত কামনার দোয়া পৌঁছে দেন।

কারণ এসব দোয়া-সালাম তাদের খুশীর কারণ হয়। একই ভাবে আল্লাহ তা'য়ালা অপরাধী-জালিমদের আত্মাদেরকে পৃথিবীর মানুষের অভিশাপ, ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেন তাদের মনোকষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং কারো ছবির প্রতি, মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, মৃত ব্যক্তিদের সম্মানে কোন স্তম্ভ নির্মাণ করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আশা-আকাঙ্খা পূরণের আশায় কারো প্রতি পূজার অনুরূপ মর্যাদা দেয়াও তাদের ইবাদাত করার শামিল। নামাজের মধ্যে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' এ কথা বলার পরে কোন মুসলমানের এই অধিকার নেই যে, সে অন্য কারো ছবির পূজা করবে, কোন পীরের পূজা করবে, কোন মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেবে। এসব থেকে মুসলমান নিজেকে হেফাজত করবে এবং কেবলমাত্র তার পূজা-উপাসনা, দাসত্ব-বন্দেগী আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে।

তোমার এই বেশভূষা সম্পূর্ণ নকল

মানুষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার কারণে। শয়তান যেমন ঘৃণিত এবং পৃথিবীর মানুষের অভিশাপই সে প্রতি মুহূর্তে লাভ করছে, তেমিন শয়তানের পদাঙ্ক যারা অনুসরণ করে, তারাও তেমনি ঘৃণিত এবং অভিশাপ লাভের যোগ্য এবং তারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তা এবং আল্লাহর মুমিন বান্দাদের ও সমস্ত সৃষ্টির অভিশাপ লাভ করছে। বিষয়টি বড় আশ্চর্যের যে, সাধারণ মানুষ শয়তানকে গালি দেয় আর শয়তানের অনুসরণ যারা করে, তাদের প্রতি নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করে। হাদীস শরীফে এসেছে, কোন ফাসিকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে।

সুতরাং, শয়তান এবং শয়তানের কোন অনুসারীর আনুগত্য যেমন করা যাবে না, তেমনি তাদের প্রশংসাও করা যাবে না। সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা তো কেবল তারাই লাভ করতে পারেন, এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন পারিচালিত করে থাকেন তথা আল্লাহর ইবাদাত-দাসত্ব করেন। কোন মুনাফিকও সম্মান-মর্যাদা লাভ করতে পারে না। মুনাফিক শ্রেণীর লোকজন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে আল্লাহর আবেদ বান্দাদের অনুরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিতে থাকে।

নিজের নামের পূর্বে এমন সব বিশেষণ ব্যবহার করে যে, বিশেষণের আধিক্যের কারণে ব্যক্তির আসল নাম যে কি, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদিয়ে জামান, কাইয়ূমে জামান, মুজাদ্দেদে জামান, রাহনুমায়ে শরিয়ত, সেরাজুস সালেকিন, মেছবাহুল আরেফিন, আশেকে রাসূল, মাহবুবে খোদা, আশেকে পান্দান, সিহায়ে

দাস্দান, আশেকে মাওলা–এরা শুধু নামের শেষে নবীদের নামের অনুরূপ 'আলাইহিস্ সালাম' লেখাই বাদ দিয়েছে, এ ছাড়া যতগুলো বিশেষণ ব্যবহার করা প্রয়োজন, তা তারা করে থাকে। এদের ভেতরে আল্লাহ ভীতি যে নেই, তা এদের শান-শওকত পূর্ণ জীবনধারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এরা ভেক্ ধরে মানুষকে ধোকা দিয়ে সম্মানের আসনে আসীন হতে চায় এবং অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়। এদের এই মুনাফেকী সম্পর্কে কবি বলেন–

ইয়ে হাল তেরা জাল হ্যায়, মাক্ছুদ তেরা মাল হ্যায়,

কেয়া আযব তেরা চাল হ্যায়, লাখো কো আন্ধা ক্যর দিয়া

তোমার এই বেশভূষা সম্পূর্ণ নকল, তোমার কর্মকান্ড চাতুরী পূর্ণ। তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো অর্থ-সম্পদ অর্জন করা, এভাবে তুমি অসংখ্য মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছো।

এসব মুনাফিকরা নিজেদের চিন্তার জগতে, মন-মানসিকতায় কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা তথা হৃদয় জগতকে আল্লাহর রঙে রাঙাতে পারেনি। দেহটাকেই শুধু পোষাকের মোড়কে আল্লাহর রঙে রঙিন হিসাবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করে থাকে। নিজেদের কদর্য রূপটাকে সুন্নতী লেবাসের মোড়কে আবৃত করে রেখে সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ায় ব্যস্ত এসব বেদাআত পন্থীরা। এই শ্রেণীর ভন্ডদের সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন–মন না রাঙায়ে কেন বসন রাঙালে যোগী?

সুতরাং সম্মান-মর্যাদার অধিকারী কেবল তারাই, যারা আল্লাহর গোলামী করেন। আর যারা একমাত্র আল্লাহর গোলাম, তারা অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে থাকেন। হকপন্থী পীর সাহেবগণ অবশ্যই হক কথা বলেন, আল্লাহ বিরোধী কোন কিছু তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার সাথে সাথে প্রতিবাদ করে থাকেন, মানুষকে নিজের গোলাম না বানিয়ে আল্লাহর গোলাম বানানোর চেষ্টা-সাধনা করে থাকেন। তারা রাজা-বাদশাহের মতো চলাফেরা করেন না। এরা সত্যকার অর্থেই আল্লাহভীরু। অর্থ-সম্পদের প্রতি এরা দৃষ্টি দেন না, দৃষ্টি দেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে আর এই ইবাদাতই মানুষের ভেতরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে দিবে। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের সম্পর্কে সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ – তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশী ভয় করে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর দাসত্ব করার লক্ষ্যে। সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো দাসত্ব করা। দাসত্বের মাধ্যমে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন, তারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত বান্দাহ্ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদাত গুজার কোন বান্দাহ্ সম্পর্কে অনুগ্রহ করে, কিছু বলেছেন–তখন পরম স্নেহের ভাষা, আদরের ভাষা ব্যবহার করেছেন। স্নেহের সেই ভাষাটি হলো, 'আব্দ' অর্থাৎ বান্দাহ্। যারা আল্লাহর দাসত্ব করবে তিনি তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে জান্নাত দান করবেন। সেই জান্নাতীদের সম্পর্কে আল্লাহ মমতার ভাষায় বলেছেন–

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا–

জান্নাতে আল্লাহর বান্দাদের জন্য প্রবাহিত ঝর্ণধারা রয়েছে, এসব ঝর্ণার কাছে গিয়ে তাদেরকে পানি পান করতে হবে না, বরং তাদের ইশারায় ঝর্ণা তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে।

জান্নাতে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা রয়েছে, এসব ঝর্ণার পানি হবে অত্যন্ত সুস্বাদু। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী করেছে, তারা জান্নাত লাভ করবে এবং সেই ঝর্ণার পানি পান করবে। পানি পান করার জন্য তাদেরকে ঝর্ণার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, তারা শুধু ইশারা করবে আর অমনি ঝর্ণা তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইবাদুল্লাহ্ বলে, তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কথা উল্লেখ করেছেন। যারা আল্লাহর দাসত্ব করে, তারা তাঁর কাছে কতটা সম্মান ও মর্যাদা ল্যাভ করবেন, তা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী করে, তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা ফুরকানের ৬৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা পরম মমতাভরে বলেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا –

রাহ্মানের বান্দাহ্ যারা তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে যমীনে চলাফেরা করে।

যারা আল্লাহর ইবাদাত করে, আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াতে তাদেরকে অত্যন্ত আদর করে 'রাহ্মানের বান্দাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর ইবাদাত এভাবেই

মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করে দেয়। ইবলিস শয়তান আল্লাহর আদেশ অমান্য করার পরে যখন সে অভিশপ্ত হয়ে গেল, তখন সে আল্লাহর সামনে বলেছিল–হে আল্লাহ! তোমার যে বান্দার কারণে আমি অভিশপ্ত হলাম, আমি সেই বান্দাদেরকে প্রতারণা, প্ররোচনা, লোভ-লালসা, প্রলোভন ইত্যাদির মাধ্যমে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো। তখন আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসকে বলেছিলেন–

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার প্রকৃত বান্দাহ যারা তাদের ওপর তোর কোন আধিপত্য চলবে না। তোর কর্তৃত্ব তো শুধু সেই বিভ্রান্ত লোকদের ওপরেই চলবে, যারা তোর অনুসরণ ও আনুগত্য করবে। (সূরা হিজর-৪২)

এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'য়ালা পরম স্নেহের সাথে 'আমার বান্দাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহর দাসত্বকারী বান্দাহ্দেরকে এভাবে পবিত্র কোরআনে 'আব্দ' বা বান্দাহ্ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দ দিয়ে তাদের প্রতি সম্মান-মর্যাদা ও আল্লাহর রহমত-করুণার কথাই বলা হয়েছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে একটি মারাত্মক ধারণা পোষণ করে। তারা বলে–

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ–

খৃষ্টানারা বলে মসীহ হলেন আল্লাহর পুত্র। (সূরা তওবা-৩০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই মারাত্মক ধারণার প্রতিবাদ করে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মমতার সাথে জানিয়ে দিলেন–

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ عَنْ عَمْنَاعَلَيْهِ –

সে আমার একজন বান্দাহ্ ব্যতীত আর কিছুই নয়। (কোরআন)

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া লজ্জার কোন বিষয় তো নয়-ই বরং গৌরবের। মানুষ আল্লাহর বান্দাহ্, এটা মানুষের অহঙ্কার। কোন নবী এবং ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ করেননি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا اللّٰهِ وَ لاَ الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ–

মসীহ আল্লাহর বান্দাহ্ এবং এ বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে তিনি কখনো লজ্জা অনুভব করেননি, এমনকি আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশ্তাগণও আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে লজ্জানুভব করেন না। (সূরা নেছা-১৭২)

আর যারা আল্লাহর গোলাম হওয়ার ব্যাপারে লজ্জানুভব করে এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করে, তাঁর গোলামী করতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন–

وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا-

আল্লাহর দাসত্ব করার ব্যাপারে যারা লজ্জা পোষণ করবে, অহঙ্কার প্রদর্শন করবে–তাহলে তারা সেদিন আত্মরক্ষা করবে কিভাবে, যেদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে? (সূরা নেছা-১৭২)

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করা। এটা মানুষের জন্য সব থেকে বড়, নে'মাত যে, সে আল্লাহর বান্দাহ হতে পেরেছে। কারণ পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রাসূলই আগমন করেছিলেন, মানুষকে আল্লাহর বান্দাহ্ হিসাবে গড়ার জন্য। এই সম্মান ও মর্যাদা বড়ই দুর্লভ। আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে এই দুর্লভ গুণে মানুষকে গুণান্বিত হতে হবে। যারা এই গুণে গুণান্বিত হতে পারবে, তারই কেবল সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে কাছের-জন হলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁর পরম প্রিয় নবী-রাসূলদেরকেও তিনি পরম স্নেহভরে 'বান্দাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। সূরা ইউসুফের ২৪ নং আয়াতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ-اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ-

এরূপই ঘটলো, যাতে আমি অন্যায় পাপ ও নিলর্জতা তার থেকে বিদূরিত করে দিই। প্রকৃত পক্ষে সে আমার নির্বাচিত বান্দাহ্দের একজন ছিল।

এ আয়াতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে মহান আল্লাহ আদর করে তাঁর 'বান্দাহ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত নবীদেরকে বিশেষ এলাকার জন্য, বিশেষ জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা পৃথিবীর নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর দরবারে যে কতটা উচ্চে তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর থেকে প্রিয় পাত্র আল্লাহর কাছে আর কেউ নেই। তাঁকেই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বান্দাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا–

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়।

সমস্ত নবী-রাসূলকে আল্লাহ তা'য়ালা নাম ধরে সম্বোধন করলেও তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো নাম ধরে অর্থাৎ 'হে মুহাম্মাদ' বলে সম্বোধন করেননি। তাঁকে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, সে মর্যাদার কারণে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন না করে নানা ধরনের গুণবাচক নামে আহ্বান জানিয়েছেন। পরম মমতাভরে 'বান্দাহ' নামে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى–

অতঃপর তাঁর বান্দার কাছে যা ওহী করার ছিল, তা তিনি পূর্ণ করলেন। (কোরআন)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে এভাবে বলেছেন–

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا

আল্লাহর এই বান্দাহ্ যখন নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে দন্ডায়মান হলো, তখন তারা তাঁর ওপরে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। (কোরআন)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরেক আয়াতে বলেছেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

অতীব বরকতপূর্ণ সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার ওপরে ফোরকান অবতীর্ণ করেছেন।

মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল প্রসঙ্গে বলেছেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا–

পাক-পবিত্রতম সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাহ্কে রাতের একটি অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল)

এ ধরনের অনেক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবিবকে আব্দ বলে সম্বোধন করেছেন। এই শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া সবচেয়ে বড় খেতাব। এই খেতাব যারা অর্জন করতে পারবে, তারাই কেবল জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে, অন্য কেউ নয়। এই খেতাব অর্জন করতে হলে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, গোলামী, আনুগত্য, বন্দেগী ও পূজা, উপাসনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন শির্ক এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না।

পৃথিবীতে খিলাফত দেয়া হবে

যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের লক্ষ্য করে ওয়াদা করেছেন। কর্মের মাধ্যমে যারা আল্লাহর 'বান্দাহ্' হওয়ার উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই পুরস্কার দান করবেন। সে পুরস্কার এই পৃথিবীতেও যেমন দেয়া হবে, তেমিন দেয়া হবে আখিরাতে। এটা আল্লাহর ওয়াদা–আর আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, তাঁর ওয়াদাই হলো সবেচেয়ে দৃঢ় ওয়াদা। তিনি যে অঙ্গীকার করেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দাদের জন্য আল্লাহ এই পৃথিবীতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا-يَعْبُدُوْنَنِى لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا-

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের বর্তমান ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে। (সূরা আন নূর-৫৫)

আল্লাহর তা'য়ালার পরিষ্কার ওয়াদা, যারা আল্লাহর গোলামী করবে আল্লাহ তাদেরকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদেরকে দান করবেন। সেই সাথে যাবতীয় সন্ত্রাস বিদূরিত করে শান্তি দান করবেন। মানুষ যে ভীতিকর অবস্থায় বর্তমানে এই পৃথিবীতে বসবাস করছে, সন্ত্রাস নামক দানব যেভাবে গোটা মানবতাকে গ্রাস করেছে, এ থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করবে। এই বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষমতা ও শান্তি-স্বস্তি লাভ করার শর্ত হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এবং এই দাসত্বের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শির্ক করা যাবে না অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পাশাপাশি কোন মানুষের বানানো বিধানেরও অনুসরণ করা যাবে না। খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করতে হবে।

যারা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী বা দাসত্ব করবে, তারাই হবে এই পৃথিবীর শাসক। এরা শাসিত হবে না, গোটা বিশ্বকে এরা শাসন করবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা শাসিত (Dominated) হবে না–বরং তোমরাই শাসন (Dominate) করবে। ভীতির পরিবর্তে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করার যে ওয়াদা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসাবে লেখা হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য

যারা প্রকৃত ঈমানদার, চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দীয় আদর্শের আনুগত্যকারী এবং সবধরনের শিরক মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী। যাদের ভেতরে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নেই, নিছক মুখে ঈমানের দাবীদার, তারা আল্লাহর এই ওয়াদা লাভের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ ওয়াদা দেয়াও হয়নি। সুতরাং নামাজ-রোজার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে আর জীবনের অন্য সমস্ত বিভাগে মানুষের বানানো আইন-বিধান অনুসরণকারী তথাকথিত মুসলমানদের এই আশা নেই যে, তারা আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে পৃথিবীতে শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করবে।

আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী, ইবাদাত, পূজা-উপাসনাকারীদের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা যে পুরস্কার দান করবেন তাহলো, তিনি তাদেরকে এই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবেন, তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন, যাবতীয় সন্ত্রাস বিদূরিত করবেন এবং শান্তি ও স্বস্তি দান করবেন। এটা হলো পৃথিবীতে দেয়া পুরস্কার। তারপর তাদের ইন্তেকালের পরে আখিরাতের ময়দানে যে পুরস্কার দেয়া হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ–

যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম। (কোরআন)

অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা সফল হয়েছে। আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পৃথিবীতে যে দায়িত্ব তাদের ছিল, তারা সে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং দায়িত্ব পালন করেছে। এভাবে তারা সফলকাম হয়েছে অর্থাৎ জান্নাত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا–وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا–وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلاً–

পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দান করবো যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে ? (সূরা নিসা-১২২)

ইসলামে ইবাদাতের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইবাদাত যথাযথভাবে করার ওপরেই মানব জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। এ জন্য এই ইবাদাতের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা, যে সূরাটি মুসলমানদেরকে নামাজের মধ্যে বারবার পাঠ করতে হয়, সে সূরায় তা উল্লেখ করেছেন। ইবাদাত করলে আল্লাহ কি পুরস্কার দান করবেন, কোরআনে তাও উল্লেখ করেছেন, মুসলমানদেররকে এই ইবাদাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদেরকে করায়ত্ব করতে হবে এবং পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসের অপশক্তিকে বিদায় করতে হবে।

ইসলাম বিরোধী শক্তি পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে গোটা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের দানবকে অর্গল মুক্ত করে দিয়েছে। সন্ত্রাসের চিরাচরিত সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে। নিজেদের সন্ত্রাসী তান্ডবকে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে অবিহিত করছে আর মুসলমানদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাস নামে চিহ্নিত করছে। শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা মুসলিম দেশসমূহে মানবতা বিধ্বংসী ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ব্যবহার করে নারী, শিশু, কিশোর, কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে।

এই অবস্থা থেকে মানবতাকে রক্ষা করার জন্যই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর গোলামী করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে গোলামী করলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবেন, তখন আল্লাহ তাঁর গোলামদের মাধ্যমেই এই পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস বিদূরিত করে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত করাবেন।

মানুষ কত ঘন্টা আল্লাহর ইবাদাত করে

এই ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে। ইবাদাতের এই ভুল অর্থ, ভুল ব্যাখ্যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে ছড়িয়ে আছে। সাধারণ মুসলমানগণও যেমন ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে, তেমনি অসাধারণ মনে করা হয় যাদেরকে, তারাও এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর

অধিকাংশ মুসলমানই এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে বলে, তারা ইবাদাতের প্রকৃত হক আদায় করছে না। সাধারণ মুসলমানগণ ইবাদাতের যে ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে তাহলো—তারা মনে করেছে, নামাজ-রোজা, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, তস্‌বীহ জপা ইত্যাদি হলো ইবাদাত। এসব পালন করার অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, তখন তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে।

এই স্বাধীন জীবনে তারা আল্লাহর বিধানের প্রতিটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে লংঘন করে। যারা রোজা পালন করে তারা বছরে একটি মাস রোজা পালন করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে তারা নামাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মনে করে, ইবাদাতের যাবতীয় হক আদায় হয়ে গেল।

এটাই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়? খুব বেশী হলে দেড় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই নামাজ আদায়ের নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, একজন মানুষ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলাম। অবশিষ্ট সাড়ে ২২ ঘন্টার জন্য সে শয়তানের গোলাম।

এভাবে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলামী যে করলো তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিমাসে মাত্র ৪৫ ঘন্টা আল্লাহর গোলামী করলো। এক বছরে সে ৫৪০ ঘন্টা গোলামী করলো আল্লাহর। মানুষ যদি গড় আয়ু লাভ করে ৬০ বছর, তাহলে সে গোটা জীবনকালে ৩২৪০০ ঘন্টা গোলামী করলো। ২৪ ঘন্টায় একদিন অনুসারে মানুষ ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ১৩৫০ দিন অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় আল্লাহর গোলামী করলো আর বাকি সাড়ে ৫৬ বছর শয়তানের গোলামী করলো।

একমাস রোজা পালন করার নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে বছরের অবশিষ্ট ১১ মাসের জন্য সে শয়তানের গোলাম। ৬০ বছরের জীবনকালে নিয়মিতভাবে প্রতি রমজান মাসে রোজা আদায় যদি করা হয়, তাহলে প্রতি বছরে ১ মাস হিসাবে মাত্র ৬০ মাস অর্থাৎ ৫ বছর হয়। মানুষ তার ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ৫ বছরের জন্য আল্লাহর গোলাম হবে আর অবশিষ্ট ৫৫ বছর শয়তানের গোলামী করবে?

কোন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি শয়তানের গোলাম বা চাকর হতে প্রস্তুত রয়েছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলমানও স্বীকৃতি দিবে না যে, সে শয়তানের গোলামী করবে। সুতরাং ইবাদাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করার নামই ইবাদাত নয়। এগুলো অবশ্য করণীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, এগুলো তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত হলো ইবাদাতের একটি অংশ। ইবাদাতের যে বিশাল পরিধি রয়েছে, তার কিছু মাত্র অংশ হলো নামাজ-রোজা। এগুলো একমাত্র ইবাদাত নয়।

এই নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এগুলো যারা আদায় করে না, তারা ইবাদাতের যোগ্য কোনক্রমেই হতে পারে না। সৈনিক জীবনে যেমন কুচকাওয়াজ করাই একমাত্র কাজ নয়, যুদ্ধের যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ার লক্ষ্যেই তাদেরকে নানা ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়, কুচকাওয়াজ করানো হয়। তেমনি নামাজ-রোজা নিষ্ঠার সাথে আদায় করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বৃহত্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতার সাথে যেন পালন করতে সক্ষম হয়, সেই যোগ্যতা যেন মুসলমান অর্জন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান যেন আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্যই নামাজ-রোজা আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলমানরা কতটা ভুল অর্থ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তা বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিমদের করুণ অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করলে তাদেরকেই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করা হবে। পৃথিবীকে শাসন করবে তারা। এটা আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা।

অথচ আমরা দেখছি, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করছে অর্থাৎ তারা নামাজ আদায় করছে, রোজা পালন করছে কিন্তু পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করা তো দূরের বিষয়–গোটা পৃথিবীব্যাপী তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। এই পৃথিবীতে একটি কুকুর-বিড়ালের যে মূল্য রয়েছে, সে মূল্য মুসলমানদের নেই। তাহলে আল্লাহর ওয়াদা কি অসত্য? মুসলমান আল্লাহর ইবাদাত করছে–তাদের এই দাবী যদি সত্য

হয়, তাহলে আল্লাহর ওয়াদা অসত্য বলে বিবেচনা করতে হয়। আল্লাহর ওয়াদা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহলে মুসলমানদের দাবী মিথ্যা বলে বিবেচনা করতে হয়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। তাঁর চেয়ে ওয়াদা রক্ষাকারী কোন সত্তার অস্তিত্ব কোথাও নেই। মুসলমানদের এই দাবীই মিথ্যা যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে। মুসলমানরা এই ইবাদাতের খন্ডিত অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ঠাহীনভাবে পালন করে থাকে। তারা নামাজ-রোজা আদায় করে অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন দল করে, যে দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বিপরীত।

ঘুষ গ্রহণ করে, ঘুষ দেয়, মদপান করে, জিনা-ব্যভিচার করে, অশ্লীলতা আর নগ্নতা প্রসার-প্রচার করে, মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে, প্রতিবেশীর হক আদায় করে না, মাতা-পিতার অধিকার ক্ষুন্ন করে, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করে, মিথ্যা মামলা করে, মিথ্যা সাক্ষী দেয়। নারী ধর্ষন করে, নরহত্যা করে। মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেয়, জীবিত ও মৃত মানুষকে শক্তিধর-নিজের প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে। এক টুকরা রুটি, এক পাত্র পানির আশায় আল্লাহর দুশমনদের দরজায় ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এমন কোন অপরাধ নেই যে, মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। অথচ তারা দাবী করছে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে।

হজ্জ আদায় করে মক্কা-মদীনায় দাঁড়িয়ে মুসলমান বলে দাবীদারগণ ওয়াদা করছে, দেশে প্রত্যাবর্তন করেই সেই ওয়াদা ভঙ্গ করছে। ব্যাংকে গিয়ে সুদের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। সরকারের ট্যাক্স কমানোর জন্য ঘুষ দিয়ে ট্যাক্স কমিয়ে সরকারকে ধোকা দিচ্ছে। ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করছে। নির্বাচনের সময় পেশীশক্তি ব্যবহার করে জনগণের ভোট ছিনতাই করছে।

স্ত্রী-কন্যাদেরকে চলচিত্র জগতে পাঠিয়ে, মডেলিংয়ের নামে তাদের রূপ-যৌবন প্রদর্শনী করে দেহপসারিণী-রূপজীবিনীর ভূমিকা পালন করিয়ে অর্থ উপার্জন করছে। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশ ও জাতির অর্থআত্মসাৎ করে সে অর্থের সামান্য অংশ মসজিদে-মাদ্রাসায় দান করে, মাজারে-মৃত মানুষের কবর আবৃত করার জন্য মূল্যবান চাদর কিনে দিয়ে ধারণা করেছে, ইবাদাতের হক আদায় করা হলো।

এটাই যদি মুসলমানদের ইবাদাতের প্রকৃত স্বরূপ হয়, তাহলে পৃথিবীতে তারা ঘৃণিত-লাঞ্ছিত কেন হচ্ছে? সত্যকারের ইবাদাত যদি মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর নেতৃত্ব ঈমানদের হাতে নেই কেন? মুসলমান যদি সত্যই ইবাদাত বুঝে করতো, তাহলে মানবতা আজ এতটা নিম্ন স্তরে নেমে যেতো না। বিশ্বজুড়ে অশান্তির আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তো না। সন্ত্রাস দমনের নামে অমুসলিম শক্তি মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালাতো না, নির্বিচারে গনহত্যা করতো সক্ষম হতো না।

সাধারাণ মুসলমান এভাবে শুধু-নামাজ-রোজা, যাকাত দেয়া আর হজ্জ আদায়কে ইবাদাত মনে করেছে, রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-সমরনীতি ইত্যাদিকে ইবাদাত মনে করেনি। ব্যবসা, কৃষিকাজ চাকরীকে ইবাদাত মনে করেনি। মুসলমান চাকরী করে, অথচ সে চাকরীকে সে ইবাদাত মনে করে না বলেই চাকরীতে ফাঁকি দেয়। সুস্থ মানুষ অথচ সে মেডিকেল লিভ নিয়ে নিজেকে অসুস্থ দেখিয়ে ছুটি গ্রহণ করে তাবলিগে চিল্লা দিতে, ইজ্তেমায়, ইসালে সওয়াবে, ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেয় সওয়াবের আশায়। এটা স্পষ্ট ধোকাবাজি।

চাকরী জীবনে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা যথারীতি পালন করা অবশ্যকরণীয় তথা ইবাদাত। যারা চাকরী করে তাদের মধ্যে যারা নামাজ আদায় করে, নামাজের সময় হলে ফরজ নামাজ, সুন্নাত নামাজ আদায় করে পুনরায় নিজের কর্মে যোগ দিতে হবে। টাইম কিলিং করার জন্য, সময় ক্ষেপণ করার জন্য নফল নামাজ আদায় করা যাবে না। এর নাম ইবাদাত নয়–চাকরী ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা ফরজ, সুতরাং ফরজ ত্যাগ করে নফল আদায় করা যাবে না। একশ্রেণীর মানুষ এ ধরনের কাজ ইবাদাত মনে করেই করে। কিন্তু এসব ইবাদাত নয়। ইবাদাত হলো জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামী করা।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ভুল করেছে আর এদের পক্ষে ভুল করাই বর্তমান পরিবেশে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর অসাধারণ মানুষও ইবাদাত সম্পর্কে ভুল করেছে। এরা মসজিদের চার দেয়ালে নিজেকে আবদ্ধ রাখা, খান্কায় বসে তস্বীহ্ জপ করা, হুজরাখানায় বসে নফলের পর নফল নামাজ আদায় করাকেই ইবাদাত মনে করেছেন। গোটা জাতি যখন

জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত, ঘৃণ্য সুদ নামক দানব যখন জাতিকে গ্রাস করছে, অশালীন অশ্লীল গান-বাজনার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, সন্ত্রাস জনজীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে, আল্লাহর আইন-বিধানের পরিবর্তে যখন মানুষের বানানো আইন চলছে, শয়তানি শক্তির সৃষ্ট ঝড় দাপটের সাথে এসে মসজিদের দরজায়, হুজরাখানা-খানকার দরজায় আঘাত করছে, তখনও এসব অসাধারণ মুসলমানগণ চোখ বন্ধ করে আল্লাহ নামের যিকির করছেন, বিশালাকারের তস্‌বীহর দানা ঘুরিয়ে চলেছেন। এর নাম কি পরহেজগারীতা, আল্লাহভীতি বা ইবাদাত করা?

ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যখন সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করছে, দ্বীনি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে, মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে, মুসলিম মা-বোনদেরকে ধর্ষন করা হচ্ছে, মুসলিম শিশুদেরকে পা ধরে তার মাথা পাথরের ওপরে দেয়ালের সাথে আছাড় দিয়ে হত্যা করছে, প্রতিটি মুহূর্তে পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানদেরকে পাখির মতো গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে, বোমার আঘাতে মুসলিম দেশ, মসজিদ ধূলার সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে, মুসলমানদের সম্পদ লুন্ঠন করা হচ্ছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে অগণিত মুসলমানকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে যে মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ শ্রেণীর অসাধারণ মুসলমানগণ হুজরাখানা, খানকা আর মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে তসবীহ জপ করতে থাকে, যিকির করতে থাকে, নফল নামাজ আদায় করতে থাকে।

এটাকেই কি ইবাদাত বলা হয়? মুসলিম দেশ ও জাতির এই দুর্দিনে যদি এগিয়ে যাওয়া না হয়, আন্তর্জাতিক দস্যুদের বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ না করা হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কণ্ঠ সোচ্চার না হয়, তাহলে যে ইবাদাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা হয়েছে, সেই ইবাদাত কোন কাজে আসবে না এবং এ ধরনের ইবাদাতকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।

যিকির করতে হবে, তসবীহ তিলাওয়াত করতে হবে, কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে, নফল নামাজ তথা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে হবে, নফল রোজাও রাখতে হবে, সেই সাথে অন্যায়, অবিচার, অনাচার তথা আল্লাহ বিরোধী আইন-বিধান তথা যাবতীয় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ময়দানে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এতে যদি দেহের তপ্ত রক্ত ময়দানে ঢেলে দিতে হয়, তাই দিতে হবে।

অর্থ-সম্পদ অকাতরে দু'হাতে বিলিয়ে দিতে হয় তাই দিতে হবে। যদি কারাগারের অন্ধ কুঠুরীতে প্রবেশ করতে হয়, হাসি মুখে প্রবেশ করতে হবে। প্রয়োজনে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। ইবাদাতের এই হক আদায় করার জন্য যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতির মোকাবেলা হাসি মুখে করতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় হবে এবং আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়া যাবে।

হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশ্‌তী আজমেরী (রাহ), হযরত শাহ্জালাল ইয়ামেনী (রাহ), হযরত খানজাহান আলী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত শাহ্ মাখদুম রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুজাদ্দেদে আল-ফেছানী (রাহ), শহীদ সাইয়েদ আহ্‌মদ (রাহ), শহীদ ইসমাঈল হোসেন (রাহ), শহীদ মাহ্‌মুদ মোস্তফা আল-মাদীন (রাহ)সহ এ ধরনের অগণিত অসাধারণ মুসলমান তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেছেন, তসবীহ্ তিলাওয়াত, কোরআন তিলাওয়াত, যিকির, নফল নামাজ আদায় করেছেন। সেই সাথে তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে কোরআন ধারণ করেছেন।

ময়দানে তারা বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। নিজেকে রাসূলের আওলাদ বলে দাবী করে, নামের পূর্বে অসংখ্য বিশেষণ জুড়ে দিয়ে ইবাদাতের হক আদায় করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ যেভাবে ইবাদাতের হক আদায় করেছেন, সেভাবে আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী তথা ইবাদাত করতে হবে।

সাধারণ এবং অসাধারণ মুসলমানগণ কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত, তসবীহ, কোরআন তেলাওয়াত করবেন যে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে বা তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে, সেই আল্লাহরই নির্দেশ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে ময়দানে প্রতিবাদী পদক্ষেপে বিচরণ করতে হবে।

সুতরাং ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, পবিত্র কোরআন কোন ধরনের কর্মকান্ডকে ইবাদাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কোন ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিল, এসব দিক বুঝতে হবে। ইবাদাত সম্পর্কে যদি

ধারণা অর্জন করা না যায়, তাহলে মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় দেয়াই বৃথা। কারণ মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর ইবাদাত করার জন্য, আল্লাহর গোলামী করার জন্য।

আল্লাহর গোলামী বাস্তব নমুনা

আল্লাহর ইবাদাত বা গোলামী কি ধরনের হতে হবে, এ ব্যাপারে কোরআনে মহান আল্লাহ দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে পেশ করেছেন। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাকে মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারার ১৩১ নং আয়াতে তাঁর সম্পর্কে বলেন–

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ-قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তার অবস্থা এই ছিল যে, তার রব যখন তাকে বললেন, অবনত ও অনুগত হও। তখনি সে বললো, আমি অনুগত হলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে।

আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা তিনি প্রদর্শন করলেন। আল্লাহ যখনই তাকে অনুগত হওয়ার আদেশ দিলেন, তিনি ওমনি কোন ধরনের শর্ত ব্যতীতই তার মাথাকে নত করে দিলেন। তিনি যেভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে অবনত করে দিয়েছিলেন, তিনি ইবাদাতের ব্যাপারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সেই একই পন্থা অবলম্বন করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন–

وَ وَصّٰى بِهَا اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ-يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

এ পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এই একই উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। সে বলেছিল, হে আমার সন্তানগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই জীবন ব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়েই থাকবে। (সূরা বাকারা-১৩২)

হযরত ইবারাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা এক আল্লাহর গোলামী করা ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করবে না। শুধুমাত্র আল্লাহর-ই দাসত্ব করবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামও তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহর অনুগত হয়ে

থাকবে। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন, সে বিধান অনুসারেই জীবন পরিচালিত করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে থাকবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে যেসব কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা এভাবে শুনাচ্ছেন–

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ–اِذْقَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْۢبَعْدِىْ–

ইয়াকুব যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, হে পুত্রগণ! আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে? (সূরা বাকারা-১৩৩)

পৃথিবী থেকে চির বিদায়ের পূর্বে মুসলিম পিতার যা কর্তব্য, সেই কর্তব্যই তিনি পালন করেছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে সমবেত করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কার দাসত্ব করবে? সন্তানগণ জবাবে বলেছিল–

قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا–وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ–

তারা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদাত করবো, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক–ইলাহ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত হয়ে থাকবো। (সূরা বাকারা-১৩৩)

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রশ্নের জবাব সন্তানদের কাছ থেকে এভাবে পেলেন যে, আমরা ইবাদাত করবো আপনার রব-এর, যাকে আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিস্ সালাম রব্ব হিসাবে, ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করেছিল। দাসত্বের বা গোলামীর পূর্ণাঙ্গ নমুনা হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। গোটা পৃথিবী যখন শির্কের কৃষ্ণ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তিনি তখন তাওহীদের উজ্জ্বল শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। আল্লাহর ইবাদাত করার ব্যাপারে যারা একনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত, নিবেদিত প্রাণ–তাদের নেতা হিসাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মনোনীত করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ-قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا-

স্মরণ করো, যখন ইবরাহীমকে তার রব্ব বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং সে ঐসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি (আল্লাহ্) বললেন, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের নেতা করতে চাই। (সূরা বাকারা-১২৪)

তার প্রথম পরীক্ষা ছিল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ হওয়া। দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিল, আল্লাহর আদেশে নির্জন মরুপ্রান্তরে নবজাতক সন্তানসহ স্ত্রীকে রেখে আসা। তৃতীয় পরীক্ষা ছিল, নিজের সন্তানকে আল্লাহর আদেশে কোরবানী দেয়া। স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, এসব পরীক্ষা ছিল বড় কঠিন পরীক্ষা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এসব চরম কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে জানালেন-سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ইবরাহীমের প্রতি সালাম রইলো। (কোরআন)

এভাবে আনুগত্যের তথা ইবাদাতের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত জাতির পিতা হিসাবে নির্বাচিত করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হজ্জ-এ বলেন-

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ-هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ-

তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ্ পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম এবং এর (কোরআন) মধ্যেও।

ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি হিসাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীবাসীর সামনে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে পেশ করেছেন। তাঁকে মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীমের মিল্লাত এবং তিনি যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করেছেন, সেটাই একমাত্র সত্য আর ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা যা বলে তা মিথ্যা। কোরআন বলছে-

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصٰرٰى تَهْتَدُوْا-قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا-وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

ইয়াহুদীরা বলে-ইয়াহুদী হও, তাহলে সত্য পথ লাভ করতে পারবে। খৃষ্টানরা বলে-খৃষ্টান হও তবেই সত্য পথের সন্ধান পাবে। (আল্লাহ বলেন) এদের সবাইকে

বলে দাও যে, এর কোনটিই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করো। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সূরা বাকারা-১৩৫)

ইয়াহুদী–খৃষ্টানদের ব্যাপারে স্পষ্ট বলে দেয়া হলো, তোমাদের কোন কথা বা দাবী সত্য নয়। বরং তোমরা তোমাদের ভ্রান্তপথ ত্যাগ করে হযরত ইবরাহীমের আদর্শে দিক্ষিত হও, তার মিল্লাতের মধ্যে শামিল হয়ে যাও, তাকে অনুসরণ করো–আর এটাই হলো মুক্তির একমাত্র পথ তথা আল্লাহর আনুগত্যের পথ। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন–

اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا–

সমস্ত দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে মিল্লাতে ইবারহীমের মধ্যে শামিল হয়ে যাও–তারই অনুসরণ করো। মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবাদাতের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হবার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন–اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ইবরাহীম হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যক্তি।

এ জন্য আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব, গোলামী বা ইবাদাতের মানদন্ড হিসাবে আমাদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিভাবে তিনি কোন ধরনের প্রশ্ন বা আপত্তি ব্যতীতই আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন। আল্লাহর কোরআনে এসব ঘটনা গাল-গল্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। এসব ঘটনা থেকে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করবে, এ জন্য এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।

মানুষের জীবনে যতগুলো প্রয়োজন রয়েছে, তার ভেতরে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, খাদ্য এবং নিরাপত্তা। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের অন্যতম অধিকারও এ দুটো বিষয়। মানুষ পেট ভরে আহার করতে চায়, ক্ষুধা মুক্ত থাকতে চায় এবং নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করতে চায়। নির্বাচনের সময় চিহ্নিত কোন সন্ত্রাসীকে মানুষ নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করে না। প্রার্থীদের মধ্য থেকে যার প্রতি এমন আস্থার সৃষ্টি হয় যে, এই লোকটি আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ দান করতে সক্ষম হবে, ভোটাররা তাকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। কিন্তু মানুষের ভাগ্যলিপির নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, মানুষ তারই মতো

আরেকজন মানুষকে খাদ্যদাতা, নিরাপত্তা বিধানকারী করে মনে করে চিরকালই ভুল করেছে। উল্লেখিত দুটো জিনিস মানুষ লাভ করতে পারেনি। অথচ আল্লাহ এই মানুষের কাছে ওয়াদা করেছেন, তোমরা আমার ইবাদাত করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্য ও নিরাপত্তা দান করবো। সূরা কুরাইশে বলা হয়েছে–

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ-الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ- وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ-

সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো এই ঘরের রব-এর ইবাদাত করা, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে দূরে রেখে নিরাপত্তা দান করেছেন।

জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে একমাত্র আমার গোলামী করো, আমার দাসত্ব করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্যদান করবো, আমিই তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করবো। একনিষ্ঠভাবে আমারই আনুগত্য করো।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, যে এলাকার লোকজন একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য, দাসত্ব, গোলামী, পূজা-উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের কোন অভাব থাকবে না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। নানা ধরনের ফসল এমনভাবে উৎপাদিত হবে যে, মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার পরও তা উদ্বৃত্ত রয়ে যাবে। তিনি আকাশ ও যমীনের বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ-

লোকালয়ের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং আমাকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকাশ ও জমিনের বরকতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতাম। (সূরা আ'রাফ-৯৬)

আল্লাহর প্রতি মানুষের দাবী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের সবচেয়ে বড় দাবী কি হতে পারে, এ কথাও মানুষ জানে না। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা অনুগ্রহ করে, মেহেরবানী করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষকে এভাবে আল্লাহর কাছে দাবী জানাতে বলেছেন, আমাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করো। মানুষের চাওয়ার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ গোটা ত্রিশপারা কোরআন বান্দার সামনে পেশ করে দিয়ে জানালেন, তোমরা যে সহজ সরল পথের দাবী আমার কাছে পেশ করেছো, এটাই সেই সহজ সরল পথ। একমাত্র আমার দাসত্ব করবে এটাই হলো সবচেয়ে সহজ সরল পথ। সূরা ইয়াছিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ-هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করবে আর এটাই হলো সহজ সরল পথ।

পৃথিবীতে ক্ষুধা মুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা, স্বস্তি, শান্তি অর্থাৎ মানুষের মৌলিক অধিকার লাভ করতে হলে যেমন আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা প্রয়োজন, তেমনি পরকালে জান্নাত লাভ করতে হলেও আল্লাহর ইবাদাত করা অপরিহার্য। জান্নাতে কে না যেতে চায়, সবাই জান্নাতের প্রত্যাশা করে থাকে।

ইবাদাতের ভুল অর্থ গ্রহণ করে যেসব মানুষ ইবাদাতের ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তারাও কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাঁর জান্নাত লাভের আশাতেই তা করেছে। মুসলমান বলে দাবী করে কিন্তু পাপাচারে নিমজ্জিত থাকে। এ লোকগুলোও আল্লাহর জান্নাত কামনা করে। আল্লাহ যেন তাদের ক্ষমা করে দেন, এ কারণে তাদের মৃত্যুর পর কোরআন খানির আয়োজন করা হয়, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়, দান-খয়রাত করা হয়।

লোকজন ভাড়া করে এসব আয়োজন করার মধ্যে কি স্বার্থকতা রয়েছে, তা আয়োজকরা আদৌ জানে কি না সন্দেহ। তবুও মৃত ব্যক্তি যেন জান্নাত লাভ করতে পারে, এ আশাতেই তারা ঐসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর জান্নাত লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো নির্ভেজাল পদ্ধতিতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي-وَادْخُلِي جَنَّتِي-

আমার ইবাদাতকারী বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। (সূরা ফাজর-৩০)

আল্লাহ বলেন, বান্দাহ্-আমার জান্নাতে যেতে চাও ! তাহলে আমার গোলামীর খাতায় সর্বপ্রথমে নিজের নামটি লিপিবদ্ধ করো, আমার গোলামী, বন্দেগী, দাসত্ব, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা করো। তাহলে তোমরা আমার জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে। জান্নাতীরা আল্লাহর জান্নাতে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে। সেখানে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো মহান আল্লাহর দিদার লাভ। কেউ যদি জান্নাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সবচেয়ে বড় পাওয়া যদি কেউ পেতে চায় তাহলে তাকেও একমাত্র ঐ আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا-

সুতরাং যে তার রব-এর সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং দাসত্ব করার ক্ষেত্রে নিজের রব-এর সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়। (সূরা কাহ্ফ-১১০)

যদি কেউ প্রশ্ন ওঠায়, আল্লাহর এই গোলামী করার কি কোন নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে বা জীবনের কতটুকু সময় এই গোলামী করতে হবে ? এই প্রশ্নের জবাবও মানুষকে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর গোলামী করতে হবে। মানব জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহরই গোলামী করতে হবে। পৃথিবীর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর গোলাম হয়ে থাকবে এবং তাঁরই গোলামীর মাধ্যমেই সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে।

পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহর

সমস্ত সৃষ্টির মালিক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এসব সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্বও আল্লাহর। এই দায়িত্ব তিনি অন্য কারো প্রতি অর্পণ করেননি। স্বয়ং তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ জন্য মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, আমার কাছে এমন একটি পথ

তোমরা কামনা করো, যে পথ হবে সত্য, সহজ-সরল। কারণ এই পৃথিবীতে অসংখ্য বাঁকা পথ রয়েছে, এসব পথ তোমাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, এসব পথে চললে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে যেখানে সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই অর্পিত হয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল-৯)

পৃথিবীর মানুষের জন্য চিন্তা-চেতনা ও কর্মের নানা ধরনের পথ হতে পারে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। পৃথিবীতে এই অসংখ্য পথের সবগুলোই তো আর সত্য হতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। যেমন যেসব শিক্ষার্থীগণ যখন অঙ্ক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তখন যারা অঙ্কে ভুল করে, তাদের ফলাফল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর যারা নির্ভুল অঙ্ক করে, তাদের ফলাফল একই রকম হয়। এতে প্রমাণ হলো, সত্য হয় একটি আর মিথ্যা হয় অনেকগুলো। সুতরাং সত্য পথ হয় একটি এবং যে জীবনাদর্শটি এ সত্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেটিই একমাত্র সত্য জীবনাদর্শ।

অন্যদিকে কর্মের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং এ পথগুলোর মধ্যে যেটা সত্য-সঠিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটিই একমাত্র সঠিক পথ। এই সত্য-সঠিক নির্ভুল আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। শুধু বড় প্রয়োজনই নয়–বরং মানব জীবনের প্রকৃত মৌলিক প্রয়োজন।

এর কারণ হলো, পৃথিবীর সমস্ত জিনিস তো মানুষের কেবলমাত্র এমন সব প্রয়োজন পূরণ করে যা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। পক্ষান্তরে সহজ-সরল, সত্য পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষ হবার কারণে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়।

এই বিষয়টি যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ এটাই হয় যে, মানুষ হিসাবে তার পৃথিবীতে আগমনই ব্যর্থ হয়েছে। যে আল্লাহ মানুষের অস্তিত্ব দানের পূর্বে মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যিনি মানুষের অস্তিত্ব দান করার পর জীবন ধারণ করার প্রতিটি প্রয়োজন পূর্ণ

করার এমন সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করেছেন, সেই আল্লাহ মানুষের মানবিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আসল প্রয়োজন পূরণের তথা পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না, এটা তো হতে পারে না।

এ জন্য বান্দাহ যখন দাবী পেশ করছে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য সহজ-সরল পথপ্রদর্শন করো, যে পথ তোমার নে'মাতে পরিপূর্ণ–সে পথ আমাদেরকে দেখাও। তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হলো, আমার দাসত্ব করবে-আমার আনুগত্য করবে, এটাই সেই পথ–যা তোমরা দাবী করছো। মহান আল্লাহ রাব্বুল মানব জাতিকে এই হেদায়াত দানের লক্ষ্যেই নবুওয়াতের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি আমার এই নবুওয়াত গ্রহণ না করো, তাহলে বলে দাও তোমাদের ধারণা অনুসারে তোমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আমি অন্য কি পদ্ধতি দান করেছি?

তোমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলো যে, আমি তোমাদেরকে যে চিন্তাশক্তি দিয়েছি, তা প্রয়োগ করে তোমরা নিজেরা পথ আবিষ্কার করে তা অনুসরণ করবে। এ কথা তোমরা বলতে পারো না–কারণ তোমাদের এই মানবিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ইতোপূর্বেই এমন অসংখ্য পথ-মত উদ্ভাবন করেছে যে, তা সবই অসত্য, অনুসরণের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তোমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছো।

এরপর তোমরা আমার ওপর এই অভিযোগও আরোপ করতে পারো না যে, আমি তোমাদেরকে কোন পথই প্রদর্শন করিনি। কারণ, তোমরা মানুষ আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব। আমি তোমাদের প্রতিপালন ও বিকাশ লাভের জন্য এতসব বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে রেখেছি অথচ তোমাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শন না করে একেবারে তিমিরাবৃত পরিবেশে অন্ধকারের বুকে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে বেড়ানোর এবং প্রতি পদে আঘাত পাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি? না, এমন করে তোমাদেরকে আমি ছেড়ে না দিয়ে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমি আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছি।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে জন্মগতভাবে, স্বভাবগতভাবে সত্য সঠিক পথে চলার প্রেরণা দিয়েছেন। অন্যান্য সৃষ্টির মতো তিনি সত্য পথে চলার জন্মগত প্রেরণা মানুষের মধ্যেও দিতে পারতেন। নবী-রাসূল, নবুয়্যাত রিসালাতের

কোন প্রয়োজনই তাহলে হতো না। মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সত্য পথের অনুসারী হতো। কিন্তু মহান আল্লাহর সেটা অভিপ্রায় নয়। তাঁর অভিপ্রায় হলো, তিনি এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটাবেন যে, যে সৃষ্টি তার নিজের পছন্দ ও বিচার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ভ্রান্ত-অভ্রান্ত তথা যে কোন ধরনের পথে চলার স্বাধীনতা রাখবে।

এই স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জ্ঞানের উপকরণে সজ্জিত করা হবে। বুদ্ধি ও চিন্তার যোগ্যতা এবং ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের শক্তি দান করা হবে। তাকে নিজের দেহের অভ্যন্তরের ও দেহের বাইরের অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। তার ভেতরের ও বাইরের সমস্ত দিকে এমন সব অসংখ্য অগণিত কার্যকারণ ছড়িয়ে রাখা হবে যা তার জন্য সঠিক পথ লাভ করা ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়া–এ দুটোরই কারণ হতে পারে।

যদি মানুষকে স্বভাবগত বা জন্মগতভাবে সঠিক পথের অনুসারী করা হতো, তাহলে এসবই অর্থহীন হয়ে যেতো এবং উন্নতির এমন সব উচ্চতম পর্যায়ে পৌছানো মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। মানুষকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই সে তার চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক পথে পরিচালিত করার নীতি পরিহার করে নবুওয়াত-রিসালাতের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের স্বাধীনতা যেমন অক্ষুন্ন থাকবে তেমনি মানুষের পরীক্ষার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং সত্য সহজ-সরল ও সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে তার সামনে পেশ করে দেয়া হবে। সুতরাং সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা নিজে গ্রহণ করেছেন। মানুষ যখন তাঁর কাছে আবেদন জানালো সত্য পথের জন্য, তখন তাঁর সামনে গোটা কোরআন দিয়ে বলে দেয়া হলো, এই কোরআনের বিধান অনুসরণ করো। তোমরা যে হেদায়াত চাচ্ছো, এই কোরআনই হলো সেই হেদায়াত।

আল্লাহর নে'মাতপ্রাপ্ত চারটি শ্রেণী

নামায আদায়ের সময় সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালো, কোন পথে জীবন পরিচালিত করে কারা তোমার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে, তাদের পরিচয় আমাদেরকে জানাও। বান্দার প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ –وَالصّٰلِحِيْنَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সেই সব লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নে'মাত দান করেছেন। তারা হচ্ছে নবীগণ, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। (সূরা নেছা-৬৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করলো, নিঃসন্দেহে সে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সঙ্গী হলো। চার শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এই অনুগ্রহ প্রাপ্তদের দলে শামিল রয়েছেন। প্রথম শ্রেণী হলেন, নবী-রাসূলগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন সিদ্দীকগণ, তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন শহীদগণ এবং সালেহ্ বা সৎলোকগণ। এই চার শ্রেণীর বাইরের শ্রেণীগুলো আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নয়–তারা অভিশপ্ত। মানুষ যদি এই চার শ্রেণীর লোকদের ত্যাগ করে অন্য কোন শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাদের অনুসরণ করতে থাকে, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে ধ্বংসের মুখোমুখি হবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবী ও রাসূলগণ

অনুগ্রহপ্রাপ্তদের চারটি দলের প্রথম দলে যারা অবস্থান করছেন তাঁরা হলেন আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ। নিখিল মানুষের চিরন্তন শান্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে যারা সত্যের বিধান লাভ করেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন নবী ও রাসূল। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশ্তার মাধ্যমে ওহী লাভ করেছেন। এই নবী ও রাসূলগণ হচ্ছেন বে-গুনাহ্, মা'ছুম। তাঁরা কোন ভুল করেন না এবং কোন গুনাহ্ করেন না। এই পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সুপার কোয়ালিটির (Super quality) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবী ও রাসূলগণ। তাঁরা হলেন মানব জাতির আদর্শ, মানুষ তাঁদেরকেই অনুসরণ করবে। নবী ও রাসূলদের তুলনায় এ পৃথিবীতে উন্নত চরিত্রের কোন মানুষ হতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে নবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁরা মহাসত্যের ওপরে এবং সবচেয়ে সত্য-সরল ও দৃঢ় পথের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের গোটা জীবন চরিত্রে কালিমার সামান্যতম স্পর্শ ঘটেনা। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁদেরকে যাবতীয় দুর্বলতা থেকে হেফাজত করেন। মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে একমাত্র তাঁদেরকেই অনুসরণ যোগ্য আদর্শ নেতা হিসাবে পবিত্র কোরআনে উপস্থাপন করে তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে, তাঁদেরকে অনুসরণ না করলে পৃথিবী ও আখিরাতে মানুষ চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে।

এই নবী-রাসূলদের প্রতি একশ্রেণীর মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে। তারা অতি ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে নবী ও রাসূলদেরকে মানুষ মনে করেন না। তাদের ধারণা হলো, নবীদের সম্মান-মর্যাদা সর্বোচ্চে, সুতরাং তাঁরা মানুষ হতে পারেন না। কেননা, কোন মানুষ এতটা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন না। নবীগণ মানুষ নন—তাহলে তারা কি ?

এ প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে নেই। নবীগণ মানুষ নন—তাহলে তাঁরা ফেরেশ্তা অথবা জ্বিন হবেন। তাঁদেরকে যদি ফেরেশ্তা বা জ্বিন বলা যায়, তাহলে কি তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলো ? জ্বিন ও ফেরেশ্তাদের তুলনায় নবী-রাসূলদের সম্মান মর্যাদা অনেক অনেক উচ্চে। সুতরাং তাঁরা জ্বিন বা ফেরেশ্তা ছিলেন না। আর তাঁরা যে জ্বিন অথবা ফেরেশ্তা ছিলেন না, এ কথা আল্লাহর কোরআনে অনেক স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে। জ্বিন ও ফেরেশ্তাদের তুলনায় মানুষের মর্যাদা অনেক বেশী। তাঁরা মানুষ ছিলেন এবং মানুষের মধ্য থেকেই তাঁদেরকে মহান আল্লাহ্ নবী-রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

একশ্রেণীর মানুষ যারা আলেম হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত, জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে তারা নবী-রাসূল মানুষ কিনা—এই বিতর্ক সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ভাবে নবীদের মানবীয় সত্তা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন—

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ

বলো, আমিও তোমাদের অনুরূপ মানুষ মাত্র। আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ও একক। (সূরা কাহ্ফ-১১০)

মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়ে দিচ্ছেন–আপনি বলুন, আমিও তোমাদের মতোই মানুষ। আমি জ্বিন বা ফেরেশ্তা নই, আমার কাছে ওহী আসে, এটাই পার্থক্য। আমিও তোমাদের মতোই পানাহার করি, সংসার জীবন-যাপন করি, আমাকে বাজারে যেতে হয়, যেহেতু আমিও তোমাদের অনুরূপই একজন মানুষ মাত্র।

নবী-রাসূলও মানুষ সাধারণ মানুষও–মানুষ। তবে এ দুই মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। নবী-রাসূলগণ হলেন অসাধারণ মানুষ–মহামানব। পবিত্র কোরআনে নবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ওপরে তাঁদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। সাধারণ মানুষ ভুল করে, গোনাহ্ করে, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নবী-রাসূলগণ এসব দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁরা কোন ভুল করেন না, গোনাহ্ করেন না, আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত তাঁরা কিছুই করেন না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলদের দিয়ে কোন ধরনের গোনাহের কাজ সংঘটিত হতে দেন না। তিনি তাঁদেরকে নিজের কুদরত দিয়ে অথবা ফেরেশ্তার মাধ্যমে গোনাহ্ থেকে হেফাজত করেন।

সুতরাং এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূলগণ ছিলেন মানুষ। নবীদের আদর্শই হলো একমাত্র অনুসরণ যোগ্য আদর্শ। তাঁদের আদর্শ ব্যতিত অন্য কোন আদর্শ, চিন্তাধারা, কর্মপন্থা, মতবাদ গ্রহণ করা বা অনুসরণ করা যাবে না। এই পৃথিবীতে নবীকেই একমাত্র অনুকরণীয় নেতা হিসাবে মানতে হবে। নবী-রাসূলদেরকে 'নেতা' হিসাবে উল্লেখ করায় কিছু সংখ্যক লোক আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন।

তারা নবীকে নেতা হিসাবে উল্লেখ করার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু সাধারণ মানুষকে নেতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন দলের লোকজন তাদের ছোট, বড়, মাঝারি নেতার নামে ধ্বনি দিয়ে থাকে। সুতরাং নবীকে নেতা হিসাবে উল্লেখ করা হলে, তাঁকে মানুষ নেতাদের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁদের সম্মান-মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

জ্ঞানের দৈন্যতার কারণেই এ ধরনের যুক্তি তারা দিয়ে থাকেন। একটি বিষয় স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, নবী-রাসূলদের আনিত আদর্শ যেমন কোন আইন-বিধানের

অধীনস্থ হয়ে থাকতে আসেনি, তেমনি পৃথিবীতে কোন একজন নবী-রাসূলও সাধারণ মানুষের অধীনস্থ হবার জন্য আগমন করেননি।

পৃথিবীতে মানুষ দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর মানুষ যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। আরেক শ্রেণীর মানুষ যারা আদেশ অনুসরণ করে ও আনুগত্য করে থাকে। যেমন ইমামের অনুসরণ করেন মুক্তাদীগণ। সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকগণ তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের কমান্ডিং অফিসারদের কমান্ড অনুসারে চলে। একটি দেশের শাসকের আনুগত্য করে থাকে সাধারণ মানুষ। কিন্তু নবী-রাসূলগণ কাদের আনুগত্য করবেন? তাঁরা যারই আনুগত্য করবেন, তার গোলাম হয়ে যাবেন তাঁরা।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ কোন একজন নবী-রাসূলকেও এই পৃথিবীতে এক আল্লাহ ব্যতিত আর কারো গোলামী, আনুগত্য বা অনুসরণ করার জন্য প্রেরণ করেননি। বরং সমস্ত মানুষ তাঁদেরকেই অনুসরণ করবে। তাঁরা নেতা আর সমস্ত মানুষ হলো তাঁদের অনুসারী। তাঁরা আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলনের সূচনা করে গিয়েছেন, সেই আন্দোলনের তাঁরা নেতা। আর এই আন্দোলনে যারা শামিল হয়েছে অর্থাৎ মুসলমান হয়েছে, তাঁরা সবাই অনুসারী। তাঁরা ইমাম হতে এসেছেন–মুক্তাদী হতে নয়, নেতা হয়ে এসেছেন, অনুসারী হয়ে নয়।

নবীকে নেতা বলার ব্যাপারে যারা আপত্তি করে থাকেন, তারা যখন নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন, তখন তারা লক্ষ্য করেন না, দরুদের মধ্যে তারা কি বলছেন। দরুদের মধ্যে যে 'সাইয়েদেনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এই শব্দের অর্থও নেতা। সুতরাং আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূল ছিলেন নেতা। তাঁরা ছিলেন মা'ছুম, বে-গুনাহ্, নিষ্পাপ। কোন পাপ-ই তাঁদেরকে স্পর্শ করেনি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্বনেতা।

অন্যান্য নবী-রাসূলদেরকে পৃথিবীর বিশেষ কোন এলাকার বা জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না, তিনিই শেষনবী। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে–তিনি তাদেরও নবী। এই নবী-রাসূলগণ হলেন মহান আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত। মানুষ অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ অনুসরণ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ

করে নবী-রাসূলদের দেখিয়ে দিয়েছেন, তোমরা আমার প্রেরিত নবী-রাসূলদের অনুসরণ ও আনুগত্য করো, তাহলে তোমরাও তাদের সঙ্গী হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

সিদ্দিকীনদের সম্মান-মর্যাদা

অনুগ্রহপ্রাপ্তদের দলে দ্বিতীয় যে দলটি রয়েছেন, তারা হলেন সিদ্দিকীন। সিদ্দীক বলতে সেসব ব্যক্তিকেই বুঝায়, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যবাদী। যার মধ্যে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা জীবনের প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় থাকে। নিজের কাজ-কর্ম আচরণ এবং নেয়া-দেয়ার ক্ষেত্রে সব সময়ই অত্যন্ত পরিষ্কার ও সহজ-সরল পথ অবলম্বন করে। এরা যখন কোন বিষয়ের প্রতি সমর্থন করে, তখন সত্য ও ন্যায়কেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সমর্থন করে এবং সত্যের বিপরীত কোন জিনিসের মোকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে সে সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ করে না। যাদের চরিত্র এতটা পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং নিষ্কলুষ হবে, তার কাছে পরিচিত ও অপরিচিত সমস্ত মানুষই ঐকান্তিক সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতারই আশা পোষণ করবে, কোন ধরনের অসত্য ও অন্যায়ের আশঙ্কা করবে না। সিদ্দিকীনদের মধ্যে যারা শামিল রয়েছেন, তাঁরা সত্যকে উদার, উন্মুক্ত ও অকুণ্ঠিত চিত্তে দ্বিধাহীনভাবে, কোন ধরনের আপত্তি বা প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করে থাকেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সিদ্দিকে আকবর বলা হয়। এই উপাধিতে তাঁকে এ জন্য ভূষিত করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ থেকে রাতের শেষে ফিরে এসে বায়তুল্লাহ্ শরীফে ফজরের নামাজ আদায় করে অবস্থান করছিলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধিদের ঘৃণ্য নীতি ছিল, তারা আল্লাহর রাসূলকে দেখলেই বিদ্রূপ করে নানা ধরনের প্রশ্ন করতো। সেদিন সকালে আল্লাহর রাসূল কা'বা শরীফে বসে আছেন। এমন সময় সেখানে আবু জেহেলের আগমন ঘটলো। আল্লাহর নবীকে দেখেই সে বিদ্রূপ করে প্রশ্ন করলো, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! প্রতিদিনই তুমি আমাদেরকে নিত্য-নতুন কথা শোনাও, আজকে কি কোন নতুন সংবাদ আছে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, অবশ্যই আছে, আর তাহলো, গতরাতে আমার মিরাজ হয়েছে। আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে নামাজ

আদায় করে উর্ধ্ব আকাশে গিয়েছি, আকাশের সমস্ত স্তর অতিক্রম করে আল্লাহর আরশে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেছি। জান্নাত-জাহান্নাম দেখেছি। তারপর সেখান থেকে এই পৃথিবীতে ফিরে এসে এখানে ফজরের নামাজ আদায় করেছি।

আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে মিরাজের ঘটনা শুনে ইসলামের দুশমন আবু জেহেলের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। আবু জেহেলের ধারণা হলো, এই লোকটির মাথায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। তা না হলে এ ধরনের অসম্ভব কোন ঘটনার কথা বলবে কেন। মিরাজের বিষয়টি আবু জেহেলের কাছে ইসলামের সাথে বিরোধিতা করার আরেকটি অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হলো। তারা নানা অস্ত্র প্রয়োগ করে আল্লাহর রাসূলকে প্রকৃত রাসূল নয় বলে মানব সমাজে প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। এবার তার কাছে মনে হলো, সে যেন মোক্ষম অস্ত্র লাভ করলো। এই অসম্ভব ঘটনার কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করে সে এবার প্রমাণ করবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মিথ্যাবাদী। এ জন্য সে আল্লাহর রাসূলকে বললো, তুমি যে মিরাজের কথা বললে, আমি কি তা মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই তুমি প্রকাশ করতে পারো।

আবু জেহেল মোক্ষম অস্ত্র হাতে ছুটলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে। তার উদ্দেশ্য–সে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বিভ্রান্ত করবে। সে বললো, আবু বকর, তুমি কি শুনেছো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছে? তারপর সে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে শোনা মিরাজের ঘটনা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে বর্ণনা করলো।

ধীর স্থিরভাবে তিনি বিস্তারিত শুনলেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন–আবু জেহেল! তুমি যা বললে, আল্লাহর রাসূল কি ঠিক এই ঘটনাই বর্ণনা করেছেন? আবু জেহেল বললো, আমি এ ঘটনা নিজের কানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনেছি এবং তিনি এখনও কা'বা ঘরে বসে আছেন।

হযরত আবু বকর আবু জেহেলকে নিরাশ করে দৃঢ়কণ্ঠে অটল বিশ্বাসে জানিয়ে দিলেন, আবু জেহেল তুমি শুনে রাখো, তুমি যা শোনালে তা যদি আমার আল্লাহর রাসূল অনুরূপ বলে থাকেন, তা অবশ্যই সত্য। এরপর তিনি কা'বার প্রাঙ্গনে এসে

রাসূলের কাছে আবু জেহেলের মুখ থেকে শোনা মিরাজের ঘটনা উল্লেখ করে বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন, এসব ঘটনা সত্য কিনা। ঘটনা সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর রাসূল মিরাজের সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁর কাছে প্রকাশ করলেন।

সমস্ত ঘটনা শোনার পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অবিচল বিশ্বাসে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বর্ণনায় অতিরঞ্জন কিছুই নেই, নিঃসন্দেহে আপনার মিরাজ হয়েছে, আপনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য এবং সঠিক বলেছেন।

কোন ধরনের আপত্তি, যুক্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন না করেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কণ্ঠে অটল বিশ্বাসের ধ্বনি উচ্চারিত হতে দেখে আল্লাহর রাসূল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘোষণা দিলেন, আবু বকর! তুমি সিদ্দীক।

সুতরাং সিদ্দিকীন হলেন তাঁরাই, যারা মহাসত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করেননি, দ্বিধাহীনভাবে, অকুণ্ঠিত চিত্তে মহাসত্যের সামনে নিজের আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছেন। সত্য গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁরা কোন দ্বিমত পোষণ করেননি, কোন কূটতর্কের অবতারণা করেননি, এসব মানুষই হলেন সিদ্দীক এবং এদের দলকেই বলা হয় সিদ্দিকীন। এই সিদ্দিকীনদের দলই হলো আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত। নবী ও রাসূলগণ যে আদর্শ এই পৃথিবীতে এনেছেন, সে আদর্শের প্রতি সিদ্দীকগণ যেমনভাবে আনুগত্য করেছে, তেমনি ভাবে আনুগত্য করতে হবে। তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের দলে শামিল হওয়া যাবে।

শহীদদের সম্মান-মর্যাদা

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের দলে আরেক শ্রেণীর লোক শামিল রয়েছেন—যাদেরকে আল্লাহর কোরআন শুহাদা হিসাবে উল্লেখ করেছে। মহাসত্যের ব্যাপারে যারা সাক্ষ্য দান করেছেন তাঁরাই হলেন কোরআনের ভাষায় শুহাদা। এই শুহাদা শব্দ থেকেই শহীদ শব্দ এসেছে। আল্লাহ, রাসূল, কোরআন ও হাদীস—এসব হলো মহাসত্য। এই মহাসত্যকে যারা স্বীকৃতি দিয়েছে, নিজেরা অকুণ্ঠ চিত্তে মহাসত্যের স্বীকৃতি দিয়েছে, নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে, এর বাইরে সত্য আর কিছুই নেই। এই সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা নিজেদের মূল্যবান সময়, কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেছে, নিজেদের মেধা, যোগ্যতা, স্বাস্থ্য এবং পরিশেষে

নিজের জীবন দান করে এ কথারই প্রমাণ দিয়েছে যে, এসবই হলো একমাত্র সত্য এবং মহাসত্য। এই সত্য আল্লাহর জমীনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের যা ছিল, সমস্ত কিছুই তারা আল্লাহর পথে নিঃশেষে দান করে দিয়ে মহাসত্যের সাক্ষী হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন, তাঁরাই হলেন শহীদ। এরা নিজের জীবনের সমগ্র ও সম্পূর্ণ কর্মনীতি এবং কাজের পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের ঈমানের সত্যতা ও অকৃত্রিমতার সাক্ষ্য দান করেন।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে ব্যক্তি নিজের জীবন দান করেন তাকে এ জন্য শহীদ বলা হয় যে, সে ব্যক্তি তার প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে এ কথারই প্রমাণ দিয়েছে যে, সে যে আদর্শের প্রতি বিশ্বাস করতো এবং যে আদর্শকে সে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতো, সে আদর্শ তার কাছে নিজের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, পৃথিবীর যাবতীয় ধন-ঐশ্বর্য এবং নিজের প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয় ছিল। এ জন্য সে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হননি। এই শহীদগণ হলেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

শহীদগণের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর দরবারে যে কত বেশী, তা কল্পনাও করা যায় না। বিচার দিবসের দিনে যখন প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে, পৃথিবীতে সে কি করে এসেছে। হিসাব না দিয়ে কেউ একটি কদমও উঠাতে পারবে না, সেদিন এই শহীদগণের কোন হিসাব গ্রহণ করা হবে না। তাঁরা কোন ধরনের হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করবেন।

আল্লাহর রাসূল বলেন–আল্লাহর পথের সৈনিকের রক্তের প্রথম ফোটা মৃত্তিকা স্পর্শ করার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের আবাস স্থল তাকে প্রদর্শন করা হয়। কবরের ভয়াবহ আযাব থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়। কিয়ামতের বিভিষীকা দেখে সবাই যখন ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়বে, তখন শহীদদেরকে কোন ধরনের ভয়-ভীতি স্পর্শ করতে পারবে না। কিয়ামতের ময়দানে তার মাথায় এমন মহামূল্যবান মুকুট পরিধান করানো হবে যে, সে মুকুটের ক্ষুদ্র একটি পাথরও এই পৃথিবী ও তার ভেতরে যা কিছু রয়েছে, তারচেয়েও অধিক মূল্যবান। জান্নাতে তাঁর সাথী হিসেবে অসংখ্য হুর দেয়া হবে। তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের ভেতর থেকে সত্তর জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। (তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটো ফোটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার একটি ফোটা হলো, আল্লাহর ভয়ে যে চোখ ফোটায় ফোটায় অশ্রু ঝরায়। এই অশ্রু বিন্দু আল্লাহ পাকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এর কারণ হলো, মানুষ আল্লাহকে দেখেনি, তাঁর জান্নাত-জাহান্নাম দেখেনি। এসব না দেখেও গভীরভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাঁর ভয়ে আরামের শয্যা ত্যাগ করে গভীর রাথে নির্জনে আল্লাহর দরবারে অশ্রু ঝরিয়েছে। আরেকটি ফোটা হলো, আল্লাহর পথের সৈনিকের দেহের তপ্ত রক্তের ফোটা। লড়াইয়ের ময়দানে ইসলামের শত্রুগণ তাকে আঘাত করেছে, এই আঘাতে তাঁর শরীর থেকে যে রক্তের ফোটা গড়িয়ে পড়েছে, এই রক্তের ফোটা আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ইসলামের শত্রুরা ঈমানদারের দেহে আঘাত করে যে চিহ্ন সৃষ্টি করেছে, এই চিহ্ন আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ঈমানদার বান্দা ফরয ইবাদাত করেছে এ কারণে তাঁর দেহে যেসব চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে, এসব চিহ্ন আল্লাহ পাক অত্যন্ত ভালোবাসেন। (তিরমিযী)

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের চাচা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে উঠবেন। ওহুদের ময়দানে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাঁর বুক চিরে কলিজা চিবিয়েছিল। তাঁর নাক কান কেটে মালা বানিয়ে তা গলায় পরিধান করেছিল হিংস্র হায়েনার দল। তিনি এই অবস্থা নিয়ে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবেন। এভাবে অসংখ্য শহীদগণ কেউ তারবারির আঘাত নিয়ে, কেউ বর্শার আঘাত নিয়ে, কেউ বুলেটের আঘাত নিয়ে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবেন। তাদের সামনে নাদুস-নুদুশ চর্বি থলথলে দেহ নিয়ে ইসলামের সৈনিক দাবীদারগণ কিভাবে দাঁড়াবেন?

দাবী করা হয় আমরা ইসলামের খাদেম–অথচ জীবনে তাকে কোন দিন কোন অপবাদের মুখোমুখী হতে হলো না, ইসলামের শত্রু পক্ষের মুখপত্র পত্রিকাসমূহে তাঁর বিরুদ্ধে কোন লেখা প্রকাশ হলো না, জেলে যেতে হলো না, ময়দানে বাতিল শক্তি তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলো না, নাগরিকত্ব বাতিল হলো না, তার কুশপুত্তলিকা কেউ দাহ করলো না, আদালতে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা হলো না, ইসলামের পক্ষে জীবনে একটা মিছিল পর্যন্ত করলো না, অথচ নিজেকে রাসূলের আশেক, আল্লাহর সৈনিক, যুগের মুজাদ্দিদ, ওলীয়ে কামিল ইত্যাদি বলে প্রচার করা হয়। এসব লোককে কিয়ামতের ময়দানে ঐসব লোকদের সামনে লজ্জিত হতে হবে, যারা ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে নির্যাতন সহ্য করেছেন।

আল্লাহর পথে যারা নিজের মূল্যবান প্রিয় জীবন বিলিয়ে দেন, জীবন-যৌবন, স্ত্রী-পুত্র সমস্ত কিছুর মমতা পরিত্যাগ করে যারা ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে বিরোধী শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে মৃত্যুকে স্বাগত জানায়, তাদের সৌভাগ্য দেখে কিয়ামতের ময়দানে মানুষ ইর্ষাবোধ করবে। কারণ নবী-রাসূলগণের কাতারে তারা স্থান লাভ করবে। স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন-একবার আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে ভ্রমণে যাচ্ছিলাম। যখন আমরা হাররাতে ওয়াকীম নামক স্থানে উপনীত হলাম সেখানে পাহাড়ের উপত্যকায় বেশ কয়েকটি কবর দেখতে পেলাম। আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চাইলাম, হে রাসূল! এগুলো কি আমাদের ভাইয়ের কবর! আল্লাহর নবী আমাদেরকে জানালেন, এগুলো আমাদের সাথী বন্ধুদের কবর। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর পথে নিহতদের কবরের কাছে গেলাম, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো আমাদের ভাইদের কবর।

শহীদদের কত বড় মর্যাদা! আল্লাহর পথে যারা জীবন দান করেছেন, স্বয়ং আল্লাহর হাবিব তাদেরকে নিজের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত উতবা ইবনে আব্দুস সুলামী বর্ণনা করেন আল্লাহর নবী বলেছেন, আল্লাহর পথে নিহত মানুষ তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণী হলো, ঐসব মুমিন ব্যক্তি, যারা নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে থাকে এবং প্রয়োজনে বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করতে করতে অকুতোভয়ে শাহাদাত বরণ করে।

এসব লোক হলো পরীক্ষিত শহীদ-এরা মহান আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। তাদের আর নবীগণের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য হলো, শহীদগণকে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়নি আর নবীদেরকে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করে অধিক মর্যাদা দান করা হয়েছে। অর্থাৎ নবীগণকে যে সম্মান ও মর্যাদায় আল্লাহ তা'য়ালা অভিষিক্ত করবেন, শহীদগণকেও প্রায় অনুরূপ মর্যাদা দান করা হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হলো ঐসব মুমিন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে এবং মানবীয় দুর্বলতার কারণে পাপ তাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছে। তবুও এই ধরনের ব্যক্তি জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিরোধী শক্তির

সাথে নির্ভীকভাবে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছে। এভাবে সে নিজের পাপ মুছে ফেলেছে। কারণ জিহাদের অস্ত্রই সমস্ত অপরাধ মোচন করে দেয়। এই ধরনের ব্যক্তি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে তার ইচ্ছে মতো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে।

আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, ইসলামের প্রতি যাদের অন্তরে রয়েছে সন্দেহ সংশয়। ইসলামকে এরা মোটেও ভালোবাসে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, এ ধরনের তৎপরতা তাদের নেই। কিন্তু এরা তাদের মনের ভাব আল্লাহর পথের সৈনিকদের কাছে প্রকাশ করেও সাহস পায় না। জাগতিক সুবিধা লাভের আশায় এরা দ্বীনি আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে। এরা পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে জিহাদে অসন্তুষ্টির সাথে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। লোকজনকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদও দান করে থাকে। এরা যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয় তবুও এরা জাহান্নামী। কারণ জিহাদের অস্ত্র মুনাফেকী মুছে দিতে সক্ষম নয়। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ অস্বাদন করাবেন। মৃত্যুর সময় ঈমানের শ্রেণী অনুসারে মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন শহীদগণ। ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যারা দ্বীনি আন্দোলন করে এবং জিহাদের ময়দানে বাতিলের আঘাতে শাহাদাত বরণ করে, তাদের কোন মৃত্যু যন্ত্রণা নেই। তাঁরা যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু লাভ করে থাকে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে জীবন দানকারী ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে না, তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ের কামড়ে যেটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল সেটুকুই সে অনুভব করে মাত্র। (তিরমিযী)

জিহাদের ময়দানে আমরা দেখতে পাই, অবর্ণনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়। আসলে তাঁরা কোন কষ্টই অনুভব করে না। ছোট্ট একটি পিঁপড়া দংশন করলে মানুষ যে কষ্ট অনুভব করে থাকে, আল্লাহর পথের সৈনিক শাহাদাত বরণ করার সময় সেই কষ্ট অনুভব করে থাকে। সুতরাং, ইসলাম বিরোধী শক্তি লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যম্যে হত্যা করবে, এই আশঙ্কায় জিহাদের ময়দানে কর্মসূচীতে যোগদানের ব্যাপারে যারা শিথিলতা প্রদর্শন

করে তাকে, তাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রয়োজন শুধু ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা। বাতিল শক্তিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে অনেক বড়-বিশাল দেখা যায়। তাদের মিছিল-সমাবেশ দেখে মনে কত বিশাল এদের শক্তি। আসলে ঈমানদারদের 'আল্লাহু আকবর' গর্জনে ওদের কলিজায় কম্পন দেখা দেয়। ভয়ে ওরা ময়দান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কোন বাড়িতে যদি কোন ব্যক্তি চুরি করার মানসিকতা নিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে তার মন থাকে দুর্বল। সামান্য শব্দে সে চমকে ওঠে। চোরকে দেখে যদি সে বাড়ির ছোট্ট একটি শিশুও 'কে?' বলে আওয়াজ দেয় চোরের কলিজায় কম্পন সৃষ্টি হয়। বাড়ির মালিক জেগে উঠে তাকে ধরবে, এই ভয়ে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক হলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন আর ঈমানদারদের অভিভাবক তিনিই। আল্লাহ তা'য়ালা এই জমিনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব ঈমানদারকেই দান করেছেন।

সুতরাং এই জমিনে ইসলাম বিরোধী শক্তি হলো চোরের মতই ভীরু, এদের মিছিল-সামবেশ আকারে বড় হলেও গুটি কয়েক ঈমানদার যখন তাদের মোকাবিলায় 'আল্লাহু আকবর' বলে গর্জন করে ওঠে। তখন তারা আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে যেমন এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে, বর্তমান ময়দানেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শর্ত হলো একটিই-ঈমানদার হতে হবে, মুমিন হতে হবে। যার অন্তরে জিহাদ করার ইচ্ছা নেই, জিহাদের কামনা যে ব্যক্তি অন্তরে পোষণ করে না, সে ব্যক্তির মৃত্যু হবে মুনাফিকীর মৃত্যু। আর মুনাফিকের স্থান হবে জাহান্নামে কাফিরের পায়ের নীচে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের কোন আকাংখাও অন্তরে পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করলো, তার মৃত্যু হলো মুনাফিকী স্বভাবের ওপর। (মুসলিম)

শাহাদাতের তামান্না মুমিন হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। যে হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না নেই, সেই হৃদয় মুনাফিকদের হৃদয়ের মতো। সুতরাং মনে এই আশা পোষন করতে হবে, আল্লাহ যখন মৃত্যু দেবেন, তখন যেন শাহাদাতের মৃত্যু দেন। মৃত্যু একটি কঠোর বাস্তবতা। এই মৃত্যু থেকে কোনক্রমেই নিজেকে লুকিয়ে রাখা যাবে

না। তাহলে মৃত্যু যখন হবেই তখন শাহাদাতের মৃত্যুই আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে। হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন আল্লাহর রাসূল বলেছেন–যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য দোয়া করে তাহলে সে যদি শয্যাশায়ী হয়েও মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছে দেবেন। (মুসলিম)

শহীদী মৃত্যু হলো একটি সেতু বন্ধন, এই সেতু অতিক্রম করার সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। এই শহীদগণ হলেন নে'মাতপ্রাপ্ত, এদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কোরআনের মর্যাদা, রাসূলের মর্যাদা, হাদীসের সম্মান তথা ইসলামকে সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনে জান-মাল কোরবানী করতে হবে।

সালেহীনদের সম্মান-মর্যাদা

নে'মাতপ্রাপ্ত বা মহান আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের আরেকটি দল হলেন সালেহীনদের দল। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা নেছার ৬৯ নম্বর আয়াতে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের যে চারটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন, সালেহীনদের দল হলো সর্বশেষ দল। সালেহ্ শব্দের বহুবচন হলো সালেহীন। এর অর্থহলো সৎলোকগণ। সৎলোক বলতে তাদেরকেই বুঝায়, যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, মননশীলতা এবং নিজেদের কর্মের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সর্বাত্মকভাবে নিজেদের জীবনকে ন্যায়-নিষ্ঠা ও সৎ আচরণ সহকারে পরিচালিত করে।

যারা সালেহীন, তাঁরা কখনো ইসলামী আদর্শের সাথে আপোষ করেন না। ইসলামের অবমাননা করা হচ্ছে, আল্লাহর কোরআন, রাসূলের হাদীস, ইসলামী আইন-কানুন, নবী-রাসূলদের সাথে বেয়াদবি করা হচ্ছে, মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন করা হচ্ছে ইত্যাদি দেখে তারা নীরব থাকেন না। সিংহ-গর্জনে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। এসব ব্যাপারে যদি তার অর্থ-সম্পদের ক্ষতি হয়, সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, কারো সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, দৈহিকভাবে নির্যাতন সহ্য করতে হয়, জেলে যেতে হয়, ফাঁসির রশি গলায় পরতে হয়, তবুও সে তার আদর্শের প্রতি অটল-অবিচল থাকে। আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানের সাথে কোনক্রমেই তাঁরা বিন্দুমাত্র আপোষ করেন না। হকের ওপরে তাঁরা চলেন এবং হক কথা তাঁরা বলতে

থাকেন। এরা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত দল, এই দলে শামিল হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّلِحِيْنَ–

আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদেরকে আমি অবশ্যই সালেহীনদের মধ্যে শামিল করবো। (সূরা আনকাবুত-৯)

যারা সালেহীনদের দলে শামিল হবে তাদেরকে কি ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُؤْ مِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاتِه وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا–ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ–

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, (আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে) আল্লাহ তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে সবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে আর এটাই বড় সাফল্য। (সূরা তাগাবুন-৯)

নে'মাতপ্রাপ্তদের অনুসরণ করা ব্যতীত কোন মানুষ কোনক্রমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে না, মানুষ হিসাবে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, কিয়ামতের ময়দানে তাকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির বোঝা বহন করে জাহান্নামে যেতে হবে। যে চার শ্রেণীর মানুষের বিষয় আলোচনা করা হলো, তাঁরাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নে'মাতপ্রাপ্ত। পবিত্র কোরআনে তাঁদেরকে নে'মাতপ্রাপ্ত হিসাবে এ জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন মহান আল্লাহর গোলাম, তাদের জীবন ছিল আল্লাহর দাসত্বের রঙে রঙীন।

মহান আল্লাহর নে'মাতপ্রাপ্তদের দলই হাশরের ময়দানে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে, এর বাইরের সমস্ত মানুষগুলো ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল থাকবে। আর নে'মাতপ্রাপ্তদের দলে শামিল হতে হলে মানুষকে অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত তথা গোলামী করতে হবে এবং সেই গোলামী হবে শির্ক মুক্ত পরিচ্ছন্ন গোলামী। আল্লাহর ইবাদাত করা হবে, সেই সাথে মানুষের বানানো আইন-বিধানও অনুসরণ করা হবে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার গোলামীর সাথে শির্ক মিশ্রিত করা

হবে, এই শিরকযুক্ত গোলামী আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তথা ইসলামকে নিজেদের জন্য জীবন-যাপনের পদ্ধতি তথা জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এখন জীবন পচিালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের অনুসারী হবার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যাদের মধ্যে কোরআন-হাদীস প্রদত্ত চিন্তা-পদ্ধতি ও জীবনধারার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্র নেই।

বরং তারা আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের পথ অবলম্বন করেছে। তারাই একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করছে এবং কোরআনের পরিভাষায় এরাই হলো মুসলিম। এরা মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল। এই আনুগত্য শুধুমাত্র বাহ্যিক আনুগত্য নয়, না মেনে উপায় নেই তাই মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে বা মন চায় না, তবুও আনুগত্য করছে। অর্থাৎ ইচ্ছার বিপরীত নয়, বরং আল্লাহর বিধানের প্রতি যে আনুগত্য করছে, তা একান্তভাবেই হৃদয়-মন দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথেই করছে।

যারা মহান আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করে তারা ইসলামের নেতৃত্বকেই একমাত্র সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং চিন্তা ও কর্মের যে পথ আল্লাহর কোরআন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শন করেছেন, সেটাকেই একমাত্র সোজা-সঠিক ও সহজ-সরল পথ হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং এই পথ অনুসরণের মধ্যেই জীবনের সাফল্য নিহিত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে। যে বিষয় বা জিনিসকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন, আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দাগণ সেই বিষয় ও জিনিসকে নিশ্চিত ভ্রান্ত বলেই আখ্যায়িত করে থাকে।

আর যা কিছু আল্লাহ এবং রাসূল সত্য বলে ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর দাসত্বকারী বান্দাগণের মন-মস্তিষ্কও তাকেই একমাত্র সত্য ও নির্ভুল বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসের মধ্যে কোনো প্রকারের সন্দেহ-সংশয় মিশ্রিত থাকে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো বিধানকে তারা পরিবর্তন করে না। নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই বিধানের মধ্যে কোনো ধরনের ফাঁক-ফোকড় অনুসন্ধান করে না। অথবা পৃথিবীতে প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতির অনুকূলে আল্লাহর বিধানকে ঢেলে সাজানোর অপচেষ্টাও করে না।

সিংহ গর্জনে মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী

মোঘল সম্রাট আকবর আল্লাহর বিধানকে কাটছাঁট করে, এর ভেতরে নতুন কিছু জুড়ে দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার এক নতুন আদর্শ রচনা করে তার নাম দিলো 'দ্বীনে ইলাহী' এবং প্রজাসাধারণকে এই আদর্শ অনুসরণ করার লক্ষ্যে আদেশ জারী করলো। তার সামনে মাথানত করার আদেশ দেয়া হলো। দুনিয়া পূজারী একশ্রেণীর আলিম নামধারী লোকজন সম্রাট আকবরের কুফ্রী পদক্ষেপের স্বপক্ষে ফতোয়াও দিলো। প্রতিবাদ করলেন হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ)। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, মানুষের এই মাথা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে নত হতে পারে না।

তাঁর ওপরে রাজরোষ নেমে এলো, তাঁকে অত্যাচারিত হতে হলো। কুফ্রী মতবাদের প্রবর্তক সম্রাট আকবর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো কিন্তু তার প্রবর্তিত প্রথা বহাল থাকলো। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলেও এই ঘৃণ্য প্রথার অনুকূলে মতামত দেয়ার জন্য হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ)-এর ওপরে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রইলো। একদিন তাঁকে সম্রাটের দরবারে আসার জন্য আহ্বান জানানো হলো। দরবারের প্রবেশ পথে কৌশল করে স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট তোরণ নির্মাণ করা হলো। এই পথে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তাকেই মাথা নিচু করে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, এই পথে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে সম্রাটের সামনে মাথানত করতেই হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ) সম্রাটের দরবারের প্রবেশ পথের সামনে এসে থেমে গেলেন। তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করলেন, কৌশলের মাধ্যমে তাঁর মাথা নত করানো হবে সম্রাটের সামনে। দরবারে উপবিষ্ট দুনিয়া পূজারী আলিম নামধারী লোকগুলো তাঁকে বললো, হুজুর, মাথা নিচু করে সম্রাটকে কুর্ণিশ জানালে এমন তো কোনো ক্ষতি হবে না, আপনি দয়া করে সম্রাটকে কুর্ণিশ করুন।

আল্লাহর দ্বীনের অকুতোভয় সিপাহ্সালার হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী সিংহের মতো গর্জন করে বললেন, তোমাদের মতো ঈমান বিক্রিকারী লোকগুলো এই বাদশাহের সামনে মাথানত করতে পারে, কিন্তু আমার মাথা প্রতিদিন সমস্ত সম্রাটের সম্রাট মহান আল্লাহর সামনে অনেক বার নত হয়। আমি আমার সেই মাথা এই বাদশাহের সামনে নত করতে পারি না।

কথা শেষ করেই তিনি তাঁর বাম পা বাদশার দরবারের প্রবেশ পথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথা বাইরে রেখে সেই তোরণ দিয়ে প্রবেশ করলেন। এই অপরাধে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হলো। গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁকে বন্দী রাখা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন পরে কারাকর্তৃপক্ষ সম্রাটের কাছে এভাবে রিপোর্ট করলো যে, কারাগার হলো অপরাধীদের বাসস্থান, কিন্তু আমার এখানে আপনি মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী নামক এমন একজন বন্দীকে প্রেরণ করেছেন যে, এই কারাগারে যত অপরাধী ছিল, তাঁর স্পর্শে সেই অপরাধী লোকগুলো আল্লাহর ওলীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

যারা ঈমানদার, আমলে সালেহ্কারী, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারী, তারা নিজেদের স্বার্থে অথবা শক্তিমান লোকদের রক্তচক্ষু দেখে আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন সাধন করেন না, কোরআন-হাদীসের বিপরীত কোনো প্রজ্ঞাপন বা অধ্যাদেশের অনুকূলে কথা বলেন না। বরং এর বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রয়োজনে শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহর ইবাদাতকারী লোকদের পবিত্র স্পর্শে অসৎ লোক সৎলোকে পরিণত হয়, অপরাধী অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'য়ালা শির্ক থেকে মুক্ত থেকে খালেসভাবে শুধু তাঁরই গোলাম হিসাবে জীবন গড়ার মতো পরিবেশ-পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল করে দিন।

হযরত আবু হোরাইরা ও তাঁর মা

কাফির সন্তান বা কোন অমুসলিম আত্মীয় যদি কোন মুসলমানের থাকে তাহলে তার সাথে অবশ্যই সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে, মাতা-পিতা কাফির হলে তাদের খেদমত করতে হবে।

এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। কিন্তু তারা যদি ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে থাকে, ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের সাথে কোন সুসম্পর্ক রাখা যাবে না। আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই, আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হিজরতের সময় পবিত্র মক্কা থেকে মদীনায় আসার সময় তাঁর মা'কেও সাথে করে এনেছিলেন।

তাঁর মায়ের নাম ছিল হযরত মাইমুনাহ অথবা উমাইমাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হা। কিন্তু তিনি তাঁর সন্তান আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুর সাথে যখন মদীনায় এসেছিলেন তখন পর্যন্ত তিনি ইসলাম কবুল করেননি। সন্তান আবু

হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন অল্পবয়স্ক বালক সে সময়ে তিনি বিধবা হন। তারপর তিনি আর বিয়ে করেননি। সন্তানকে নিয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন পার করতেন। এ কারণে হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মায়ের প্রতি ভীষণ অনুগত ছিলেন। সন্তান ইসলাম কবুল করেছিল, এ জন্য তাঁর মা মনের দিক দিয়ে চরম অসন্তুষ্ট ছিলেন। মা ইসলাম গ্রহণ করছেন না– শিরকের কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে, এ কারণে হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণায় ছিলেন। প্রায়ই তিনি তাঁর মা'কে ইসলাম সম্পর্কে বোঝাতেন।

তাঁর মা ইসলামের নাম শুনলেই ভীষণ রেগে উঠতেন। বিশেষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক তাঁর কানে যাওয়া মাত্র তিনি জ্বলে উঠতেন। এভাবে একদিন তিনি তাঁর মা'কে ইসলাম এবং আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে বোঝাচ্ছিলেন। তার মা কোন কথাই শুনতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এমন কি সেদিন তিনি আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে কটূক্তি করলেন এবং সন্তানকে প্রহার করলেন। মা মেরেছে–এ কারণে হযরত আবু হোরায়রার মনে সামান্য প্রতিক্রিয়া ছিল না। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে কটূক্তি তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মনে প্রচন্ড আঘাত পেলেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে পানির ধারা নেমে এলো।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে দরবারে রেসালাতের দিকে রওয়ানা দিলেন। আল্লাহর হাবীব দেখলেন তাঁর প্রিয় সাহাবী আবু হোরায়রা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে আসছে। কাছাকাছি এলে তিনি জানতে চাইলেন, আবু হোরায়রা! তুমি কাঁদছো কেন?

তিনি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমাকে মেরেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মা মেরেছে আর তুমি আমার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো? তোমার মা মেরেছে তা আমি কি করতে পারি?

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মা মেরেছে আমি সে কারণে কোন অভিযোগ করছি না। আমার মনে বড়ই যন্ত্রণা, আমার মা এখনও ইসলাম কবুল করলেন না। আপনি দোয়া করুন, আমার মা যেন ইসলাম কবুল করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাত দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আবু হোরায়রার মা'কে হেদায়েত করুন।

হযরত আবু হোরায়রা নিজের বাড়ির দিকে দ্রুত ছুটলেন । পথে লোকজন তাকে ধরলো, আপনি এমন করে ছুটে যাচ্ছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমাকে যেতে দাও, আমি দেখতে চাই। আমি বাড়িতে পৌঁছানোর আগে আমার নবীর দোয়া পৌঁছলো কি না।

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, বাড়ির দরজা বন্ধ। তিনি অনুভব করলেন তাঁর মা গোছল করছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মা বের হয়ে এসে সন্তানকে বললেন, হে আমার সন্তান! তুমি সাক্ষী থেকো, আমি আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের ওপর ঈমান আনলাম!

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, এবার তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বের হয়ে এলো। তিনি আবার ছুটে গেলেন দরবারে নববীতে। আনন্দে বিগলিত হয়ে জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন, আমার মা ঈমান এনেছেন। হযরত আবু হোরায়রার সাথে তাঁর মায়ের এক অপূর্ব সম্পর্ক ছিল। একদিন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। পেটে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে তিনি নবীর দরবারে এলেন। এ সময়ে সেখানে আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে কিভাবে এলে?

তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রচন্ড ক্ষুধা আমাকে এখানে টেনে এনেছে। আল্লাহর নবী একটি খেজুরের কাঁধি আনলেন এবং উপস্থিত সবার হাতে দুটো করে দিয়ে বললেন, এই খেজুর দুটো খাও এবং তারপর পানি পান করো। এই দুটো খেজুরই তোমাদের জন্য আজকে যথেষ্ট হবে। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একটি খেজুর খেলেন এবং অন্যটি রেখে দিলেন। ব্যাপারটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, আবু হোরায়রা! খেজুর রেখে দিলে কেন?

তিনি লাজনম্র কণ্ঠে জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মায়ের জন্য রেখেছি। আল্লাহর নবী বললেন, তুমি খেয়ে নাও, আমি তোমার মায়ের জন্য আরো দুটো খেজুর দিচ্ছি। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খেজুর খেয়ে নিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরো দুটো খেজুর দিলেন তাঁর মায়ের জন্য।

কেন ইয়াহুদী কি মানুষ নয়

বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী বাহক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন, যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিমকে কষ্ট দেয় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আমি আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলায় লড়াই করবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন। লোকজন একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল। ওটা তো ইহুদীর লাশ, আপনি ঐ লাশের সম্মানে দাঁড়ালেন? মানবতার নবী বললেন– কেন, ইহুদী কি মানুষ নয়!

একমাত্র ইসলামই অসাম্প্রদায়িক আদর্শ, যে আদর্শে মানুষকে মানুষ হিসেবেই সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন আদর্শ নেই, এমন কোন তথাকথিত ধর্ম নেই যেখানে সাম্প্রদায়িকতা নেই। ইসলাম ব্যতীত সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত কোন আদর্শ পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই।

বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর ওপরে নির্ভরশীল

পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিকের কোন ক্ষমতা নেই তারা নিজের শক্তি প্রয়োগে আল্লাহ সৃষ্ট বস্তুর সহযোগিতা ব্যতীত ভিন্ন কিছু সৃষ্টি করে প্রশংসা লাভের অধিকারী হতে পারে। তারা যা কিছুই করতে অগ্রসর হবেন, প্রতি মুহূর্তে–প্রতি পদক্ষেপে তাকে মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হতে হবেই। এ জন্য আল্লাহ ব্যতীত যেমন দাসত্ব লাভের অধিকারী আর কেউ নেই, তেমনি তাঁর প্রশংসা ব্যতীত আর কারো প্রশংসা করা যেতে পারে না। সূরা কাসাসে মহান আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ-وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

তিনিই এক আল্লাহ যিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের অধিকারী আর কেউ নন। তাঁরই জন্য প্রশংসা পৃথিবীতেও এবং আখিরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।

একশ্রেণীর লোক রয়েছে যারা নিজেদেরকে প্রকৃতি প্রেমিক বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যরাশি অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে তার গুণ

বর্ণনা করে থাকে। রাতের নির্জনতায় কৌমুদী স্নাত পুষ্প উদ্যানে সুধাকরের স্নিগ্ধ সৌরভে মন-প্রাণ আমোদিত হয়ে ওঠে, সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষ আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহর প্রশংসার পরিবর্তে চাঁদকেই সমস্ত সৌন্দর্যের আধার মনে করে তার গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে থাকে। প্রখর সূর্য কিরণে পথ-প্রান্তর যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, উদ্ভিদরাজি শ্যামলিমা হারিয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে, নির্জীব ভূমি ফসল উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যায়, প্রচন্ড দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে, তখন হঠাৎ করেই আকাশ থেকে এক পশলা বৃষ্টি যদি নেমে আসে তখন অজ্ঞ মানুষ আল্লাহর প্রশংসা না করে বৃষ্টির প্রশংসা করতে থাকে। মায়াবী চাঁদের আলো নিয়ে প্রশংসামূলক অসংখ্য পংক্তি মালা রচনা করে। মেঘমালা আর প্রশান্তিদায়ক বৃষ্টির প্রশংসায় কবিতা রচনা করে থাকে। কিন্তু এদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এই চাঁদের আলোর স্রষ্টা কে? এই বৃষ্টি কে বর্ষালেন? এরা তখন বলতে বাধ্য হয়, এসবের পেছনে একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টা আছেন। এ সমস্ত তথাকথিত প্রকৃতি প্রেমিকদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ-قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ-بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ-

আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না। (সূরা আল 'আনকাবুত–৬৩)

আল্লাহর সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্যরাশি ও সৃষ্টির নিপুণতা দেখে, তাঁর অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করে শুধু মুখে মুখে আল্লাহর প্রশংসামূলক বাণী উচ্চারিত করলেই হবে না, তাঁর সামনে দাসত্বের মস্তক অবনত করতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামাজ আদায় করা। সূরা রূমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ-وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ-

সুতরাং, আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং

যখন তোমাদের প্রভাত হয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং (তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই মহাবৈজ্ঞানিকের

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই বিশ্ব-জাহান ও এর সমস্ত জিনিসের মালিক, এ বিশ্ব প্রকৃতিতে সৌন্দর্য, পূর্ণতা, জ্ঞান, শক্তি, শিল্পকারিতা ও কারিগরির যে নিপুণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এসবের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহ-ই প্রশংসার অধিকারী। এ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীজগৎ যে কোন বস্তু থেকে উপকারিতা লাভ করছে, লাভবান হচ্ছে, আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করছে সে জন্য অন্যান্য প্রাণীসমূহ যেমন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, মানুষকেও আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর দাসত্ব করতে হবে। যাবতীয় সৌন্দর্যের পেছনে এক আল্লাহ ব্যতীত যখন অন্য কারো কোন ভূমিকা নেই, তখন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ–

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের মালিক এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য। (সূরা সাবা-১)

মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে কারো কোন অংশ নেই, সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে এ কথাটিই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্ত কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে একক কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। এ জন্য সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–

প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। (সূরা ফাতির-১)

একশ্রেণীর মানুষ বোঝে না, না বুঝে আল্লাহর সৃষ্টি কাজে অন্যের অংশ আছে বলে বিশ্বাস করে। তারা ধারণা করে, সৃষ্টি কাজে আল্লাহকে সহযোগিতা করার জন্য স্বয়ং আল্লাহই অনেককে নিয়োগ করেছেন। তারাও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। এ জন্য তাদেরও পূজা-অর্চনা করতে হবে। এভাবে অজ্ঞ মূর্খ

মানুষ কল্পিত শক্তির মূর্তি নির্মাণ করে তার সামনে মাথানত করে দেয়। মাটির নিষ্প্রাণ মূর্তির প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এদেরকে ভ্রান্তিমুক্ত করার জন্য সূরা সাফ্ফাতের ১৮০-১৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ-وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ-وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

তারা যেসব কথা তৈরী করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব্ব, তিনি মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের জন্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তোমরা নিজের হাতে যেসব মূর্তি নির্মাণ করো, তাদের যে-কোন ক্ষমতা নেই, তা তোমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারো। তাদের দেহে মাছি বসলে তারা সে মাছিকেও তাড়াতে অক্ষম তা তোমরা দেখছো। তোমরা যেসব জিনিসকে শক্তির উৎস বলে তার পূজা-অর্চনা করছো, তা ধ্বংসশীল, তারা কিভাবে ধ্বংস হয় সে দৃশ্য তোমরা নিজেদের চোখে দেখে থাকো। এসব দেখেও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো না? সুতরাং, দাসত্ব ও প্রশংসা করো ঐ আল্লাহর–যিনি অমর অক্ষয়। সূরা মু'মিনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ-الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমাদের দ্বীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

প্রশংসা করো একমাত্র আমার এবং দাসত্ব করো শুধু আমারই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়ম-পদ্ধতি আমার বিধানের অনুগত করে দাও। আমার একনিষ্ঠ গোলাম হয়ে যাও। আমার গোলামীর সাথে অন্য কারো গোলামীর মিশ্রণ ঘটিয়ো না। এ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছুই তোমরা দেখছো, এসবের মালিক আমি–আমিই এসবের রব্ব। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আমারই হাতে নিবদ্ধ। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি যমীন ও আসমানের মালিক এবং গোটা বিশ্বজাহানের সবার রব। (সূরা আল জাসিয়া-৩৬)

এ পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তু এমন রয়েছে, যাদেরকে জড়পদার্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এসব বস্তুর ভেতরে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। এসব প্রাণহীন বস্তুও মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আকাশের মেঘমালাও আল্লাহর প্রশংসা করে। ঈশান কোণে কালবৈশাখীর নিকষকালো মেঘ রুদ্র ভয়াল রূপ ধারণ করে ক্রমশঃ গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলে। ভয়ঙ্কর গর্জন করতে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ

মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। (সূরা আর-রা'দ-১৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত যে সুন্দর, তা তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনুভব করা যায়। যাঁর সৃষ্টি এত সুন্দর, তিনি কত সুন্দর হতে পারেন তা কল্পনাও করা যায় না। মনের গহীনে কল্পনার কুঞ্জবনেও মানুষ আল্লাহর রূপ ও সৌন্দর্য জ্ঞান সম্পর্কে ছায়াপাত ঘটাতে সক্ষম নয়। সমুদ্রের অতল তলদেশে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আকারের মাছের সমাহার রয়েছে সমুদ্রে। এসব মাছের দেহের সৌন্দর্য দেখলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়।

আল্লাহভীরু লোকদের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হয় 'আল হামদুলিল্লাহ'। সৌন্দর্যের পূজারীরা এসব মাছ ক্রয় করে এ্যাকুইরিয়ামে রেখে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত এসব মাছ শুধুই তাকিয়ে দেখে এক শ্রেণীর লোক। তাদের মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হয় না। কিন্তু সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে যে মাছগুলো মানুষের চোখের সামনে বিচিত্র ভঙ্গীতে পানির ভেতরে সাঁতার কেটে ফিরছে, তারা এক মুহূর্ত নীরব নেই। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তারা ঐ মহান আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করছে।

ঐ দূর নীলিমায় পাখিরা ডানা মেলে দিয়ে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে উড়ছে। মানুষ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে কিভাবে পাখিগুলো মহাশূন্যে উড়ছে। পাখিদের ওড়ার এই দৃশ্য দেখে অকৃতজ্ঞ মানুষ হতবাক হয়ে থাকলেও উড়ন্ত পাখিগুলো কিন্তু নীরব নেই। সূরা আন্ নূর-এর ৪১ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ-

তুমি কি দেখো না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাবিজ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানের সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। তিনি আপন কুদরতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি তাঁরই প্রশংসায় নিয়োজিত রয়েছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আল্লাহর তাসৃবীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাজ করছে। তিনিই সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী। (সূরা আস-সফ্-১)

আকাশমন্ডলে মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র, অগণিত তারকারাজি এবং গ্যালাক্সি (Galaxy) রয়েছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এসবের রহস্য সন্ধানে ব্যপৃত রয়েছেন। তারা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (Telescope) সাহায্যে তা অবলোকন করছেন। মহান আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর এসব সৃষ্টি তাঁরই প্রশংসা করছে। পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর এবং এসবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছু তাদের নিজস্ব ভাষায় মহান আল্লাহর তাসবীহ করে যাচ্ছে। মানুষকেও তাঁরই প্রশংসা করার জন্য এসব বিষয় কোরআনে তুলে ধরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ-

আল্লাহর তাস্‌বীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীতে রয়েছে। তিনি রাজাধিরাজ, অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী। (সূরা জুম'আ-১)

তিনি নিরঙ্কুশ শক্তির অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। কোন শক্তি তাঁর এই সীমাহীন কুদরতকে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত করতে পারে না। এই সমগ্র বিশ্বলোক তাঁরই এক রাজত্ব ও সাম্রাজ্য। তিনি এ পৃথিবীকে একবারই পরিচালিত

করে দিয়ে এর থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাননি। তিনিই এর ওপর নিরন্তর শাসনকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এই শাসন -প্রশাসন চালানোর ব্যাপারে অন্য কারো এক বিন্দু অংশীদারীত্ব নেই। অন্য কারো অস্থায়ীভাবেও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই বিশ্বলোকের কোন স্থানে সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা, মালিকানা ভোগ করা অথবা শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা যদিও কিছুটা থেকে থাকে, তা সে স্বয়ং অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, আল্লাহর পক্ষ থেকেই তা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন, ততদিন এই ক্ষমতা দিয়ে রাখবেন। আর যখনই তিনি ইচ্ছা করবেন, তখনই ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় করে দেবেন।

সুতরাং, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই এবং তিনিই তা লাভের যোগ্য। শুধু তিনিই প্রশংসা লাভের অধিকারী। অন্য কোন সত্তায় যদি প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ বা সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহলে তা তাঁরই অবদান। তিনি দান করেছেন বলেই তাতে সৌন্দর্য বিদ্যমান। অতএব কৃতজ্ঞতা লাভের প্রকৃত ও একমাত্র অধিকারী তিনিই। কারণ সর্বপ্রকার নিয়ামত তাঁরই সৃষ্ট, তাঁরই অবদান। সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রকৃত কল্যাণকারী তিনি ব্যতীত আর কেউ নয়।

অন্য কারো কোন উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেও তা এই হিসাবে করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে তার মাধ্যমে। কেননা, সে নিয়ামতের প্রকৃত স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এবং তিনি সুযোগ না দিলে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কোনক্রমেই উপকার করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং কোন মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হলেও আল্লাহরই প্রশংসা করতে হবে। কেননা তিনিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক। আল্লাহ সূরা তাগাবুন-এর ১ নং আয়াতে বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ –لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ–وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

আল্লাহর তাসবীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীর বুকে রয়েছে। বাদশাহী তাঁরই এবং তারীফ-প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনিই প্রতিটি জিনিসের ওপরে কর্তৃত্বের অধিকারী।

যাবতীয় সৃষ্টিতেই রয়েছে সুন্দরের ছোঁয়া

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে অসুন্দর দেখতে চান না। তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর ভেতরেই সৌন্দর্য বিদ্যমান। আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বলোকে কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র দেখা যায়। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছের দুটো ফলের বর্ণ, বাহ্যিক কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে তার ভেতরে নানা রংয়ের সমাহার। পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে অদ্ভূত ধরনের পার্থক্য বিরাজমান। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একই জনক-জননীর দুটো সন্তানও একই ধরনের হয় না। পৃথিবীতে শতকোটি মানুষ, একজনের সাথে আরেকজনের চেহারার কোন মিল নেই। [illegible] বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। সৃষ্টির এই বৈচিত্র ও বিরোধই স্পষ্ট করে আঙ্গুলি সংকেত করছে, এ সৃষ্টিজগতকে কোন মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানী বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন দৃষ্টান্তহীন স্রষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী।

সে অতুলনীয় নির্মাণ কৌশলী একই জিনিসের শুধুমাত্র একটি নমুনা জ্ঞানের জগতে ধারণ করে সৃষ্টি কাজ সম্পাদনে আদেশ দেননি। বরং তাঁর জ্ঞানের দর্পণে প্রতিটি জিনিসের জন্য একের পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন নমুনা, প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত রয়েছে। বিশেষ করে মানবিক স্বভাব, প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে যে কোন ব্যক্তি এ কথা অনুভব করতে সক্ষম যে, সৃষ্টির এই নিপুণতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞান-কুশলতার প্রকাশ্য নিদর্শন। যদি জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক প্রবৃত্তি ও কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁক-প্রবণতা এবং চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো, কোন প্রকার বৈষম্য-বিভিন্নতার কোন পার্থক্য রাখা না হতো, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের মতো একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন এ পৃথিবীতে একটি কর্তব্য পরায়ণ-দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করার সিদ্ধান্ত করেছেন, তখন মানুষের সৃষ্টিগত কাঠামোর মধ্যে সব ধরনের বিচিত্রতা ও

বিভিন্নতার অবকাশ রাখা ছিল সে সিদ্ধান্তের অনিবার্য দাবী। মানুষ যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ও পরিকল্পনাহীনতায় ফসল নয় বরং এক মহান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, তা মানুষের স্বভাবগত বিচিত্রতা ও বিভিন্নতাই প্রমাণ বহন করে। এখানে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেখানেই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দৃষ্টিগোচর হবে, সেখানেই অনিবার্যভাবে সে পরিকল্পনার পশ্চাতে এক বিজ্ঞানময় প্রতিষ্ঠিত সত্তার সক্রিয় সংযোগ লক্ষ্য করা যাবে। বিজ্ঞানী ব্যতীত যেমন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা করা যায় না, তেমনি পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টির পেছনে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বও অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্য ও নিপুণতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا-وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ-وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ-

তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি? পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের–সাদা, লাল ও নিকষকালো রেখা। আর এভাবে মানুষ, জীব–জানোয়ার ও গৃহপালিত জন্তুও বিভিন্ন বর্ণের রয়েছে। (সূরা ফাতির–২৭-২৮)

আকাশ একটি ছাদ বিশেষ

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে মানুষকে যেখানে প্রেরণ করবেন, সে পৃথিবীকে নানাভাবে সজ্জিত করেছেন। পৃথিবীর ছাদ হিসাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَاءَ بِنَاءً-وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ-

সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে গালিচা হিসাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশকে ছাদ হিসাবে নির্মাণ করেছেন, তারপর সে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে

তার সাহায্যে নানা ধরনের ফল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য রিয্‌কের ব্যবস্থা করেছেন। (সূরা বাকারা-২২)

পৃথিবীর স্থলভাগকে শুধু শুষ্ক মাটি আর বালির মরুভূমি বানিয়ে তিনি শ্রীহীন করেননি। সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমিতে পরিণত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-فَاَخْرَجْنَابِهٖ نَبَتَا كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَكِبًا-وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ-اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ-

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিত উৎপাদন করেছেন এবং তার দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও বৃক্ষ-তরু-লতার সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা থেকে ফলের থোকা বানিয়েছেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আঙ্গুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ফলসমূহ পরস্পর স্বদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই গাছগুলো যখন ফল ধারণ করে, তখন এদের ফল বের হওয়া ও তা পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো। (সূরা আল আন'আম-৯৯)

আকাশের কোলে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি

কোনটি আল্লাহ্ অপূর্ণ রাখেননি। গোটা পৃথিবীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। সমুদ্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন। সমুদ্র নিশ্চল থাকলে তা দেখতে অসুন্দর মনে হতো। এ জন্য আল্লাহ্ সমুদ্রের বুকে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা দৃষ্টি-নন্দন করেছেন। পানির ভেতরে মাছ সৃষ্টি করেছেন। আকাশে কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকলে তা দেখতে কুৎসিত দেখাতো। আল্লাহ্ তা'য়ালা সে আকাশ সুন্দর করে সাজিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে– وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ-

তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি। (সূরা মুল্ক-৫)

আল্লাহ বলেন, এই বিশ্বলোককে আমি অন্ধকারময় ও নিঃশব্দ নিষ্প্রভ করে সৃষ্টি করিনি। আকাশে তারকামালা ও নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে অত্যন্ত মনোহর; উজ্জ্বল উদ্ভাসিত ও সুসজ্জিত করে দিয়েছি। তোমরা রাতের অন্ধকারে তার উজ্জ্বল আলো ঝকমকে রূপ দেখে গভীরভাবে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ো। শুধু তাই নয়, আমি চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছি। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো-

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا-وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا-

তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশ স্তরে স্তরে নির্মাণ করেছেন ? আর সে আকাশে চন্দ্রকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা নূহ-১৫-১৬)

মহান আল্লাহর রুচিবোধ, তাঁর সৌন্দর্যবোধ; সৃষ্টির ভেতরে তাঁর শৈল্পিক জ্ঞানের প্রকাশ দেখলেই অনুমান করা যায় তিনি কত সুন্দর। প্রতিটি সৃষ্টির ভেতরেই তাঁর অকল্পনীয় উন্নত রুচির প্রকাশ ঘটেছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে তিনি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে সূরা ইয়াছিনে বলা হয়েছে-

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّاتُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّالَايَعْلَمُوْنَ-

মহান পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিলোকের যাবতীয় জোড়া সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও মিলন বিশ্বপ্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত বিধান এবং তা এক চিরন্তন-শ্বাশত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে। প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুর মধ্যে। সৃষ্ট জীব, জন্তু ও বস্তুনিচয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার তাৎপর্য হলো, সৃষ্টির মূল রহস্য দুটো

জিনিসের পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে মিলে মিশে একই মোহনায় অবস্থান করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যখনই এভাবে দুটো জিনিসের মিলন সংঘটিত হবে, তখনই সে মিলনের মধ্য থেকে তৃতীয় আরেকটি জিনিসের উদ্ভব হতে পারে। সৃষ্টিজগতের কোন একটি জিনিসও চিরন্তন এই নিয়ম ও পদ্ধতির বাইরে নয়। এর ব্যতিক্রম কোথাও দৃষ্টি গোচর হতে পারে না।

এই যে একই মোহনায় মিলন অবস্থান এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা শুধুমাত্র মানবজাতি, প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদরাজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোন একটি জিনিসও এ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমন কৌশলে রচিত ও সজ্জিত যে, এখানে সর্বত্রই পুরুষ জাতি এবং স্ত্রী জাতি।

এ দুটো প্রজাতি সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে বিদ্যমান। এ দুটো প্রজাতির ভেতরে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে আকর্ষিত করছে। এ আকর্ষণের কারণেই মানুষের ভেতরে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং বিয়ের মাধ্যমে মিলিত জীবন-যাপন করে। সমস্ত প্রাণীজগতেও এ আকর্ষণ কার্যকর রয়েছে।

মানুষ এবং প্রাণীসমূহ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কারণে একের কাছে আরেকজন যেতে পারে এবং মিলিত হতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদজগৎ তথা জড়জগতের অবস্থা ভিন্নরূপ। এসব সৃষ্টির সূচনাতে যে স্থানে অবস্থান করে, পরিসমাপ্তিতেও সেই একই স্থানে অবস্থান করে। এরা অবস্থানচ্যুত হতে পারে না। উদ্ভিদ জগতে ফুলের থেকে ফল সৃষ্টি হয়। আর এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পরাগায়নের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ফুলের প্রতিটি উর্বর পুংকেশরের মাথায় একটি করে পরাগধানী সৃষ্টি করেছেন। এই পরাগধানীর ভেতরেই পরাগরেণু উৎপাদিত করেন। নির্দিষ্ট একটি সময়ে পরাগধানী যেন ফেটে যায় এবং পরাগরেণু কীট-পতঙ্গ ও বাতাসের মাধ্যমে একই গাছের অন্য একটি ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের কোন একটি ফুলের গর্ভমুন্ডের সাথে যেন লেগে যায়, এ ব্যবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকেই বলা হয়েছে পরাগায়ন (Pollination)।

আল্লাহর রুচি ও সৌন্দর্যবোধ

এ বিষয়টি কিভাবে সংঘটিত হয়, তা অবলোকন করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়েও এই একটি মাত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই আল্লাহর রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শৈল্পিক নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ কত যে বিস্ময়কর; কত যে প্রশংসামূলক, তা দেখে যেমন হতবাক হতে হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেও শেষ করা যাবে না। ফুলসমূহের চলৎশক্তি নেই; তারা চলাফেরার মাধ্যমে একটি আরেকটির সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারে না।

এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাতাসের মাধ্যমে, পানির মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমর, মৌমাছি ও সুদর্শন দৃষ্টি-নন্দন প্রজাপতির মাধ্যমে ফুলের পুরুষ কেশরকে স্ত্রী কেশরের সাথে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব মহান আল্লাহ সর্বভূক প্রাণী আরশোলা–তেলাপোকাকে দেননি। কারণ তাঁর বান্দারা এই ফুলের সৌরভ গ্রহণ করে, ফুল দেখতে সুন্দর আর এ জন্য ফুলের ওপর বিচরণ করে সে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন দৃষ্টি নান্দনিক প্রজাপতির ওপরে এবং মৌমাছি আর ভ্রমরের ওপরে।

কি অপূর্বদর্শন এই ভ্রমর আর প্রজাপতি। এদেরকে দেখলে মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন সাধনা করে তার দেহে অপূর্ব সৌন্দর্যের পশরা অঙ্কন করেছে। শত সহস্র প্রজাপতি; একটি প্রজাতির সাথে আরেকটি প্রজাতির রংয়ের কোন মিল নেই। আল্লাহ সুন্দর এবং ফুলও সুন্দর, এই সুন্দর ফুলগুলোর ওপরে কুৎসিত দর্শন এবং নোংরা কোন প্রাণী বিচরণ করে পরাগায়ন ঘটালে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ ক্ষুন্ন হতো।

ফুলের সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহান আল্লাহ অপূর্ব সুন্দর প্রজাপতিকেই নির্বাচিত করেছেন, তারা গোটা বিশ্বব্যাপী পরাগায়ন ঘটাবে। মহান আল্লাহর রুচিবোধ যে কত সুন্দর, কত মার্জিত ও উন্নত রুচি, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহকে কেউ যদি চিনতে চায়, কেউ যদি তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে চায়, তাহলে তাকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব সৌন্দর্য আর সামঞ্জস্যতা দেখে মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হতে থাকবে–আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন–সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য-যিনি গোটা জাহানের রব্ব।

পৃথিবীর সমস্ত ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এমন কোন একটি ফলও পাওয়া যাবে না, যে ফলের ওপরে আবরণ নেই। সমস্ত ফলের ওপরে আবরণ রয়েছে। মনে হয় যেন মানুষ আল্লাহর সম্মানিত মেহমান, আর মেহমানের সামনে তিনি খাদ্যগুলো পরিবেশন করছেন অত্যন্ত যত্নের সাথে। আবরণহীন ফলের ওপরে নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ বসবে; তারা মলমূত্র ত্যাগ করবে, ফলগুলো রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং তা খেতে রুচি হবে না। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি ফলের ওপরেই আবরণ সৃষ্টি করেছেন। যেন ফলের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে এবং খেতেও রুচিতে না বাধে।

একটি বেদানার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বেদানার দানাগুলোর ওপরে বেশ কয়েকটি আবরণ রয়েছে। ওপরের আবরণটি সবচেয়ে ঘন আর মোটা। তারপরের আবরণগুলো পাতলা। এগুলো ছিন্ন করার পরেই রসে ভরা দানাগুলো বের হবে। নারিকেলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তার প্রথম আবরণটি খোসার আকারে বিদ্যমান এবং সেটা খুবই মোটা। এরপর রয়েছে একটি খোলা জাতিয় শক্ত আবরণ। এসব ছিন্ন করার পরই পাওয়া যাবে সুস্বাদু নারিকেল আর শরবত। ছোট্ট একটি ফল আঙ্গুর, তার ওপরেও আবরণ রয়েছে। চালের ওপরেও রয়েছে অনেকগুলো আবরণ। এসব সৃষ্টির সাথে কতটা উন্নত রুচি জড়িত, তা সৃষ্টির ধরণ দেখলেই অনুমান করা যেতে পারে।

সত্যের অনুসারী সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সম্পন্ন একজন মানুষ নিখিল বিশ্বের অনু-পরমাণু থেকে শুরু করে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে ঐ বিশাল আকাশ পর্যন্ত এবং বৃক্ষ-তরু-লতা, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ও বৈচিত্রপূর্ণ প্রাণীজগতের অপূর্ব গঠন প্রণালী তার দৃষ্টির সামনে দেখতে পায়, তখন তার মুখ থেকে নিজের অগোচরেই বেরিয়ে আসে−আল হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন−সমস্ত প্রশংসা একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই সূরা আল ইমরাণের ১৯০-১৯১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন−

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ-الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-رَبَّنَا مَا

خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সেসব বিচক্ষণ-জ্ঞানী লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উঠতে, বসতে ও শুতে-যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে-আমাদের রব্ব ! এসব কিছু তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা থেকে পবিত্র।(সূরা আল ইমরাণ-১৯০-১৯১)

মানুষ নিজেকেও সুন্দর করে সাজাতে জানতো না। কোরআন শরীফ বলছে, মহান আল্লাহ এই মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছেন, পাখির দেহে একটির পর আরেকটি পালক সজ্জিত করে পাখির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। পাখির পালকগুলো যেন সুন্দর ঝকঝকে থাকে, পালকে কোন ময়লা-আবর্জনা যেন স্থির থাকতে না পারে, এ জন্য আল্লাহ ঐ পালকের গোড়া থেকে ক্রীম জাতিয় এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত করার ব্যবস্থা করেছেন। পালকধারী প্রাণীগুলো তা নিজের মুখ দিয়ে পালকের গোড়া থেকে টেনে টেনে ঐ পিচ্ছিল পদার্থ সমস্ত পালকে ছড়িয়ে দেয়।

এ ব্যবস্থা যদি আল্লাহ না করতেন, তাহলে হাঁস, মুরগী, কবুতর এবং অন্যান্য যেসব পাখি মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, সেসব প্রাণী দেখতে শুষ্ক মৃতের মতো হতো। মানুষের খেতে তা রুচিতে বাধতো। এই সৌন্দর্য আর রুচিবোধের যিনি পরিচয় দিলেন তিনিই হলেন আল্লাহ এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

বস্ত্রহীন থাকলে মানুষকে ভীষণ কদাকার ও কুৎসিত দেখাবে। এ জন্য আল্লাহ পোষাক অবতীর্ণ করেছেন। এই পোষাকের মাধ্যমে মানুষ নিজের লজ্জাস্থান আবৃত রাখবে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

يَابَنِى اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا-

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করতে পারো। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। (সূরা আল আ'রাফ-২৬)

এই পোষাক অবিন্যস্তভাবে ব্যবহার করলে অরুচিকর দেখাবে। এ জন্য তা পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, মহান আল্লাহ সূরা মুদ্দাচ্ছিরের মাধ্যমে তাও

শিক্ষা দিয়েছেন। অজ্ঞতার কারণে তাদানীন্তন যুগে একশ্রেণীর লোকজন বস্ত্রহীন হয়ে কা'বাঘরকে তাওয়াফ করতো। বিষয়টি ছিল চরম অরুচিকর এবং অসামাজিক। এ কুপ্রথা বন্ধ করে পোষাকে সজ্জিত হয়ে ইবাদাতের হক আদায় করতে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন–

يَابَنِى اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ–

হে আদম সন্তান! প্রতিটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো। (সূরা আরাফ-৩১)

এভাবে মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালিনতা, কোন কিছু চাওয়ার পদ্ধতি, আহার করার শালীন পদ্ধতি, হাঁটা-উঠা-বসা এক কথায় মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক যেন সৌন্দর্যময় ও উন্নত রুচি গড়ে ওঠে, তা মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন। তিনি স্বয়ং সুন্দর এবং সবচেয়ে প্রশংসামূলক রুচির অধিকারী, মানুষকেও তিনি তাঁর কোরআনের মাধ্যমে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ শিখিয়েছেন। মানুষকে তিনি সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ–

মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত-তীন-৪)

মানুষকে এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যার সাথে অন্য কোন সৃষ্টির কোন তুলনা হয় না। আল্লাহ বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ–

তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের আকার -আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর করে নির্মাণ করেছেন। (সূরা আত তাগাবুন-৩)

শারীরিক কাঠামোয় যেখানে যা প্রয়োজন, সেখানে তাই সংযোজন করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অদ্ভূত সুন্দর আকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ–وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ–

আমি তাকে দুটো চোখ, একটি জিহ্বা এবং দুটো ওষ্ঠ দেইনি? (সূরা বালাদ-৮-৯)

মানুষের শারীরিক কাঠামো ও গঠন প্রণালী দেখে কারো এ কথা বলার মতো ধৃষ্টতা নেই যে, কান দুটো মাথার দু'পাশে না দিয়ে তা বগলের নিচে দিলে ভালো হতো।

চোখ দুটো কপালের নিচে টানা টানা করে না দিয়ে কপালের ওপরে গোল বৃত্তের মতো করে দিলে ভালো হতো। নাকটা ঠোঁটের ওপরে না দিয়ে নাভীর ওপরে দিলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতো। ফুলের পাঁপড়ীগুলো ভিন্ন ধরনের হলে আরো সুন্দর দেখাতো। চতুষ্পদ প্রাণীর লেজ পেছনের দিকে না দিয়ে তা পিঠের ওপরে থাকলে ভালো হতো। এ ধরনের অমূলক কথা বলার ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারবে না। আল্লাহর সৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য রয়েছে, এমন চিন্তাও করা যায় না। যেখানে যা প্রয়োজন, আল্লাহ তাই করেছেন।

কথিত আছে, আল্লাহর একজন ওলী পথ দিয়ে যেতে যেতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিশ্রামের জন্য একটি বট গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে বট গাছের ফল তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি চিন্তা করলেন, এত বড় একটি বিশাল গাছ, আর তার ফলগুলো কতই না ছোট্ট। মনে মনে তিনি আল্লাহকে বললেন, তোমার সৃষ্টিতে তো কোন অসামঞ্জস্য নেই–এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু বেল গাছ এই বট গাছের তুলনায় কত ছোট অথচ তার ফলগুলো বেশ বড়। আর বট গাছ কত বিশাল কিন্তু তার ফল খুবই ছোট। বিষয়টা আমার কাছে কেমন যেন..................!

আল্লাহর সেই ওলী মনে মনে আল্লাহকে যে কথাগুলো বলছিলেন, তা শেষ না হতেই বাতাসের এক ঝাপটা এসে বট গাছের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বাতাসের ঝাপটায় বট গাছের একটি ছোট্ট ফল গাছের নিচে শায়িত সেই ব্যক্তির নাকের ওপরে এসে পতিত হলো। সাথে সাথে আল্লাহর ওলী উঠে সিজদায় গিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমার কল্পনা অনুযায়ী এই বট গাছের ফল যদি গাছ অনুসারে বড় হতো, তাহলে আজ আমার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো এবং তোমার বান্দারা সূর্যের প্রখর তাপে নিঃশেষে জ্বলে পুড়ে গেলেও কেউ এই গাছের নিচে ছায়ার বিশ্রামের জন্য আসতো না।

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। তিনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও কোন অসামঞ্জস্যতা নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا-مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ
الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ-فَارْجِعِ الْبَصَرَ-هَلْ تَرٰى مِنْ

فُطُوْرٍ-ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ-

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমরা মহাদয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের অসঙ্গতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। (সূরা মূল্‌ক-৩-৪)

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো, তারা সৃষ্টির এই অপরূপ দর্শনে আত্মহারা হয়ে ওঠে। নারীর সৌন্দর্য অবলোকনে অস্থির চিত্তে তারা কবিতা রচনা করে। প্রজাপতির রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে তারা প্রশংসামূলক গীত রচনা করে। আকাশের নীল রঙ, সাগরের তরঙ্গমালা, বনানীতে বাতাসের হিন্দোল, দূরনিহারিকা কুঞ্জের পলায়নপর আলো, শশধরের মায়াবী কিরণ, দক্ষিণা মলয় সমিরণ, ফুলের মন-মাতানো সৌরভ আর পাখির কলকাকলীতে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে।

কিন্তু এসবের যিনি মূল স্রষ্টা, যিনি পাখির কণ্ঠে গান দিয়েছেন, অরণ্যের মাঝে যিনি সবুজাভা দান করেছেন, সাগর তরঙ্গে যিনি রজত শুভ্র কিরীট দান করেছেন, নক্ষত্রপুঞ্জে যিনি আলোর দ্যুতি সৃষ্টি করেছেন, চাঁদের মাঝে যিনি স্নিগ্ধ কিরণ দিয়েছেন, সমিরণ মাঝে যিনি প্রশান্তির স্পর্শ-আবেশ সৃষ্টি করেছেন, ফুলের পাঁপড়ীকে যিনি মাধুরী আর সুষমামন্ডিত করেছেন তাঁর প্রশংসা করতে ভুলে যায়। সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশংসায় কোন কার্পণ্য নেই, কিন্তু স্রষ্টার প্রশংসায় জিহ্বায় জড়তা নেমে আসে। সুতরাং, আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য দর্শন করে যারা তাঁর প্রশংসা করতে কার্পণ্য করে, তারা নিকৃষ্ট রুচি আর হীন মানসিকতারই পরিচয় দিয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের দেহ গঠন

মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, এই মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সূরা কিয়ামাহ্-এর ৩৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন-

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى-

মানুষ কি সেই সামান্যতম শূক্র ছিল না, যা সজোরে নির্গত হয়েছিল?

পক্ষান্তরে মানব দেহে এই শূক্র এলো কোত্থেকে? পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই

দেখি, এসবের মূল উপাদান হলো মাটি। মাটি থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। বিশাল আকাশের শূন্যগর্ভে যে উড়োজাহাজ চলাচল করে, তা যে উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছে, নির্মাণকালে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব বস্তুর মূল উপাদান মাটি থেকে উৎপাদিত হয়েছে। যেমন লৌহ, তামা, দস্তা, পিতল, স্বর্ণ, কয়লা ইত্যাদির খনি মৃত্তিকা অভ্যন্তরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমশ অস্তিত্ব লাভ করে। কাঠ সংগৃহিত হয় গাছ থেকে। গাছ উৎপন্ন হচ্ছে মাটি থেকে।

পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই দেখছি, তা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন জাতবস্তু আল্লাহর দেয়া জ্ঞান প্রয়োগে পরিবর্তন করে মানুষ নবতর আবিষ্কার করেছে। সুতরাং, মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য আহার করে। দেহ এবং দেহের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তা গঠিত হয় গ্রহণকৃত খাদ্যের সার নির্যাস থেকে। মানুষের দেহ থেকেই শূক্র নির্গত হয়, অতএব শূক্রের মূল উপাদান হলো মাটি। এ জন্যেই বলা হয় মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে।

মানুষের দেহ গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্ময়ের ধাক্কায় হতবাক হয়ে যেতে হয়। অসংখ্য কোষ (Cell) দিয়ে মানব দেহ গঠিত করেছেন আল্লাহ—যিনি হলেন রব। [illegible] কোষের মাধ্যমে গঠিত মানুষের দেহসৃষ্টি নৈপুন্যতায় এক অদ্ভুত জটিল সৃষ্টি। বিশাল একটি ইমারত যেমন একটির পর একটি ইট পাথর সাজিয়ে নির্মাণ করা হয়, তদ্রুপ মানুষের দেহে কোষের পর কোষ বিন্যাসের মাধ্যমে মানুষের দেহ কাঠামোটি গড়ে তুলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এই অসংখ্য কোষ সর্বপ্রথমে বিস্তৃতি লাভ করেছে একটি মাত্র কোষ থেকে। সূচনায় যা ছিল একটি পুরুষ প্রজনন কোষ যাকে বলা হয়েছে শুক্রাণু (Spermatozoon) এবং আরেকটি স্ত্রী প্রজনন কোষ যাকে বলা হয়েছে ডিম্বাণু (Ovum)।

এই দুটো কোষের মিলিত হওয়াকে বলা হয়েছে নিষেক (Fertilization)। এ দুটো কোষ মিলিত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয়েছে তাকে বলা হয়েছে জাইগোট (Zygote)। বিভাজনের মাধ্যমে এই জাইগোট মহান আল্লাহর নির্দেশে ক্রমশঃ মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। মাতৃগর্ভের যে স্থানটির নাম জরায়ূ (Uterus) সেখানে তা স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং এটাকেই বলা হয়ে থাকে ভ্রূণ (Embryo)। এই কাজটি যিনি করেন তিনিই হলেন রব। মহান আল্লাহ বলেন—

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ـ

হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তোমাদের জুটি নির্বাচিত করেছেন এবং এই উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আন নিছা-১)

মাতৃগর্ভে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এভাবে প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ অর্থাৎ দুই শত আশি দিন বা আরো কিছু কম সময়ের ব্যবধানে অপূর্ব সুন্দর মানব শিশু এই পৃথিবীতে আগমন করে। রব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ–

তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন নাহ্‌ল–৪)

এই আয়াতে 'নুৎফা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির অনেক ধরনের অর্থ হতে পারে যা যথাস্থানে প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণতঃ নুৎফা শব্দ দ্বারা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুকে বোঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহর নির্দেশে যে সমস্ত কোষ একটির পর আরেকটি সজ্জিত হয়ে মানব দেহ গঠিত হয়, তার ভেতরে নানা ধরনের জৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকে। এসব পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং তার একটিকে বলা হয়েছে সাইটোপ্লাজম ও অপরটিকে নিউক্লিয়াস।

এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থান করছে DNA (Deoxyribonucleic Acid) মূলতঃ এ জিনিসটিই হচ্ছে প্রাণীজগতের বংশগতির ধারক-বাহক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি প্রাণীর ডিএনএ-কে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন ফলে একটি প্রাণীর গর্ভ থেকে ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি প্রাণী জন্মগ্রহণ করে না। নারী দেহের একটি ডিম্বাণুর মধ্যে পুরুষ দেহের একটি শুক্রাণু প্রবেশ করে নিষেক ঘটাতে সক্ষম হলেই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। এরপর এই ভ্রূণ নানা স্তর অতিক্রম করতে থাকে। আর এগুলো যিনি সুনিপুন দক্ষতার সাথে সম্পাদিত করেন, তিনিই হলেন আমাদের রব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا–

তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূহ–১৪)

মানুষ মাতৃগর্ভে কিভাবে অবস্থান করে এবং কয়টি পর্যায় অতিক্রম করে এই পৃথিবীতে আসে, বিষয়টি আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ-ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-

তিনিই মাতৃগর্ভে তিন তিনটি অন্ধকারময় আবরণের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক সজ্জিত করেছেন। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের রব। প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের অধিকারী কেউ নেই। (সূরা যুমার-৬)

তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তর অতিক্রম করে এই মানুষকে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে। আধুনিক ভ্রূণ তত্ত্ববিদগণ মাতৃগর্ভে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভ্রূণ বিকাশের স্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, যে তিনটি স্তরের কথা কোরআন বলেছে, তার প্রতিটি স্তর তিনটি পর্দা দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। এসব পর্দা মানব শিশুকে দেহ সম্পর্কিত নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে। এই বিস্ময়কর ব্যবস্থা যিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করছেন, তিনিই হলেন রব।

বর্তমান মেডিকেল সাইন্স এই তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণকে বলেছে, জাইগোট, ব্লাষ্টোসিষ্ট ও ফিটাস (Zygote. Blastocyst. Foetus)। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসারে প্রতিটি মানুষের দেহে যে কোষ রয়েছে, তার ভেতরে তেইশ জোড়া বা ছয়চল্লিশটি ক্রোমোজোম (Chromosome) বিদ্যমান। মানব শিশুর সূচনায় দেহ কোষে তেইশটি ক্রোমোজোম সরবরাহ হয় পিতার শুক্রাণু থেকে এবং আরো তেইশটি ক্রোমোজোম সরবরাহ করে মায়ের ডিম্বাণু। এই ছয়চল্লিশটি ক্রোমোজোমের মধ্যে তেইশটিকে বলা হয় দেহ ক্রোমোজোম (Autosome)। দেহ ক্রোমোজোমের মধ্যে বাইশ জোড়া ক্রোমোজোমের আকার ও কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা এক ও অভিন্ন। এই এক ও অভিন্ন ক্রোমোজোম মানব শিশুর দেহ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

তারপর আরো যে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম (Sex chromosome), এগুলো মানব শিশুর যৌন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পুরুষ হবে না নারী হবে–তা নিয়ন্ত্রণ করে। এই তেইশটি ক্রোমোজোমকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর একটি হলো মেইল

ক্রোমোজোম (Male chromosome) ও অপরটি হলো ফিমেইল ক্রোমোজোম (Female chromosome)। বিজ্ঞানীগণ মেইল ক্রোমোজোমের পরিচিতি তুলে ধরেছেন ইংরেজী অক্ষরের ওয়াই (Y) অক্ষর দিয়ে এবং ফিমেইল ক্রোমোজোমের পরিচয় দিয়েছেন ইংরেজী অক্ষরের এক্স (X) অক্ষর দিয়ে। অর্থাৎ নারীর যৌন ক্রোমোজোমের সাংকেতিক চিহ্ন হলো দুটো এক্স (XX)। পক্ষান্তরে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের জোড়ায় একটি এক্স ও অন্যটি ওয়াই বিদ্যমান রয়েছে (XY)। এভাবে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের পরিচিতি দেয়া হয়েছে একটি এক্স ও একটি ওয়াই দিয়ে। এই যৌন ক্রোমোজোমের কারণেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেহগত বাহ্যিক আকৃতি–বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের অভ্যন্তরীস্থ পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। এই অকল্পনীয় জটিল বিষয়টি যিনি সুনিপুনভাবে সম্পাদন করেছেন, তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا-وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلاَ تَضَعُ اِلاَّ بِعِلْمِهٖ-

আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রকীট থেকে। এরপর তোমাদেরকে জোড়ায় পরিণত করা হয়েছে। কোন নারী গর্ভবতী হয়না, না সন্তান প্রসব করে–এসব কিছু রয়েছে আল্লাহর জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে। (সূরা ফাতির–১১)

এভাবে জোড়া সৃষ্টি বা ক্রোমোজম সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত রহস্যময়। কিভাবে এটা সংঘটিত হয়, তা বিজ্ঞানীদের কাছে এক চরম বিস্ময়কর বিষয়। সমস্ত সৃষ্টি জগতসমূহের রব মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ-ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ-ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا-ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ-فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ-

আমি মানুষকে মাটির সার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে একটি সুসংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি। এরপর সেই ফোঁটাকে

জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করেছি। তারপর সেই রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি। এরপর মাংসপিন্ডে অস্থি-পঞ্জর স্থাপন করেছি। তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোস্ত দিয়ে। তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি হিসাবে। সুতরাং আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন, সমস্ত শিল্পীর চেয়ে সর্বোত্তম শিল্পী তিনি। (সূরা আল মু'মিনূন-১২-১৪)

উল্লেখিত আয়াতে 'সুলালাতিম মিন ত্বিন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মাটির সার-নির্যাস। মাটি যেসব উপাদানে গঠিত তাহলো, ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ অক্সিজেন, ২৭ শতাংশ সিলিকন, ৮ দশমিক ১ শতাংশ এ্যালুমিনিয়াম, ৫ শতাংশ লোহা, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সোডিয়াম, ২ দশমিক ৬ শতাংশ পটাশিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম। তারপর হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য উপাদান ১ দশমিক ৬ শতাংশ রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদরাজি তার মূলের সাহায্যে মাটির এসব উপাদান শোষণ করে। তারপর উদ্ভিদ থেকে যেসব খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে তা মানুষ খাদ্য হিসাবে আহার করে।

পাকস্থলিতে এগুলো ডাইজেষ্ট হয়। গ্রহণকৃত খাদ্যের সার-নির্যাস থেকে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রাশয়ে স্পার্ম্যাটাজোন (Spermatozoon) এবং নারীর ডিম্বাশয়ে (Ovary) ওভাম (Ovum) উৎপন্ন হয়। ওভাম-এর নিষেক থেকে সৃষ্টি হয় জাইগোট। এই জাইগোট নারীর জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয়ে ভ্রূণ গঠন করে। জগতসমুহের রব্ব মহান আল্লাহ এই ভ্রূণ থেকেই পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি করেন।

জাইগোট গঠনের মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেটা নারীর বাচ্চা থলির দেয়ালে একটি ঘেরা প্রকোষ্ঠে স্থান লাভ করে। এরপর তা জ্যামিতিক হারে বিভাজন হতে থাকে এবং সময়ের ব্যবধানে তা জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত হয় এবং বিজ্ঞানীগণ এটাকেই ব্লাষ্টোসিষ্ট নামে অভিহিত করেছেন। এই ব্লাষ্টোসিষ্ট অনেকটা পানির জোঁকের মতো দেখায়। তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জোঁক রক্তপান করলে যেমন আকৃতি ধারণ করে, এটিও তেমন আকার ধারণ করে।

এই ব্লাষ্টেসিষ্ট মায়ের রক্ত দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং মাতৃগর্ভের বাচ্চাথলির দেয়ালে ঝুলতে থাকে। ব্লাষ্টোসিষ্টের বাইরের যে স্তরটি তাকে বলা হয়

ট্রফোব্লাষ্ট–এই ট্রফোব্লাষ্ট থেকে এক ধরনের এনজাইম নির্গত হতে থাকে। এনজাইমের প্রভাবে বাচ্চাথলির টিসুগুলো গলে যায় এবং গলিত টিসুর ভেতরে ব্লাষ্টেসিষ্ট ডুবে যায়। এ সময় ব্লাষ্টোসিষ্ট পরিণত মাংসপিন্ডে যাকে সুমিটেস বলা হয়। এ প্রক্রিয়া প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই সুমিটেসের শিরদাঁড়ায় তেরটি উঁচু নিচু দাগের সৃষ্টি হয়।

অর্থাৎ এটাই পরবর্তীতে মেরুদন্ডে পরিণত হয়। ছয় সপ্তাহের শেষ সময়ে এটা একটি মানব কঙ্কালের আকার ধারণ করে। বার সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ কঙ্কাল গঠিত হয় এবং এ কঙ্কালে সর্বমোট তিন শত ষাটটি জোড়া থাকে। মানুষের কঙ্কাল সর্বমোট দুই শত ছয়টি হাড় দিয়ে গঠিত। আট সপ্তাহের শেষের দিকে তা একটি পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকার ধারণ করে এবং ভ্রূণ তখন নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়া যিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করেন, তাঁরই নাম হলো রব্ব এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বোত্তম রব্ব। ভ্রূণকে রেখেছিলেন এমন একস্থানে যেখানে কোন ধরনের রোগ শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে না। এই স্থানটিকেই কোরআনে বলা হয়েছে, 'কারারিম মাকিন'–সুসংরক্ষিত স্থান। সেখান থেকে শিশুকে যখন পৃথিবীতে নিয়ে আসা হলো, তখন তার অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ –

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দিয়েছি। তাকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে আস্‌সাজদার মধ্যে বলেছেন, মানুষের সৃষ্টির সূচনা তিনি করেছেন কাদা-মাটি থেকে। তারপর তার বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই। এরপর তিনি দেহের যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের প্রয়োজন তা সজ্জিত করে রুহ্ দান করেছেন। তারপর তিনি মানুষকে জ্ঞান, চোখ এবং হৃদয় দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তার

শরীরের ত্বকের ভেতরে স্পর্শ অনুভূতি এবং নাক দিয়েছি ঘ্রাণ গ্রহণ করার জন্য। এভাবে তাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি। তার যা যেখানে প্রয়োজন আমি তাই দিয়েছি। তার মাতা-পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভেতরে তার জন্য অসীম মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছি। সে পৃথিবীতে চোখ খুলেই দেখতে পায়, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাকে প্রতিপালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সমস্ত কিছুই তার সেবায় নিয়োজিত করেছি। মানুষের জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন আমি তাই দিয়েছি। মানুষের ভেতরে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন যোগ্যতা কারো ভেতরে বেশী দিয়েছি। আবার তা কারো ভেতরে কম দিয়েছি। এমন না করলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী হত না। একজন মানুষ আরেকজনের পরোয়া করতো না এবং মানুষের যোগ্যতার কোন মূল্যায়ন হত না।

যে জিনিষের প্রয়োজন যতবেশী মহান আল্লাহ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীর জন্য কর্মীর প্রয়োজন অধিক এবং মহান আল্লাহ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞানী, সেনাপতি, তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন কম, আল্লাহ তা কম পরিমাণেই সৃষ্টি করেছেন। এ জাতির মানুষের সংখ্যা আল্লাহ ঘরে ঘরে সৃষ্টি করেননি। কারণ, এসব মানুষের অবদান এই পৃথিবীতে শতাব্দীর পরে শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে।

এ জন্য এসব দুর্লভ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর জন্য যে কয়জন প্রয়োজন মহান আল্লাহ তাই সৃষ্টি করেছেন। তাদের একজনের যে অবদান, শতকোটি মানুষ ঐ একজন মানুষের চিন্তাধারা দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। এভাবে নানা ধরনের বিদ্যায় পারদর্শী মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রকৌশলী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, স্থপতি, শাসক, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ, নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক তথা যে ধরনের গুণাবলীসম্পন্ন ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, আল্লাহ তা মানব জাতিকে দান করেছেন। যে আল্লাহ এসব করলেন, তিনিই হলেন রব্ব এবং এই রব্ব-এর সমস্ত প্রশংসা।

সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে এ পৃথিবীতে আগমন করবে, সন্তানের যারা অভিভাবক তাদেরকে পূর্ব থেকেই সন্তানের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়নি। যিনি ঐ সন্তানকে প্রেরণ করছেন, তিনিই সন্তানের মায়ের বুকের ওপরে এমন এক খাদ্য প্রস্তুত করে

রেখেছেন, যার বিকল্প গোটা পৃথিবীতে নেই। মায়ের বুকের দুধের মধ্যে পানির ভাগ বেশী এবং সামান্য মিষ্টি থাকে যেন শিশু আগ্রহ সহকারে পান করে। আল্লাহ তা'য়ালা এই দুধে পানির ভাগ বেশী না দিলে সদ্যজাত শিশু তা হজম করতে সক্ষম হতো না। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে পানি পান করালে তার নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। এ জন্য মহান রব্ব আল্লাহ তা'য়ালা ঐ দুধের মধ্যেই পানি দিয়েছেন যেন শিশুকে পৃথকভাবে পানি পান করাতে না হয়।

মাতৃদুগ্ধ শিশুর সর্বোত্তম ওষুধ

মাতৃদুগ্ধ শুধুই দুধ নয়, এই দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম ওষুধ। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে মাতৃদুগ্ধ যেসব সন্তান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পান করার সুযোগ পেয়েছে, তারা রোগে খুব কমই আক্রান্ত হয় এবং এরা মেধাবী হয়। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, মায়ের দুধও ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে প্রথমে মায়ের বুকে যে দুধ থাকে, অজ্ঞতার কারণে তা অনেকে ফেলে দেয়। অথচ ঐ দুধই হলো সন্তানের সমস্ত রোগের প্রতিষেধক।

শিশু বড় হচ্ছে মায়ের দুধও ঘন হচ্ছে, এর কারণ হলো—প্রথমে দুধ ঘন হলে শিশু তা চুষে বের করতে পারবে না এবং সে ঘন দুধ তার অপরিপক্ক পাকস্থলীতে হজম হবে না। পাকস্থলী ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকে, সেই সাথে মায়ের দুধও ঘন হতে থাকে। এভাবে শিশু যখন বাইরের খাদ্য আহার করতে সক্ষম হয়, তখন মায়ের দুধ ক্রমশঃ ঘন হতে হতে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। মায়ের স্তনে একটি ছিদ্র নেই, একটি ছিদ্র থাকলে তা দিয়ে বেগে দুধ নির্গত হয়ে সন্তানের কণ্ঠনালীতে অসুবিধার সৃষ্টি করতো। এ জন্য মায়ের স্তনে আল্লাহ তা'য়ালা বত্রিশটি ছিদ্র দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষা করে দুধ নির্গত হয় এবং শিশু তা পরম প্রশান্তিতে পান করতে সক্ষম হয়।

শিশু যখন বাইরের খাদ্য গ্রহণ করার উপযুক্ত হলো, তখন শক্ত খাদ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য মাড়িতে দাঁতের প্রয়োজন। এই দাঁতের জন্য আল্লাহর কাছে কারো আবেদন করতে হয়নি। তিনি এমন রব্ব যে, তা না চাইতেই তিনি দিয়েছেন। মানুষের মাথার মগজ—যাকে ব্রেন বলা হয়ে থাকে। এই মগজ এমনভাবে মাথার খুলির ভেতরে রাখা হয়েছে, যেন তা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মগজের চারদিকে বেশ কয়েকটি আবরণ বা পর্দা নির্মাণ করা হয়েছে, এগুলো কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে বানানো হয়নি। এগুলো করা হয়েছে নরম এবং সিক্ত।

ক্রীম যেভাবে পানির ভেতরে ভাসতে থাকে, মাথার মগজকে সেভাবে সিক্তাবস্থায় রাখা হয়েছে, যেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে। মানুষের মাথায় অসংখ্য সেল নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো কম্পিউটার। এই কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা দেখলে হতবাক হতে হয়। তারপরেও কম্পিউটারের মেমোরির একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু মানুষের এই মাথা অনেকগুণ বেশী বিস্ময়কর। মানুষের মাথায় আল্লাহ যে মেমোরি দিয়েছেন, গোটা পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য এই মেমোরিতে রাখার পরও আরো বিশাল জায়গা অবশিষ্ট রয়ে যাবে।

মানুষের চোখে কর্ম ক্ষমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন। মানুষ রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি সাপ দেখে, তাহলে এই চোখ অত্যন্ত দ্রুত বিপদ সংকেত প্রেরণ করে ব্রেনকে। এই ব্রেন তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় করেছে পা ও হাতকে। সংকেত দিয়েছে হাতে যদি কোন অস্ত্র থাকে তাহলে তা দিয়ে সাপকে আঘাত করতে হবে আর না থাকলে পায়ের শক্তিতে দৌড় দিতে হবে। বিষয়টি যতটা সহজ মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিষয়টি এত অল্প সময়ের ভেতরে বাস্তবায়িত হয় যে, এতে কতটুকু সময় ব্যয় হলো তা মানুষের পক্ষে হিসাব করে বের করা অসম্ভব। চোখ সাপ দেখলো এবং সে মাথায় সংবাদ প্রেরণ করলো, মাথা পা ও হাতকে সক্রিয় করলো। এই পুরো বিষয়টি সংঘটিত হতে, এক সেকেন্ডেরও সময়ের প্রয়োজন হয়নি, এক সেকেন্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সময় প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি সম্ভব করা কেবল মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষেই সম্ভব আর এ জন্যেই তাঁর যাবতীয় প্রশংসা।

আবার মানুষ তার চোখে যা দেখে তা নেগেটিভ ভঙ্গীতে দেখে থাকে। নেতিবাচক দৃশ্য ধরে চোখ তা ব্রেনে পৌছে দেয় এবং সেখান থেকে তা পজিটিভ হয়ে বের হয়ে আসে এবং মানুষ তখন স্পষ্ট দেখতে পায়। আল্লাহ হলেন রব এবং এসব ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। মানুষ তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে অসংখ্য শব্দ শুনে থাকে। কিন্তু অনেকগুলো শব্দ একই সাথে কানে প্রবেশ করে অস্বাভাবিক কোন শব্দের সৃষ্টি করে না; কোন একটি শব্দও জড়িয়ে যায় না। মানুষের জিহ্বার গঠন প্রণালী এমন যে, জিহ্বা অসংখ্য স্বাদ গ্রহণ করতে ও পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম। এ জন্য সেই রব-এরই প্রশংসা করতে হবে, যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে মানুষকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

উদ্ভিদ মাটি দীর্ণ করেই বেরিয়ে আসে

মানুষের মালিক মানুষ স্বয়ং নয়, তার মালিক হলেন আল্লাহ। এ জন্য তার অধিকার নেই যে, সে তার মালিককে অস্বীকার করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করে। তাঁর যে মালিক ও স্রষ্টা, তাঁরই দাসত্ব এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কিতাব ঘোষণা করছে- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ বলো, আমি আশ্রয় চাই রাব্বুল ফালাকের কাছে। (সূরা ফালাক-১)

সূরা ফালাক আল্লাহর কিতাবের ত্রিশ পারার ছোট্ট একটি সূরা। এ সূরাটি অধিকাংশ মুসলমানের মুখস্থ রয়েছে। নামাজে এটি বার বার পাঠ করা হয়। এ সূরার প্রথম আয়াতে ফালাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সাথে রব শব্দ সহযোগে উচ্চারিত হয়েছে, 'রাব্বুল ফালাক'। রাব্বুল ফালাক কাকে বলা হয়-বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। আরবী ফালাক শব্দের ক্রিয়ামূল হলো 'ফুল্‌কু'। এর অর্থ হলো 'যে চিরে ফেলে।' আর ফালাক শব্দের অর্থ হলো, কোন কিছু দীর্ণ করা বা চিরে ফেলা। সূরা আল আন্‌আ'মের ৯৬ আয়াতে 'ফলিকুল ইস্‌বাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনিই রাতের আবরণ দীর্ণ করে রঙিন প্রভাতের উন্মেষ ঘটান।' আর সূরা ফালাকের প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'রাব্বুল ফালাক' শব্দের সরল অর্থ হলো, 'প্রভাত কালের রব'।

পৃথিবীতে এক একটি দেশে প্রভাত কিভাবে হয়? রাতের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে পূর্ব গগনে তরুণ তপন উদিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাত হওয়া বলে। অর্থাৎ অন্ধকারের বুকচিরে নবারুণের আগমন ঘটে। আর এই প্রক্রিয়াকে আরবী ভাষায় বলা যেতে পারে, ফালাকুস্ সুবাহ্ অর্থাৎ প্রভাত সূর্যের উদয়। এই ফালাক শব্দের আরেকটি অর্থ করা হয়েছে 'সৃষ্টিকার্য সমাধা করা।' এই অর্থ এ জন্য করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত কিছুই সৃষ্টি হয়, তা কোন না কোন জিনিস বা আবরণ ভেদ করে, দীর্ণ করেই সৃষ্টি হয়। তিমিরাবৃত রজনীর বুকচিরেই দূর নিহারিকা কুের মিটিমিটি আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌছায়। উত্তাল সাগরের বুক চিরেই জলযানসমূহ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। খেজুর গাছে সুমিষ্ট রসের ভান্ডার মওজুদ থাকলেও তা নির্গত হয় না। খেজুর গাছকে যখন দীর্ণ করা হয়, তখনই রস বেরিয়ে আসে। রাবার গাছসমূহ দীর্ণ করা না হলে রাবার পাওয়া যায় না। ডাবের পানি পান করতে হলেও তা দীর্ণ করতে হবে। পৃথিবীর উদ্ভিদ বীজসমূহ মাটির

বুকচিরেই তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। উদ্ভিদ মাটি দীর্ণ করেই পৃথিবীর আলো বাতাসে বেরিয়ে আসে। ডিমের মাধ্যমে বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য পৃথিবীতে যেসব প্রাণী ডিম দেয়, সেই ডিম দীর্ণ করেই শাবক পৃথিবীতে বেরিয়ে আসে। কুমিরের মতো বিশাল প্রাণীর বাচ্চাও ডিম চিরেই ভূমিষ্ঠ হয়। নদী-সাগর-মহাসাগরে যেসব প্রকান্ড মাছ বাস করে, সেসব মাছের বাচ্চাও ডিম থেকেই বেরিয়ে এসেছে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী মাতৃগর্ভ থেকে কোন বাধা বা আবরণ দীর্ণ করেই এই পৃথিবীতে আগমন করছে।

বৃক্ষের বহিরাবরণ দীর্ণ করেই শাখায় শাখায় জাগে কিশলয়। ফুলের কুঁড়ি দীর্ণ করেই ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে পাঁপড়ী মেলে দেয়। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই কোন না কোন বাধা অপসারিত করে, কোন কিছুর বুক চিরে বা কোন আবরণ দীর্ণ করেই সৃষ্টি হয়, আর এই প্রক্রিয়ায় যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন রাব্বুল ফালাক। তিনিই মানুষের মালিক, খালিক, সম্রাট, শাসক, আইনদাতা ও জীবন বিধানদাতা। একমাত্র তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনিই দাসত্ব লাভের অধিকারী। কোরআনের গবেষকগণ এই ফালাক শব্দের বিস্তারিত তাফসীর করেছেন।

জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহ

পৃথিবীর গোটা পরিবেশের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মহান আল্লাহর প্রতি সেজ্দায় মাথানত হয়ে আসে। লক্ষ্য করে দেখুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোটা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু গোটা সৃষ্টিজগতকে মানুষ বা কোন জীবের জন্য বসবাসের উপযোগী করেননি। সৃষ্টি জগতের সকল স্থানেই জীবের বসবাসের জন্য তিনি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেননি। এর পেছনেও মহান আল্লাহ মানুষের জন্য অবশ্যই কল্যাণ রেখেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের কোন গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও তার বিকাশ এবং বসবাসের জন্য বিশেষ ধরনের অনুকূল পরিবেশ একান্তই অপরিহার্য।

যে গ্রহ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হবে সে গ্রহটিতে কতকগুলো মৌলিক পদার্থ যথা কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি থাকবে। এসব পদার্থের পরমাণুগুলো বিশেষ নিয়মে মিলে মিশে নানা ধরনের অণু গঠন করে। এসব অণু প্রাণী দেহের কোষ (Tissue), হাড় (Bone), ইত্যাদি গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

যে গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে, তাতে পরিমিত পরিমাণে পানি থাকতে হবে। কারণ পানি জীবের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দেয়ার উপরই জীবদেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু নির্গত হতে সহায়তা করবে। জীবের বসবাসের উপযোগী গ্রহে বায়ু মন্ডল থাকবে। গোটা গ্রহটিকে বায়ুমন্ডল আবৃত করে রাখবে। যেখানে থাকবে পরিমিত পরিমাণে অক্সিজেন এবং জীবন ধারনের উপযোগী অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্যাসীয় স্তর। কারণ অক্সিজেন জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য। বায়ুমন্ডল প্রাণী জগতের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের যথা বৃষ্টির ব্যবস্থা করবে।

জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হতে হবে। তাপমাত্রা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে বা কম হলে সে গ্রহটি প্রাণী জগতের বসবাসের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। জীব বসবাসের গ্রহটির বায়ুমন্ডল স্বাভাবিকভাবে উপযুক্ত হতে হবে। যেন সেই বায়ু স্তর ভেদ করে সূর্যের কোন ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) বা ভিন্ন কোন গ্রহ থেকে কোন ক্ষতিকর রশ্মি আগমন করতে সক্ষম না হয়।

বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবী ব্যতিত সৌরমন্ডলের যতগুলো গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেসব গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান নেই। কোন কোন গ্রহে গ্যাসীয় আবরণ বা বায়ুমন্ডলের অস্তিত্ব নেই। আবার যেগুলোতে রয়েছে তা কোন প্রাণীর জন্য উপযুক্ত নয়। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে গবেষকগণ গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সৌরমন্ডল ছাড়াও অন্য সৌরমন্ডলেও প্রয়োজনীয় পরিবেশে জীব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁরা নিয়মিত গবেষণা করে যাচ্ছেন।

পৃথিবীর বায়ু মন্ডল

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য এই পৃথিবীকে উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী হলো প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য একটি অনুপম গ্রহ। প্রাণের উৎপত্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ, উপযুক্ত বায়ুমন্ডল এবং বায়ুমন্ডলে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও অক্সিজেন, ভূ-পৃষ্ঠে অফুরন্ত পানি এবং সে পানির উষ্ণতা জীবের জন্য স্বাভাবিক করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীর শূণ্যমার্গে বায়ুমন্ডলের ওপর দিয়ে এমন একটি স্তর সৃষ্টি

করেছেন, যাকে ওজোন (Ozone) বলা হয়। এই স্তর সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) থেকে প্রাণী জগতকে রক্ষা করে। পৃথিবী সূর্য থেকে যথাযথ দুরত্বের কক্ষপথে অবস্থান করার কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা প্রাণীকুলের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সঠিক পরিমাণের পদার্থ অর্থাৎ ভর (Mass) সৃষ্টি করেছেন।

ফলে সঠিক মাধ্যাকর্ষণ বলবিশিষ্ট হয়েছে এবং এ কারণে বায়ুমন্ডল যথাযথভাবে আকর্ষিত করে ভূপৃষ্ঠের সাথে চেপে রেখেছে যেন প্রাণীকুলের জন্য বায়ুমন্ডল ক্রিয়া করতে পারে। যদি ভর নির্দিষ্ট পরিমাণের কম থাকতো তাহলে বায়ুমন্ডলের প্রয়োজনীয় গ্যাস ও পানির বাষ্প ক্রমশঃ মহাকাশে হারিয়ে যেত এবং পৃথিবীতে কোন বায়ুমন্ডল থাকতো না। ফলে পৃথিবীতে অক্সিজেন থাকতো না, পানির কোন অস্তিত্ব থাকতো না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ–

বলো দেখি সবে, শুকাইয়া যদি যায় এই যমীনের পানি, তাহলে হেথায় তটনীর ধারা কে দিবে সবারে আনি। (সূরা মুল্‌ক-৩০)

যারা নভোমন্ডল ভ্রমণ করেছেন, তারা পৃথিবীর ছাবি ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। ছবিতে দেখা গিয়েছে সবুজ রং বেশী এসেছে। পৃথিবীর পানিপূর্ণ এলাকাগুলোই ছবিতে সবুজ আকারে উদ্ভাসিত হয়েছে। পানির বেশী প্রয়োজন, এ জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে পানি বেশী দিয়েছেন। আল্লাহ্ ছুবহানাহু তা'য়ালা এই পৃথিবীকে সমস্ত জীবের জন্য বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا–

তিনি যমিনকে স্থিতি ও বসবাসের উপযোগী স্থান হিসেবে নির্মাণ করেছেন। এ পৃথিবীর ওপরে নদ-নদী প্রবহমান করেছেন এবং যমীনের ওপরে পাহাড়-পর্বতকে স্তম্ভ হিসেবে গেড়ে দিয়েছেন এবং প্রবহমান নদী-সাগরের দুটো ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (নম্‌ল–৬১)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগিই করেননি, এই পৃথিবী থেকে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী যেন তাদের চাহিদানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা

গ্রহণ করতে পারে, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًاوَّ سَلَكَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-فَاَخْرَجْنَابِهٖ اَزْوَاجًامِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰی-كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ-

যিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ করেছেন এবং এতে তোমাদের জন্য চলার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তোমরা আহার করো এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারকেও বিচরণ করাও। (সূরা ত্ব-হা-৫৩)

মাটির মৌলিক উপাদান

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছেন, দূর-দূরান্তে মানুষ যেন গমন করতে পারে, সে জন্য নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই পৃথিবীর ভূ-ভাগকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নানা ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠন করেছেন। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ হলো অক্সিজেন, ২৭ শতাংশ সিলিকন, ৮ দশমিক ১ শতাংশ এ্যালুমিনিয়াম, ৫ শতাংশ লোহা, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্যালসিয়াম, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সোডিয়াম, ২ দশমিক ৬ শতাংশ পটাসিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম এবং অন্যান্য উপাদান ১ দশমিক ৬ শতাংশ। এখানে মানুষ যেন তার প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হয় সে ব্যবস্থাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন।

আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তিনি অনুর্বর যমীনকে উর্বর করেছেন, যেন মানুষ ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়। যমীনে নানা ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করেছেন যেন নিরামিষাশী প্রাণীকুল এসব আহার করে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে। মানুষকে বলা হয়েছে এসব আহার করো আর আমারই দাসত্ব করো। আমিই তোমাদের রব্ব এবং শুধু আমারই প্রশংসা করো। আমার আইন ব্যতিত অন্য কারো আইন-বিধান অনুসরণ করো না। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, কিভাবে আমি এই পৃথিবীর যমীনকে তোমাদের জন্য কল্যাণকর করে দিয়েছি। আল্লাহ বলেন–

وَالْاَرْضَ مَدَدْ نٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا

فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ-وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ-

যমীনকে আমি বিস্তৃত করে দিয়েছি এবং যমীনের ওপর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছি, প্রত্যেক বস্তু আমি সুপরিমিতভাবে (Balanced) সৃষ্টি করেছি এবং এসবের মধ্যে তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তোমাদের জন্য আর সেই অসংখ্য সৃষ্টির জন্য যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও। (সূরা হিজর-১৯-২০)

মাটি চারটি পর্বে বিভক্ত

বিজ্ঞানীগণ বলেন, এ পৃথিবী প্রধানত চারটি পর্বে বিভক্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরের পর্বকে ইনার কোর (Inner Core) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ইনার কোর (Inner Core) কঠিন লোহা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইনার কোরের ব্যাসার্ধ প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। (Outer Core) আউটার কোর (Inner Core) ইনার কোরকে আবৃত করে রেখেছে। এই আউটার কোর তরল লোহা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এর সাথে ২০ ভাগ মত নিকেল রয়েছে। এই আউটার কোরের পুরুত্ব (Thickness) প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। এই আউটার কোরের ওপরের পর্বকে ম্যান্টেল (Mantle) নামে অভিহিত করা হয়েছে। ম্যান্টেল (Mantle) প্রধানত অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহার তৈরী যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এই ম্যান্টেলের পুরুত্ব প্রায় ২৯২০ কিলোমিটার।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই ম্যান্টেল কোরের ওপরের স্তরকে ক্রাষ্ট (Crust) বলা হয়। গোটা পৃথিবীর মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ এই ক্রাষ্টের ওপরেই অবস্থান করছে। এই ক্রাষ্টের পুরুত্ব প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে প্রায় ১০ কিলোমিটার। ম্যান্টেলের ওপর অংশের ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত একটু ভিন্ন গুণাবলী সম্পন্ন। ক্রাষ্ট এবং ম্যান্টেলের ওপরের অংশের এই এলাকা সম্মিলিতভাবে লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) প্রস্তুত করে। লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গঠিত এবং সাতটি বিরাটাকারের খন্ডে বিভক্ত। এগুলোকে কন্টিনেন্টাল প্লেটস (Continental Plates) নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার লিথোস্ফিয়ারের নিচের অংশকে এ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের

তাপমাত্রা ৪০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং যতই ওপরের দিকে আসা যাবে ততই এর তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। পৃথিবীর ভূ-ভাগের ওপরের অংশের এই তাপমাত্রা .০৬ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে। এই পৃথিবীর ভেতর থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার সময় এ্যাসথেনোস্ফিয়ারে কনভেকশন কারেন্ট (Convection Current) প্রস্তুত করে।

এই কারেন্ট বা স্রোত যমীনের ওপরের অংশে ধাক্কা দেয় এবং তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ্যাসথেনোস্ফিয়ারের এই কনভেকশন কারেন্টের কারণে কন্টিনেন্টাল প্লেটগুলো অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। পৃথিবীর সাতটি মহাদেশ এই সাতটি প্লেটের ওপরে অবস্থিত, এ কারণে মহাদেশগুলো অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। এই প্লেটগুলো যখন চলতে থাকে তখন এর কিনারাগুলো একটির সাথে আরেকটি ক্রিয়া করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই ক্রিয়া চার ধরণের হতে পারে। যখন একটি প্লেট আরেকটি প্লেটকে ধাক্কা দেয় এবং একটি অন্যটির নীচে চলে যেতে পারে না, যে এলাকায় এটা ঘটে সে এলাকাকে কলিসন জোন (Collision Zone) বলে।

এলাকায় প্লেটের কিনারা বাঁকা হয়ে পর্বতমালার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, হিমালয় পর্বত এই প্রক্রিয়াতেই সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন একটি প্লেট অন্য প্লেটের নীচে চলে যায় তখন ভূমিকম্প হতে পারে, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি উদগিরণ হতে পারে। আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা দিয়ে পর্বতমালার সৃষ্টি হতে পারে যেমন হয়েছে আন্দিজ পর্বতমালা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই প্রক্রিয়াতেই পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য। এই কাজটি যিনি সম্পাদন করেছেন, তিনিই হলেন রব্ব। শুধু তাঁরই প্রশংসা করতে হবে।

মাটি নিয়ন্ত্রণসাধ্য

মানুষের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপকরণ দিয়েই এই ভূ-পৃষ্ঠ আল্লাহ তা'য়ালা গঠন করেছেন যেন মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকেই সংগ্রহ করতে পারে। আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهٖ–

তিনি তোমাদের জন্য মাটিকে পরিচালনসাধ্য বা নিয়ন্ত্রণসাধ্য (Manageable) করে দিয়েছেন। তোমরা মাটির বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ করো। (সূরা মুল্ক-১৫)

আল্লাহ্ এই মাটিকে পাথরের মতো কঠিন করেননি, আবার পানির মতো তরলও করেননি। যেরূপে যে অবস্থায় মাটি থাকলে সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণ হয়, আল্লাহ্ তাই করেছেন। আর যিনি এটা করেছেন তাকেই বলা হয় রব্। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا–وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ–اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ–

আর তিনিই ভূ-তলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বুকে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের। তিনি দিনকে রাত দিয়ে আবৃত করে দিয়েছেন। এসব কিছুর মধ্যে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রা'দ-৩)

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীর ভূ-তলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন'। এ আয়াতে যে 'মাদ্দা' শব্দ ব্যহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো, 'কোন কিছুকে টানা বা বিস্তৃত করা।' বিজ্ঞানীদের পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যানুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ এলাকা অতিরিক্ত উত্তপ্ত থাকার পরও অতিরিক্ত চাপের (Pressure) কারণে কঠিন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের অল্প গভীরে চাপের পরিমাণ কম থাকার কারণে মাটির নিচের পদার্থসমূহ গলিত অথবা কঠিন বা মিশ্রণ অবস্থায় রয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীতে ভূ-পৃষ্ঠ ঠান্ডা হওয়ার জন্য কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ঢাকনা (Crust) বা আবরণের সৃষ্টি হয়েছে। মাটির এই আবরণ পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হয়নি। আবরণটি সম্পূর্ণ গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে বা আবৃত করে রেখেছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই আবরণ গঠিত না হলে এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না।

ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত প্রাণী জগতের কল্যাণের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ সৃষ্টি করে টেনে দিয়েছেন বা বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কিন্তু এই আবরণের বিষয়টি এতটা সহজ নয়। চিন্তা গবেষণা করলে মাটির এই আবরণটির গঠনের কলা-কৌশল দেখলে সেজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। যমীনকে আল্লাহ কিভাবে বিস্তৃত করেছেন, এ সম্পর্কে মানুষকে বলা হয়েছে, তোমরা চিন্তা করো–গবেষণা করো তাহলেই তোমরা অনুভব করতে সক্ষম হবে, আমি আল্লাহ তোমাদের কেমন রব্। সূরা যারিয়াতের ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ–

এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, দেখতো আমি কত চমৎকার করে বিছিয়েছি।

আমি আল্লাহ তোমার এমন রব্–তুমি না চাইতেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তোমার কল্যাণের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করে রেখেছি। দেখতো, আমি তোমার জন্য কত সুন্দর করে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীর এই যমীনকে তোমার জন্য কি করেছি শোন–

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ–

আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তারপর এর ওপরে পাহাড় গেড়ে দিয়েছি, তারপর যমীনের ওপরে নব ধরনের উদ্ভিদ দান করেছি এবং এসব উদ্ভিদ যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই দান করেছি। (সূরা হিজর–১৯)

গোলাকার উত্তপ্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠ মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে দিয়ে বা বিস্তৃত করে দিয়ে যথাযথ উষ্ণতা, পানি, বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টি করে আল্লাহ পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠের মাটির ভেতরে আল্লাহ স্তর সৃষ্টি করেছেন বা বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً–

তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন। (সূরা বাকারাহ্‌-২২)

সূরা ত্বাহায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا– তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা করেছেন। (সূরা ত্বাহা-৫৩)

সূরা নূহের ১৯ আয়াতেও বলেছেন, মাটিকে তোমাদের জন্য আমি বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি এই ব্যবস্থা করেছি, সুতরাং আমার দেয়া বিধান ত্যাগ করে কেন তোমরা অন্যের রচিত বিধান অনুসরণ করছো? আল্লাহ বলেন–اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا– মাটিকে তোমাদের জন্য বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছি, তা কি তোমরা দেখতে পাও না?

ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে

আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। কোন একটি ধূলি কণাও যেন শুষ্ক না থাকে মহান আল্লাহ সে ব্যবস্থা করেন। গাছ ফলে-ফুলে সুশোভিত হবে–এ জন্য প্রয়োজন হয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদি। আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামীন–তিনি এসবের ব্যবস্থা করেন। বৃক্ষ-তরুলতা বায়ুমন্ডলে থাকা কার্বনডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন সংগ্রহ করে, বায়ুমন্ডল মাটি ও পানি থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করে এবং বায়ুমন্ডল ও পানি থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে। এছাড়াও নানা পদার্থসমূহ মাটি থেকে সংগ্রহ করে। এসব ব্যবস্থা যিনি করেছেন তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন।

এই পৃথিবীকে তিনি প্রাণীকুলের জন্য বাসোপযোগী করেছেন। বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এই পৃথিবী আকৃতিতে গোলাকার। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ অঞ্চল উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রস্থ এলাকার উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি এবং ওপরের দিকের উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে এসেছে। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ শিলা, বালি ও মাটি দিয়ে গঠিত।

এই ভূ-পৃষ্ঠের নিচে মহান আল্লাহ নানা ধরনের খনিজ সম্পদ দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার ওপরের দিকে রয়েছে নদী, সাগর, মহাসাগর এবং বনজসম্পদ। নদী-সাগর-মহাসাগরের গর্ভে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য অগণিত সম্পদ দান করেছেন। বনজ সম্পদ শুধু মানুষেরই কল্যাণে আসে না, সমস্ত প্রাণীকুল বনজ সম্পদ থেকে যেন উপকৃত হতে পারে, মহান আল্লাহ সে ব্যবস্থাও করেছেন।

পৃথিবীর ওপরে শূন্যমার্গে বায়ুমন্ডল দিয়ে আবৃত করা রয়েছে। মাটি, পানি ও বায়ুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন বলে এই পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য বসবাসোপযোগী হয়েছে। এই পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ-ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ-فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ -

আল্লাহই তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন এবং ওপরে আকাশের গম্বুজ নির্মাণ করেছেন, যিনি তোমাদের প্রতিকৃতি রচনা করেছেন, অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিস সমূহের রিয্‌ক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ এসব কাজ যিনি নিপুণভাবে সম্পাদন করেছেন তিনি তোমাদের রব, অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা বিশ্বলোকের সেই রব। (সূরা মুমিন-৬৪)

আল্লাহ তা'য়ালা শুধু এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগিই করেননি, এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য শয্যা বানিয়েছেন, পৃথিবীতে মানুষের জন্য অসংখ্য কল্যাণের পথ সৃষ্টি করেছেন। সূরা যুখরুফের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং সেখানে তোমাদের কল্যাণের জন্য পথ করে দিয়েছেন যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হও।

ভূপৃষ্ঠের কম্পন

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে বলেন, আমার সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখতো, আমি কী ভাবে সৃষ্টি করেছি। কোরআন বলছে–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ-وَاَنْزَلْنَا مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ-

তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, তিনি আকাশ মন্ডল সৃষ্টি করেছেন কোন ধরনের স্তম্ভ ব্যতিতই, তিনি যমীনের বুকে পর্বতমালা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে দিয়েছেন, যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না যায়। তিনি সব ধরনের জীব-জন্তু যমীনের বুকে বিস্তার করে দিয়েছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষিয়েছেন এবং যমীনের বুকে রকমারী উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করেছেন। (সূরা লোকমান-১০)

এসব আয়াতে 'কাঁপা' বা 'হেলে' যাওয়া শব্দ দিয়ে আমরা যে মাটির ওপরে অবস্থান করছি সেই মাটিকে বা পৃথিবী পৃষ্ঠকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এসব আয়াত থেকে গোটা ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন বা আন্দোলিত হবার কথা বুঝানো হয়নি। বরং গোটা পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ আন্দোলিত না হয়েও ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থান যে কোন মুহূর্তে আন্দোলিত হতে পারে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর একটি দেশে ভূমিকম্প হলে অন্য দেশ তা অনুভব করতে পারে না।

আবার একটি দেশের ভেতরেও একটি বিশেষ এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয় কিন্তু পার্শ্ববর্তী এলাকায় তা অনুভূত হয় না। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন হওয়ার জন্য পৃথিবীর গোটা ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপার প্রয়োজন হয় না। ভূমিকম্পের কারণে স্থানীয়ভাবে ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন হয় এবং সেই কম্পন দূরবর্তী কোন স্থানকে প্রভাবিত নাও করতে পারে-সাধারণত এটা করে না তাই আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি না করতেন তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের এই স্থানীয় কম্পন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করতো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَجَعَلْنَا فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ-

আমি ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে দিয়েছি যেন ভূ-পৃষ্ঠ তাদের নিয়ে কাঁপতে না পারে। (সূরা আম্বিয়া-৩১)

রেল লাইনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইস্পাত নির্মিত পাতগুলোর নিচে রয়েছে অনেকগুলো ইস্পাতের পাত বা মোটা কাঠ। এগুলোর সাথে লোহার মোটা গজাল দিয়ে রেল লাইনগুলো অত্যন্ত মজবুতভাবে এঁটে দেয়া হয়েছে যেন ট্রেন চলাচলের সময় তা নড়াচড়া করতে না পারে। তেমনি আল্লাহ

তা'য়ালা পাহাড়-পর্বতগুলো গজালের ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠের গভীরে গেঁথে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا– আর পাহাড়গুলো গ্রাফীর ন্যায় গেড়ে দিয়েছি। (সূরা নাবা-৭)

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বতের উচ্চতা ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে যত পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয় তারচেয়েও অনেক বেশী মাটির অতলদেশে প্রোথিত রয়েছে। কোন পর্বতমূল ভূ-গর্ভের কতটা গভীরে প্রোথিত রয়েছে তা নির্ভর করে সেই পর্বতটির সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছিল। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির লাভার মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়েছে না অন্য কোনভাবে। গড় হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫ মাইল পর্যন্ত পুরু বা মোটা হতে পারে। এ কারণে পর্বতের মাটির নিচের মূল অংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫ মাইল গভীরে প্রোথিত থাকতে পারে। এরচেয়ে অধিক গভীরে অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে পদার্থগুলো গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, পাহাড়-পর্বতসমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে উত্থিত হয়েছে এবং নিচের দিকেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং পাহাড়-পর্বতগুলো ভূ-পৃষ্ঠে গজালের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا-مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-

আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠে পর্বত প্রোথিত করে দিয়েছেন, জীবিকার সামগ্রী হিসেবে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পশুর জন্য। (সূরা নাযিয়াত-৩২-৩৩)

আল্লাহ তা'য়ালা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সঠিক অবস্থান দান করেছেন। পর্বতের এই সঠিক অবস্থিতির কারণে বাতাস তথা মেঘের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বৃষ্টি বর্ষণে সহায়ক হয়। পাহাড়-পর্বত থেকে প্রবাহিত নদ-নদীর পানি প্লাবিত হয়ে কৃষি কাজের জন্য মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিলাভ করে। নদ-নদীর পানি নিয়ন্ত্রিত করে দূর-দূরান্তে পানির সরবরাহ করা সম্ভব হয় এবং পানিবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। এভাবে নানা ধরনের খাদ্য সামাগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে এবং তা মানুষ ও প্রাণীকুলের আহার যোগাচ্ছে। এগুলো যিনি সম্পাদন করেছেন তাঁর নামই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোরআন ঘোষণা করছে–

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا-

এবং তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা ও নদী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রা'দ-৩)

পানি থেকেই জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব

এই পৃথিবীতে মানুষ এমন অনেক কিছু ভোগ করে এবং চোখে তা দেখে, জ্ঞানে ধরা পড়ে এসব হলো আল্লাহ তা'য়ালার প্রকাশ্য নেয়ামত। আর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না এবং অনুভবও করতে পারে না সেগুলো হলো আল্লাহ তা'য়ালার গোপন নেয়ামত। স্বয়ং মানুষের নিজের দেহে এমন অনেক কিছু কাজ করে যাচ্ছে এবং দেহের বাইরে পৃথিবীর পরিবেশে মানুষের স্বার্থে কল্যাণময় ভূমিকা পালন করছে এমন অগণিত জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু মানুষ এসব সম্পর্কে জানেও না যে, মহান আল্লাহ তাকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য, তার প্রতিদিনের আহারের জন্য, তার দেহের জীব কোষ বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশের জন্য এবং তার অন্যান্য কল্যাণের জন্য নানা ধরনের উপকরণ থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন।

বর্তমানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই মানুষের সামনে আল্লাহ তা'য়ালার এমন অগণিত নেয়ামত স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হচ্ছে যে, এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষের কোন পূর্ব ধারণাও ছিল না। পক্ষান্তরে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মানুষ আল্লাহর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, সেগুলো ঐসব নেয়ামতের তুলনায় অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, যেসব নেয়ামত বর্তমান সময় পর্যন্তও মানুষের জ্ঞানের অগোচরে রয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রথমে জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। অথচ চৌদ্দ শত বছর পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে পৃথিবীবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, 'পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে পানি থেকে।' অথচ তিনি কোন দিন কোন বিজ্ঞান গবেষণাগারে গবেষণা করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা সেই মহামানবের মুখ দিয়েই উচ্চারিত করালেন–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ–

আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আম্বিয়া-৩০)

জীবন্ত বস্তু বলতে শুধু মানুষকেই বুঝানো হয় না। সৃষ্ট জগতের অসংখ্য জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদসমূহও জীবন্ত বস্তুর মধ্যে শামিল রয়েছে। প্রজননের মাধ্যমেও জীবের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রেও পানি অপরিহার্য। জীব কোষের

পদার্থসমূহের অধিকাংশই পানি এবং অতি সামান্য অংশ রয়েছে অন্যান্য পদার্থ। পানি ব্যতিত জীব কোষ জীবিত থাকতে পারে না এবং কোন ধরনের জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটবর্তী গ্রহ। আর আয়তনের দিক থেকে পৃথিবী হলো পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার। এই দুরত্বকে জ্যোতির্বিদ্যার একক বা এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (Astronomical unit) বলে। এই হিসেবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১ জ্যোতির্বিদ্যা একক। পৃথিবীর ব্যস ১২ হাজার ৭ শত ৫৬ দশমিক ৩ কিলোমিটার। আর ভর ৬. ৬ সেক্সটিলিয়ন। পৃথিবীর গতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবী এক পাক সম্পন্ন করে। যাকে আমরা একদিন বলে থাকি। আর সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে আমাদের এই পৃথিবী সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট, ৯ দশমিক ৫৪ সেকেন্ড।

এই পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর এক মেরু থেকে আরেক মেরুর দুরত্ব ৭ হাজার ৮ শত ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭ শত ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। আর বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দুরত্ব ৭ হাজার ৮ শত ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭ শত ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। পৃথিবী পৃষ্ঠের আয়তন সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫১ হাজার বর্গমাইল বা ৫১ কোটি ১ লক্ষ কিলোমিটার। এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীর মধ্যে ভূ-ভাগ হলো মাত্র ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৯ হাজার মাইল বা ১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ কিলোমিটার। অর্থাৎ পৃথিবীর আয়তনের মোট ৩০ শতাংশই হলো পানি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি করেছেন পানি থেকে। পৃথিবীতে জীব টিকে থাকা ও বিকাশের জন্যও পানি একান্তই প্রয়োজন। পৃথিবীতে পানির অংশের আয়তন হলো ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল বা ৩৬ কোটি ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। কত পানি যে আল্লাহ এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা কল্পনাও করা যায় না। জীবন ধারনের জন্য পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য নদী-নালা,ডোবা-পুকুর, হৃদ, সাগর, মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। এরপরেও আল্লাহ মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এসব কিছুই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে যত সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গভীর এলাকার নাম হলো ম্যারিনা ট্রেঞ্চ। গুয়ামের দক্ষিণ পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে এই এলাকাটির গভীরতা ৩৬ হাজার ১৯৮ ফুট বা ১১ হাজার ৩৩ মিটার। পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোর গড় গভীরতা ১২ হাজার ৪ শত ৫০ ফুট বা ৩ হাজার ৭ শত ৯৫ মিটার। এই পরিমাপের কম বা বেশী হলেই পৃথিবীর পরিবেশ বিপন্ন হবে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানির পরিমাপ এই পৃথিবীতে ঠিক রেখেছেন। এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে যিনি সম্পাদন করেন তিনিই হলেন রব্ব। যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

এ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে লিবিয়ার আল আজিজিয়ায় ১৩৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এ্যান্টার্টিকার ভোকষ্ট–এ মানইনাস ১২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ মাইনাস ৮৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আল্লাহ তা'য়ালা এই তাপমাত্রার ব্যতিক্রম করে দিলেই পৃথিবীর প্রাণীকুল বিপন্ন হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, আল্লাহর মোকাবিলায় পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণী বসবাসের উপযোগী করতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, এসব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করি আমি আল্লাহ। সুতরাং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আমার বিধান অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করো আর আমার বিধান গ্রহণ করার মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা কি দেখতে পাওনা, তোমাদেরকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। শুধু তোমাদেরকেই নয়–পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকেই আমি পানি থেকেই সৃষ্টি করেছি। এই পানি ব্যতিত মুহূর্তকালের জন্যও তোমাদের জীবন চলতে পারে না। এ জন্য আমি পৃথিবীতে অসংখ্য বিশালাকের জলাধার নির্মাণ করেছি। এসব দেখেও কি তোমরা নিজেদেরকে ভুল পথেই পরিচালিত করবে?

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য বিচিত্র প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রাণীর চলার ধরণ ও গতি এক রকম নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ-فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ-وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ

يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ-يَخْلُقُ اللَّهُ مَايَشَاءُ-اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ সমস্ত জীবকেই পানি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। তাদের কোনটি বুকের ওপরে ভর করে চলে। কোনটি দু'পায়ে ভর করে চলে। আবার কোনটি চলে চার পায়ে ভর করে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, তিনি তো সমস্ত কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আন্ নূর-৪৫)

পানির দুটো ধারা

রাব্বুল আলামীন বলেন, নদী-সাগর ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো, পানির দুটো ধারা কিভাবে বয়ে চলেছে। একটি ধারা সুমিষ্ট আরেকটি ধারা লবণাক্ত। এই পানির ভেতরে নানা ধরনের মাছ আমি তোমাদের খাদ্য হিসাবে মওজুদ রেখেছি। তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ নানা ধরনের অলঙ্কার প্রস্তুত করার উপাদান রেখেছি। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ-هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ-وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا-وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ-وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ-كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى-ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-

পানির দুটো উৎস সমান নয়। একটি সুমিষ্ট ও পিপসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা কণ্ঠনালীতে ক্ষত সৃষ্টি করে, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা সজীব গোস্ত লাভ করে থাকো, পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যের সরঞ্জাম বের করো এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে

আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করেছেন। এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহ্ই তোমাদের রব্ব, সার্বভৌমত্বও তাঁরই। (সূরা ফাতির)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন রব্ব, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। লবণাক্ত পানি পান করার অযোগ্য কিন্তু লোনা পানির ভেতর দিয়ে মানুষ যখন জলযানে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তখন যদি তার পানির প্রয়োজন হয়, এ জন্য আল্লাহ্ সাগর-মহাসাগরের ভেতরে অসংখ্য মিষ্টি পানির স্রোতধারা প্রস্তুত করে রেখেছেন। তিনি বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ–وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًاوَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا–

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্টি এবং অন্যটি লোনা ও খারযুক্ত। আর দু'য়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের এককার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে। (সূরা আল ফুরকান-৫৩)

পৃথিবীর কোন বড় নদী এসে যেখানে সাগরে মিলিত হয়, সেখানেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি পানির স্রোত পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভীষণ লবণাক্ত পানির মধ্যেও মিষ্টি পানির স্রোত তার নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম। পারস্য উপসাগরেও মিষ্টি পানির স্রোত রয়েছে। চারদিকে লবণাক্ত পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর মাঝখানে গোল বৃত্তের মতো মিষ্টি পানির স্রোত ঘুরছে। একটি লবণাক্ত পানির স্রোত এসে মিষ্টি পানির স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে, কিন্তু সে পানি পরস্পর মিলিত হয়ে আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে না। রাব্বুল আলামীন এমন এক অদৃশ্য প্রহরার ব্যবস্থা সেখানে করেছেন, যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيٰنِ

দুটো সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত হয়। এরপরেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে, যা তারা অতিক্রম বা লংঘন করে না। (সূরা রাহমান-২০)

বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প

বিজ্ঞানীদের ধারনা অনুসারে পৃথিবীর মূল আবহাওয়ামন্ডলের বিস্তৃতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৫০ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু। পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলের ৯৯ শতাংশই এর মধ্যে পড়েছে। তবে ১ হাজার মাইল বা ১ হাজার ৬ শত কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলের গ্যাসের হাল্কা অস্তিত্ব বিরাজমান। পৃথিবীর এই বায়ুমন্ডলের ৭৮ ভাগই নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন, ১ ভাগ আর্গন। এছাড়া রয়েছে কার্বনডাই-অক্সাইড, অন্যান্য গ্যাস ও জলীয় বাষ্প। বায়ুমন্ডলের এসব উপাদানসমূহ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের টিকে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

মানুষের জীবন ধারনের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানব শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয় এবং তা মানবদেহের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। মানুষের জীবন ধারনের জন্য একান্ত প্রয়োজন হলো আগুন। অক্সিজেন ব্যতিত আগুন প্রজ্জলিত হয় না। কয়লা, তেল বা অন্য কোন দহনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। বায়ূমন্ডলে থাকা নাইট্রোজেন গ্যাস যে কোন ধরনের দহন কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। উদ্ভিদ-বৃক্ষ-তরু-লতার জন্য নাইট্রোজেন অপরিহার্য। বায়ুমন্ডলে অবস্থিত কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস উদ্ভিতের জন্য প্রাণস্বরূপ। পানি এবং কার্বনডাই অক্সাইড থেকে সূর্যের আলোতে বৃক্ষ-তরু-লতার সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার খাদ্য ও অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত হয় এবং অনাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দেয়।

এভাবে মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ুমন্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বনডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে বৃক্ষ, তরু-লতা বায়ুমন্ডল থেকে কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে এদের সমতা রক্ষা করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বায়ুমন্ডলকে আদেশ দান করেছেন, যেন বায়ুমন্ডল গোটা পৃথিবীকে আবৃত করে রাখে। ফলে দিন ও রাত, গ্রীষ্ম এবং শীতকালের উষ্ণতার পার্থক্য বেশী হতে না দিয়ে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জগৎ টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বায়ুমন্ডলে নানা ধরনের স্তর সৃষ্টি করেছেন। এসব স্তরের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান

করেছেন। এর একটি স্তরের নাম হলো ওজোন স্তর। এই ওজোন স্তর সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) শোষণ করে জীব জগৎ ও উদ্ভিদ জগত্‌কে হেফাজত করে। বায়ুমন্ডলের আরেকটি স্তরের নাম হলো অমভ্রমদণরণ। এই স্তর থাকার কারণে মানুষ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠের সাগর, মহাসাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড় ইত্যাদি থেকে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে আল্লাহ্র আদেশে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে।

এই জলীয় বাষ্প ওপরে ওঠার পর ক্রমে তা শীতল হতে থাকে এবং পানির বিন্দু সৃষ্টি হয়। এরপর তা ঘনীভূত হয়ে আল্লাহ্র আদেশে মেঘমালায় পরিণত হয়। মহান আল্লাহ্ বায়ুমন্ডলে উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে মেঘ দূর-দূরান্তে চলে যায়। তারপর আল্লাহ্র আদেশে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠ সিক্ত করে। এভাবে আল্লাহ্ মৃত যমীনকে জীবিত করেন। মহান আল্লাহ্ সূরা ফাতিরের ৯ নং আয়াতে বলেন–

وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا–

তিনিই আল্লাহ্ যিনি বায়ু প্রেরণ করে এবং বায়ু দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর তিনি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করেন এবং মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তোলেন

পৃথিবীর যেখানে বৃষ্টি প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'য়ালা বায়ুকে আদেশ করেন সেখানে মেঘমালা সঞ্চালিত করার জন্য। মুহূর্তের মধ্যে বায়ু সে আদেশ পালন করে। কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং বৃষ্টির ফোটার আকার কি হবে সেটাও আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দেন। এভাবে বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ পৃথিবীকে সিক্ত করেন। আল্লাহ্ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ–حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ–

তিনি নিজের অনুগ্রহের (বৃষ্টি বর্ষণের) প্রথমে বাতাসকে সুসংবাদবাহী হিসেবে প্রেরণ করেন। তারপর যখন সে বাতাস পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালা উত্থিত করে,

তখন সে বাতাসকে কোন মৃত (শুষ্ক) যমীনের দিকে প্রেরণ করেন, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর যমীন থেকে নানা ধরনের ফলমূল উৎপদন করেন। (সূরা আ'রাফ-৫৭)

সুরক্ষিত মহাকাশ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আকাশে তথা উর্ধ্বজগতে কত সহস্র ধরনের বিশালাকারের অকল্পনীয় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে সামান্য ধারণা ওপরে পেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এই আকাশ মন্ডল কিসের ওপর নির্ভর করে ওপরে অবস্থান করছে ? এই প্রশ্নের জবাব কোন মানুষ বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। কোন বিষয়ে মানুষ জ্ঞানার্জন করলে বা জ্ঞান থাকলে তাকে সে বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যেতে পারে। আসলে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আকাশের কোন সন্ধানই লাভ করতে সমর্থ হয়নি। সর্বাধুনিক দূরবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাদের চোখে যা ধরা পড়েছে, সে সম্পর্কে তারা পৃথিবীবাসীর কাছে ধারণা পেশ করেছেন। আকাশের কোন ঠিকান তারা খুঁজে পাননি। মহাশূন্যের অসংখ্য জগৎ সম্পর্কে তারা বলেছেন, সেখানে এমন ধরনের অদৃশ্য শক্তি বিরাজ করছে যে, তারা প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহকে এক আকর্ষণী শক্তির মাধ্যমে যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য করছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا-

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (সূরা আর রাদ-২)

কোন পিলার নেই, কোন স্তম্ভ নেই-মানুষের দৃষ্টিতে কোনকিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ আকাশ ঠিকই যথাস্থানে অবস্থান করছে। অদৃশ্যমান কোন নির্ভরের ওপরে আকাশ স্থির রয়েছে। এই আকাশ জগতে আল্লাহ তা'য়ালা যে অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যার বিশলতা সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না, সেসব জগৎ একটির সাথে আরেকটি সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করছে না। উর্ধ্বজগতের এমন সব অংশ যার ভেতরকার প্রতিটি অংশকে অত্যন্ত শক্তিশালী সীমান্ত অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। যদিও এ সীমান্ত রেখা মহাশূন্যে অদৃশ্যভাবে অঙ্কিত রয়েছে তবুও সেগুলো অতিক্রম করে কোন জিনিসের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ-

আকাশে আমি অনেক শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেছি, দর্শকদের জন্য সেগুলো সুসজ্জিত করেছি। (সূরা হিজর-১৬)

উল্লেখিত আয়াতে 'বুরুজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বুরুজ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, দূর্গ, শক্তিশালী ইমারত বা প্রাসাদ। মহান আল্লাহই ভালো জানেন তিনি উর্ধ্বজগতে কি ধরনের বুরুজ নামক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উর্ধ্বজগৎ থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তা যেসব স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছেঁকে প্রয়োজনীয় রশ্মি পৃথিবীতে প্রেরণ করে, সেসব স্তরই বুরুজ হতে পারে। আবার উর্ধ্বজগতে শয়তানের প্রবেশ পথে যেসব বাধা নির্মাণ করা হয়েছে, তাও বুরুজ হতে পারে। সুতরাং আকাশ জগতসমূহে কোথাও কোন দুর্বলতা নেই। সবকিছু নির্মিত হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির ওপরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَاوَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ-

এরা কি কখনো নিজেদের ওপরে অবস্থিত আকাশমন্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে না? কিভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত করেছি আর তাতে কোথাও কোন ধরনের ফাঁক ও ফাটল নেই। (সূরা ক্বাফ–৬)

আকাশ জগতের এই বিস্ময়-উদ্দীপক বিশালতা সত্ত্বেও এই বিরাট বিস্তীর্ণ মহাবিশ্ব ব্যবস্থা একটি ধারাবাহিক ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা এবং এর বন্ধন, গ্রন্থনা এতই দৃঢ়–দুচ্ছেদ্য যে, তার কোথাও কোন ধরনের ফাটল বা অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না। এর ধারাবাহিকতা কোথাও গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا-

অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি–যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। (সূরা আল ফুরকান–৬১-৬২)

যে আল্লাহর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে, তিনি অসীম বরকত সম্পন্ন। তিনি আকাশকে পৃথিবীর ছাদ হিসাবে নির্মাণ করে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করেননি। সূর্যকে সেখানে প্রদীপ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই সূর্যরশ্মির ভেতরে এমন উপাদান রেখেছেন, যা পৃথিবীর প্রাণীসমূহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সূর্যের তাপ ব্যতিত পৃথিবীতে কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না, নতুন কিছু সৃষ্টিও হতে পারে না। আকাশ মন্ডলে তিনি অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে আলো দান করেছেন। মাথার ওপরে তারাজ্বলা অপূর্ব সৌন্দর্য মন্ডিত আকাশ দেখে মানুষ আমোদিত হবে, মায়াবী চাঁদের জ্যোসনায় অবগাহন করে হৃদয়-মন জুড়াবে। ক্লান্তি দূরিকরণে রাতকে তিনি দিয়েছেন বিশ্রামের জন্য, দিনকে দিয়েছেন জীবন ধারনের উপকরণ সন্ধানের জন্য। এসব দান করে মানব জাতিকে যিনি ধন্য করেছেন–তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

উর্ধ্বজগতে ক্ষতিকর রশ্মি

মাথার ওপরে তারাজ্বলা আকাশের সেই অদৃশ্য জগৎ থেকে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর দিকে অবর্ণনীয় গতিতে মৃত্যু দুতের মতই ছুটে আসছে অসংখ্য ক্ষতিকর আলোক রশ্মি। পরম করুণাময় আল্লাহ যে অদৃশ্য প্রতিরোধক শক্তি মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন, এসব রশ্মির গতি পথে তারা প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করে। কতকগুলো রশ্মি ফিল্টারে প্রবেশ করে। এভাবে ছেঁকে ক্ষতিকর কণাগুলো ধ্বংস করে কল্যাণকর কণাগুলোকে পৃথিবীতে আসার অনুমোদন দেয়া হয়। করুণার সাগর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন।

উর্ধ্বজগৎ থেকে ক্ষতিকর কণাগুলোর দু'চারটি যদিও বা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, ঐসব চৌম্বক ক্ষেত্র তখন দয়াময়ের নিদের্শে সক্রিয় হয়ে ওঠে। চৌম্বককে দান করা প্রবল আকর্ষণী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেসব ক্ষতিকর কণাগুলোকে টেনে নিয়ে যায় মেরু অঞ্চলের দিকে–যেখানে কোন জীবনের স্পন্দন নেই। রাহ্মান তাঁর সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য এসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন।

মেঘমালা থেকে বজ্রপাত

মানুষ ক্ষেতে চাষ করে ফসল লাভের আশায় বীজ বপন করে বাড়িতে চলে আসে। কৃষক ক্ষেতে বীজ বপন করে তারপর তার পক্ষে আর মূল বিষয়ে করণীয় কিছুই থাকে না। যে ভূমিতে সে বীজ বপন করলো, এই ভূমি তার সৃষ্টি নয়। ভূমিতে

উর্বরা শক্তি ও ফসল উৎপাদনের যোগ্যতা কোন মানুষ দান করেনি। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বলছেন, যে ঋতুতে বজ্রপাত অধিকহারে সংঘটিত হয়, সে ঋতুতে ফসলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। কারণ বজ্রপাতের মাধ্যমে ভূমিতে যে নাইট্রোজেন চক্র ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, এতে করে ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। এই নাইট্রোজেনই গাছের প্রাণশক্তি। যেসব মৌল উপাদান খাদ্য সামগ্রীতে সংগৃহীত হয়, সেটা মানুষের চেষ্টার ফসল নয়।

জমিতে যে বীজ মানুষ বপন করে, তাকে বিকশিত করা ও প্রবৃদ্ধি লাভের যোগ্যতাও মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এই চাষাবাদ ও বীজ বপনকে সবুজ আভায় হিল্লোলিত চারাগাছে পরিপূর্ণ ক্ষেতে পরিণত করার জন্য ভূমির মধ্যে যে কার্যক্রম এবং মাটির ওপরে যে আলো, বাতাস, তাপ, শীতলতা ও মৌসুমী অবস্থার আবর্তন হওয়া প্রয়োজন, তার ভেতরে একটি জিনিসও মানুষের সৃষ্টি নয়। ফসলের ভেতরে দানা সৃষ্টির ব্যাপারেও মানুষের কোন ভূমিকা নেই। এগুলো সবই ঐ দয়াময় রাহ্মান–আল্লাহই অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের জন্য করে থাকেন। তিনি বলেন–

اَفَرَءَيْتُمْ مَّاتَحْرُثُوْنَ- ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ- لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ-

তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছো, তোমরা যে বীজ বপন করো, তা থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন করো না আমি করি ? আমি ইচ্ছা করলে এই ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে দিতে পারতাম। (সূরা আল ওয়াকী'আ-৬৩-৬৫)

মহাকাশে অদৃশ্য ছাকনি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমার নাম রাহ্মান। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পর্কে তোমরা একটু ভেবে দেখো। আমি তোমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা কিভাবে করেছি। এই পানি তোমাদের জীবন, তোমাদের জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য বস্তুর থেকে পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই পানির স্রষ্টা তোমরা নও–আমিই দয়া করে তোমাদের জন্য সে পানি পরিবেশন করেছি। পৃথিবীর বুকে এই নদী-সমুদ্র, খাল-বিল-হাওড়, বিশালাকারের জলাধার আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি সূর্য সৃষ্টি করে তার ভেতরে তাপ দান করেছি। এমন পরিমাণে তাপ দান করেছি যেন সে তাপে পানি শোষিত হয়ে বাষ্পাকারে মহাশূন্যের দিকে উত্থিত হয়।

পানির ভেতরে এই গুণ-বৈশিষ্ট্য আমিই দান করেছি যে, একটি বিশেষ মাত্রার তাপ লাভ করলেই পানি বাম্পে রূপান্তরিত হয়। আমি বাতাস সৃষ্টি করেছি। আমার আদেশে বাতাস সেই বাম্প কণাগুলো ওপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে জমা করতে থাকে। তারপর আমার আদেশে তা মেঘমালায় পরিণত হয়।

আমার আদেশে সেই মেঘ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যে স্থানের জন্য যতটুকু পানির অংশ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, সেখানে ততটুকু পৌছে দেয়া হয়। উর্ধ্বজগতে আমি এমন এক শীতলতা সৃষ্টি করেছি যার ফলে পৃথিবী থেকে উত্থিত বাম্প পুনরায় সেখানে পানিতে রূপান্তরিত হয়। তারপর আমারই আদেশে তা পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

পানির ভেতরে মহান আল্লাহ যে বিশেষত্ব দান করেছেন, তা দেখলে সিজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। সমুদ্রের পানি একদিকে লবণাক্ত, তারপরে এই মানুষ পানিতে কতকিছুর মিশ্রণ ঘটাচ্ছে। কলকারখানার নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ এই পানির সাথে মিলেমিশে একাকার হচ্ছে। মলমূত্র, বিষাক্ত দ্রব্য ও অজস্র মৃতদেহ এই পানিতে মিশে যাচ্ছে। পানির নিচে নানা ধরনের অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। এভাবে পানি মারাত্মক আকারে দূষিত হয়ে পড়ছে।

এই পানি পান করলে মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সূর্য থেকে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাপের মাধ্যমে পানি শোষিত হয়ে বাষ্পাকারে ওপরের দিকে উত্থিত হচ্ছে। মহাশূন্যে আল্লাহ এমন এক অদৃশ্য শক্তিশালী ছাকনি (Filter) নির্মাণ করেছেন যে, পানিতে যত জিনিস মিশ্রিত হয়েছে, তাপের দরুন পানি যখন বাম্পে পরিণত হয়, তখন সব ধরনের মিশ্রিত জিনিস নিচে পড়ে থাকে এবং শুধুমাত্র পানির জলীয় অংশসমূহ ওপরের দিকে উঠে গিয়ে জমা হতে থাকে।

আল্লাহ রাহ্‌মান, তিনি দয়া করে এ ব্যবস্থা না করলে পানি যখন ওপরের দিকে উত্থিত হতো, তখন সেই পানির মিশ্রিত যাবতীয় বস্তুও উঠে যেতো। এ অবস্থায় পানি হতো দুর্গন্ধময় পানের অযোগ্য। সমুদ্র থেকে যে বাম্প ওপরের দিকে উঠে যায়, তা লবণাক্ত বৃষ্টির আকারে নেমে এসে পৃথিবীর সমস্ত ভূমিকে লবণাক্ত করে দিতো। ফলে পৃথিবীর ভূমিতে কোন ফসল হওয়া তো দূরের ব্যাপার, ক্ষুদ্র একটি উদ্ভিদও জন্ম নিত না। মানুষ ও মিষ্টি পানির জীবজগৎ এ পানি পানও করতে সক্ষম হতো না।

পানি থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ আর দ্রবণীয়-অদ্রবণীয় বর্জ্য পদার্থ এবং লবণ নিষ্কাশনের এই ব্যবস্থা যিনি করেছেন, তিনিই রাহ্‌মান–অসীম দয়ালু আল্লাহ। যিনি পানির এই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন তিনি সমস্ত দিক বিবেচনা করে তার অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে আপন রাহ্‌মতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্দেশ্যে করেছেন যে, তার তাঁর প্রিয় সৃষ্টিসমূহের জীবন ও প্রতিপালনের মাধ্যম ও উপায় হয়ে দাঁড়াবে। যেসব সৃষ্টি লবণাক্ত পানিতে জীবিত থাকতে ও লালিত-পালিত হতে পারে, তিনি সেসব সৃষ্টিকে সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেই তারা অত্যন্ত আরামদায়ক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছে।

কিন্তু স্থলভাগ ও বায়ুমন্ডলে বসবাসের জন্য সৃষ্টি জীবের জীবন ও লালন-পালনের জন্য মিষ্টি পানি ছিল অপরিহার্য। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা কার্যকর করার পূর্বেই তিনি পানির ভেতরে এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন যে, পানি তাপের প্রভাবে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় এতে সংমিশ্রিত কোন জিনিসসহ উত্থিত হবে না বরং তা সম্পূর্ণ গন্ধ ও দূষিত বস্তু পরিশোধিত হয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পান ও জীবন ধারনের উপযোগী অবস্থায় উত্থিত হবে। তিনি রাহ্‌মান–তাঁর রাহ্‌মত সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত।

সৃষ্টি জগতের নির্দিষ্ট পরিণতি

সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম বিষয় বলা হলো, কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি হয়নি–সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। এরপর মানব জাতির সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসেছে, এসব সৃষ্টি নশ্বর না অবিনশ্বর? এ প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য চিন্তাবিদ ও গবষেকগণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন সৃষ্টিসমূহের প্রতি। তারা নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এখানে কোন জিনিসই অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী নয়।

প্রতিটি জিনিসেরই একটি নির্ধারিত জীবনকাল নির্দিষ্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট সেই প্রান্ত সীমায় পৌছানোর পরে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টি জগতসমূহও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে, এ কথা আজ বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তারা বলছেন, এখানে দৃশ্যমান–অদৃশ্যমান যতগুলো শক্তি সক্রিয় রয়েছে তারা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ

পরিসরে তারা কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত শক্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করবে। তারপর কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সুদূর অতীতকালে যেসব চিন্তাবিদগণ পৃথিবীকে আদি ও চিরন্তন বলে ধারণা পেশ করেছিলেন, তাদরে বক্তব্য তবুও সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি লাভ করতো। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব-জগতের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে রায় দিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে দিয়ে এ কথা বলার আর কোন অবকাশ নেই যে, এই পৃথিবী আদি ও অবিনশ্বর। কোনদিন এই জগৎ ধ্বংস হবে না, নাস্তিক্যবাদীদের জন্য এ কথা বলার মতো কোন সুযোগ বিজ্ঞানীগণ আর রাখেননি। তারা কোরআনের অনুসরণে স্পষ্টভাবে মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই পৃথিবী ও সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে।

অতীতে বস্তুবাদিরা এ ধারণা প্রচলন করেছিল যে, বস্তুর কোন ক্ষয় নেই–বস্তু কোনদিন ধ্বংস হয় না, শুধু রূপান্তর ঘটে মাত্র। তাদের ধারণা ছিল, প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনের পর বস্তু–বস্তুই থেকে থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে বস্তুবাদীরা প্রচার করতো যে, এই বস্তু জগতের কোন আদি-অন্ত নেই। সমস্ত কিছুই অবিনশ্বর। কোন কিছুই চিরতরে লয় প্রাপ্ত হবে না।

পক্ষান্তরে বর্তমানে আনবিক শক্তি আবিষ্কৃত হবার পরে বস্তুবাদীদের ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বলছেন, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই বস্তুর শেষ স্তরে এর কোন আকৃতিও থাকে না এবং এর কোন ভৌতিক অবস্থানও বজায় থাকে না। তারপর Second law of thermo-Dynamics এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই বস্তুজগৎ অবিনশ্বর নয়, এটা অনন্ত নয় এবং তা হতে পারে না। এই বস্তুজগৎ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি এটি একদিন শেষ হয়ে যাবে। কোরআন সপ্তম শতাব্দীতে যে ধারণা মানব জাতির সামনে পেশ করেছিল, বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ তা নতুন মোড়কে মানব জাতির সামনে উত্থাপন করছে।

পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি

এ কথা আমরা সবাই জানি যে, এই পৃথিবীর পৃষ্ঠ অসমান। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি থাকার কারণে এই ভূ-পৃষ্ঠ সমান নয় অসমান। কিন্তু বিছানা তো অসমান হয় না–তাহলে আল্লাহ এই ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা বলে কোরআনে কেন উল্লেখ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিছানা বা কার্পেট এ দুটো জিনিস ব্যবহার করা হয় কোন কিছুকে ঢেকে বা আবৃত করার জন্য। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই পৃথিবীর ভেতরের অংশ উত্তপ্ত কঠিন এবং গলিত অবস্থায় রয়েছে। এই উত্তপ্ত গলিত অংশ উপযুক্ত পরিবেশের ভূ-পৃষ্ঠ দিয়ে আল্লাহ ঢেকে দিয়েছেন বা আবৃত করে দিয়েছেন বলেই এই যমীনের ওপরে বসবাস করা সম্ভব হয়েছে। ভোগবহুল জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় উপকরণ বা জিনিস যমীন নামক এই ঢাকনার ওপরে বিদ্যমান।

এ কারণেই এই ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ আকারে খুবই ছোট, এ কারণে তার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে পৃথিবীকে অসমতল দেখতে পায়। আসলে বিশাল এই পৃথিবীর আকারের তুলনায় এই পৃষ্ঠদেশের অসমতলতা অত্যন্ত নগণ্য। ছোট্ট প্রাণী পিঁপড়ার কাছে তার ঘরের মেঝে অসমতল হলেও আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই যে, পিঁপড়ার ঘর সমতল। তেমনি এই বিশাল পৃথিবীও আমাদের কাছে অসমতল বলে মনে হয়।

পৃথিবীর ভূ-বিজ্ঞানীগণ (Geologists) পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে গবেষণা করে দেখেছেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে একটি বিরাট সময় পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে বিবর্তন হওয়ার কারণেই এসব পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অধিক সংখ্যক পাহাড়-পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি না করে শ্রেণীবদ্ধভাবে (In ranges) সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন পাহাড়কে ভূ-পৃষ্ঠে নিঃসঙ্গভাবে দৃষ্টি গোচর হলেও মাটির তলদেশ দিয়ে দূরে-অনেক দূরে অন্য পাহাড়ের সাথে যোগসূত্র থাকতে দেখা যায়।

বিজ্ঞানিগণ পাহাড়-পর্বতগুলোর আকার-আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে শিলা, বালু ও মাটি প্রভৃতি পরীক্ষা করে এবং অন্যান্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলেছেন, পৃথিবী প্রাথমিক পর্যায়ে ভয়ংকর ধরনের উত্তপ্ত ছিল। পর্যায়ক্রমে বির্বতনের ফলে কালক্রমে তাপ বিকিরণের কারণে পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের ভিতরের

অংশের অতিরিক্ত চাপের কারণে তার কিছু অংশ ওপরের দিকে ভাঁজ হয়ে ফুলে উঠতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়। একটি কমলা লেবু শুকিয়ে গেলে যেমন তার ওপরের বাকলের ওপরে যে ধরনের ভাঁজ সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে পৃথিবীর বুকে ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, পৃথিবীর ভিতরের অংশে অতিরিক্ত উত্তপ্ত থাকার ফলে সেখানে অস্থিরতা (Unstability) বিরাজ করছে। ভূ-পৃষ্ঠের ভেতরে প্রতি মুহূর্তে প্রচন্ড আলোড়ন হচ্ছে। এই আলোড়নের কারণে কখনো কখনো পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ বা ওপরের স্তরটি কেটে যায় এবং সেই ফাটল দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ভেতরের গলিত পদার্থ প্রচন্ড বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে। এভাবে গলিত পদার্থগুলো ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে জমা হয়ে কালক্রমে পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানীগণ আরো বলেন, কোটি কোটি বছরের সময়ের বির্বতনেও ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়ে কিছু সংখ্যক পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এই তিন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। মহান আল্লাহ পাহাড়-পর্বতসমূহ এ পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীরে প্রোথিত করেছেন এবং অধিক সংখ্যক পাহাড়-পর্বত শ্রেণীবদ্ধভাবে মাটির তলদেশ দিয়ে একটির সাথে আরেকটির সংযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এ জন্যই ভূ-পৃষ্ঠ স্থিরতা (Stability) লাভ করেছে। ভূ-পৃষ্ঠের সুস্থিরতার ব্যাপারে পাহাড়-পর্বতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এটা একটি সাধারণ সূত্র যে, বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বস্তুটির অণু পরমাণুগুলোর গতি শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং উত্তপ্ত জিনিসের আলোড়নও বৃদ্ধি লাভ করে।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে, কোন তরল পদার্থ যেমন পানি, উত্তপ্ত করলে পানির ভেতরে অস্থিরতা বা আলোড়ন বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণে পানির ওপরের পৃষ্ঠে নানা ধরনের স্রোত বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। অবশেষে উত্তাপে পানি ফুটতে থাকে। তেমনিভাবে পৃথিবীর ভেতরের অংশও উত্তপ্ত হওয়ার কারণে গলিত পদার্থগুলোর উত্তপ্ততার জন্য এক প্রচন্ড অস্থির অবস্থায় বিরাজ করছে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত। এই উত্তপ্ত গলিত আলোড়িত পদার্থের ওপরে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ওপরি ভাগ বা মাটির স্তর বিদ্যমান।

এই মাটির সুস্থিরতা আনয়নে পাহাড়-পর্বত ভূমিকা পালন করছে। পাহাড়-পর্বত ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রোথিত থাকায় এবং বিস্তীর্ণ আয়তন জুড়ে মাটির নিচে পরস্পর সংযুক্ত থাকায় এই পৃথিবী পৃষ্ঠ স্থিরতা লাভ করেছে। পাহাড়-পর্বতগুলো মাটির নিচ দিয়ে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত রয়েছে অর্থাৎ টানাটানি অবস্থায় আল্লাহ রেখেছেন। এটা এ জন্য রেখেছেন যেন পৃথিবী পৃষ্ঠের কোথাও সহজে ফাটল ধরে প্রাণী জগৎ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। পাহাড়গুলো একটির সাথে আরেকটি বিচ্ছিন্নও হতে পারে না। পাহাড়গুলোকে আল্লাহ যদি এভাবে না রাখতেন, তাহলে পৃথিবীর এই ভূ-পৃষ্ঠ কখনও সুস্থির হতো না এবং এখানে মানুষ বসবাস করতে সক্ষম হতো না। এটা যিনি করেছেন তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ–

এবং তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতসমূহ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন তোমাদের নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপতে না পারে। (সূরা নাহল-১৫)

পৃথিবীর সৃষ্টি–দুর্ঘটনার ফসল নয়

নাস্তিকদের ধারণানুযায়ী এ পৃথিবী কোন দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। এ পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে রয়েছেন একজন মহাবিজ্ঞানী–যাঁর নাম হলো আল্লাহ। তিনি এ পৃথিবীকে পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন। সূরা হিজর-এ আল্লাহ বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ–

আমি যমীন ও আকাশমন্ডলকে এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী ঐ মহাশূন্যে যা কিছু রয়েছে, তা মহাসত্য ব্যতিত অন্য কোন ভিত্তির ওপর সৃষ্টি করিনি।

খেল-তামাসার বিষয়বস্তু করে এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়নি। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন কিছুই এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ–

আমি এই আকাশ ও যমীন এবং এর ভেতরে যা কিছুই রয়েছে, তার কোন কিছুকেই খেল-তামাসার ছলে সৃষ্টি করিনি। (সূরা আম্বিয়া-১৬)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ
مَاخَلَقْنٰهُمَآ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ هُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

এই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এর ভেতরে অবস্থিত জিনিসগুলো খেল-তামাসার ছলে সৃষ্টি করিনি। এগুলোকে আমি সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়। (সূরা দুখান-৩৮-৩৯)

আল্লাহ বলেন, আমি কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করিনি এবং অসুন্দর করেও সৃষ্টি করিনি। গোটা পৃথিবীর চারদিকে এবং নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার সৃষ্টির নৈপূন্যতা লক্ষ্য করো−কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি তোমার চোখে পড়বে না। কোরআন চ্যালেঞ্জ করছে−

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا-مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ-فَارْجِعِ الْبَصَرَ-هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ-ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ-

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমার মহাদয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের অসংগতি দেখতে পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। (সূরা মুলকঃ−৩-৪)

অগণিত জগতের ধারণা

সাধারণতঃ মানুষ এই পৃথিবীকেই প্রথম ও শেষস্থল বলে জানতো। এরপর মানুষ ধারণা লাভ করলো মানুষের জীবনাবসানের পরে পরলোক বলে আরেকটি জগৎ রয়েছে। কোরআনে বর্ণিত বহুমাত্রিক জগতের ধারণা পেয়ে চিন্তাশীল মানুষ যখন গবেষণা করেছে, তখন তারা 'আলামীন' শব্দের রহস্য উদ্ঘাটন করতে কিছুটা সমর্থ হয়েছে। সূরা ফাতিহা আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছে, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, আমরা চোখের সামনে জগৎ দেখছি মাত্র একটি এবং পৃথিবী নামক এই জগতে আমরা বসবাস করছি। অন্য জগতগুলো কোথায়? সাধারণভাবে চিন্তা করলেই সূরা ফাতিহায় বর্ণিত বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

মহাশূন্যে কতটি জগৎ রয়েছে, সে আলোচনা মুলতবী রেখে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের নীচে আরেকটি জগৎ বিদ্যমান। মাটির নানা স্তর সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। অসংখ্য খনিজজগৎ মাটির নীচে সৃষ্টি করেছেন। খনিজ পদার্থসমূহ মাটির নীচের জগতেই অবস্থান করছে। পানির জগৎ রয়েছে মাটির নীচে। মাটির নীচে এমন ধরনের জগৎ বিদ্যমান রয়েছে যে, প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে গলিত উত্তপ্ত লাভা আলোড়িত হচ্ছে। মাঝে মাঝে তা জ্বালামুখ দীর্ণ করে পৃথিবীতে এসে আঘাত হানছে। কোথাও রয়েছে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি। ফুটন্ত প্রসবণ, ঝর্ণার আকারে তা নির্গত হয়ে থাকে।

সমুদ্র গর্ভে রয়েছে আরেকটি জগৎ। অগণিত প্রাণী সেখানে বসবাস করছে। সমুদ্রের অতল তলদেশে রয়েছে উদ্ভিদজগৎ। এরও নীচে রয়েছে উত্তপ্ত লাভার জগৎ। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে মরুজগৎ, অরণ্যজগৎ, পশুজগৎ। দৃশ্যমান জগতেরই কোন শেষ সীমা নেই, এরপরেও রয়েছে অদৃশ্যজগৎ। পরমাণু জগতও সম্পূর্ণ একটি অদৃশ্যজগৎ। পরমাণু বা এ্যাটম–একে আমরা কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীত দেখতে সক্ষম নই। এটা কেন দেখা যায় না এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে দেখতে হবে আমাদের দেখার বা চোখের ক্ষমতা কতটুকু।

যখন আমরা কোন বস্তুকে দর্শন করি, তখন ঐ বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ ছড়িয়ে পরে এবং তা আমাদের চোখের ভেতরে প্রবেশ করে। আলোক তরঙ্গের বিচ্ছুরণ ব্যতীত কোন কিছুই আমরা দেখতে পাই না। যখন কোন আলোক তরঙ্গ কোন জিনিসের ওপরে পতিত হয়ে বস্তুকে সর্ম্পূণরূপে আবৃত করে ফেলে তখন আলোক তরঙ্গ আর ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হতে পারে না। সুতরাং, কোন বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হবার শর্ত হলো, বস্তুতে পতিত আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় হতে হবে।

এবার আসা যাক পরমাণু সম্পর্কিত ব্যাপারে। পরমাণু দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক ছোট। এ কারণে আলোক তরঙ্গ যখন তার ওপর পতিত হয় তখন তা সম্পূর্ণ পরমাণুকে পরিপূর্ণভাবে আবৃত্ত করে ফেলে। যে কারণে আর তা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না। এই কারণেই আমরা পরমাণু খালি চোখে দেখতে পাই না।

এভাবে যদি কয়েক লক্ষ পরমাণু মানুষের চোখের সামনে রাখা হয়, তবুও তা মানুষের দৃষ্টি দেখতে সক্ষম হবে না। মানুষের দৃষ্টি যা দেখতে সম্পূর্ণ অক্ষম অথচ এই পরমাণুরে ভেতরে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরেকটি শক্তিশালী জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই জগতকেই বলা হয় পরমাণু জগৎ। মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু ভাঙলে পাওয়া যায় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউক্লী, কোয়ার্ক এবং আরো কত কিছু। এ ধরনের বহু অণুকণা ও প্রতিকণা অদৃশ্য জগতে বিরাজ করছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে এসব কণা দর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরাম নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হচ্ছে। এসব রশ্মি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উচ্চ ভেদন শক্তি সম্পন্ন; এসব নিউক্লিয়াসকে ভেঙে প্রতি মুহূর্তে নির্গত হয়। এ ধরনের আরো অদৃশ্য রশ্মি সৃষ্টি জগতে বিদ্যমান এবং যা খালি চোখে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অদৃশ্যজগতে এমন অনেক ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী রয়েছে যেগুলো মানুষের পরিবেশকে বেষ্টন করে আছে। এসব এককোষী প্রাণীর মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হবে, ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।

বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, মানুষ যে সৌরজগতে বসবাস করছে এবং তার দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান যে জগত বিদ্যমান এটাই শেষ নয়। এ ধরনের অসংখ্য সৌরজগৎ মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতি চার বিলিয়ন মানুষ যদি একটি করে সৌরজগতে অবস্থান করে, এরপরেও সহস্র বিলিয়িন তথা অসংখ্য সৌরজগৎ ফাঁকা থেকে যাবে। এত সৌরজগৎ মহান আল্লাহ মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন। মহাশূন্য যে কত বিশাল তা কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে আবিষ্কার করা তো দূরের কথা, এর বিশালতা সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারেনি। মহাশূন্যে রয়েছে অসংখ্য চন্দ্র, সূর্য, তারকাপুঞ্জ, গ্রহ-উপগ্রহ, মিল্কীওয়ে, গ্যালাক্সী এবং ব্লাকহোল। এসবের পরিধি এবং বিশালতা দেখে বিজ্ঞানীগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা যে বিশলতা দিয়ে মহাশূন্য নির্মাণ করেছেন সে তুলনায় এই পৃথিবী একটি ছোট্ট মার্বেলের সমানও নয়। মহাজগতের বিবেচনায় বর্তমানে মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, এই সৌরজগতটি নিতান্তই ক্ষুদ এবং অতি তুচ্ছ একটি অঞ্চল। বিশাল মহাসমুদ্রে একবিন্দু পানি যেমন, মহাবিশ্বে এই সৌরজগতের অবস্থান ঠিক তেমনি। স্বয়ং পৃথিবীর অবস্থা যদি ছোট্ট একটি মার্বেলের মতো হয়

তাহলে ক্ষমতাদর্পী এই মানুষের অবস্থান কোথায় ? মহাশূন্যের তুলনায় মানুষ ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকার মতও নয়। অতএব অস্তিত্বহীন শক্তি আর ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ জীবনের অধিকারী হয়ে মানুষের পক্ষে স্বয়ং আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা চরম বোকামী বৈ আর কিছুই নয়। এ জন্য পৃথিবীর বর্তমানে যারা বিখ্যাত বিজ্ঞানী তারা নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। মহাশূন্যের সৃষ্টিসমূহ আর বিশালতা দর্শন করে তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

মহাকাশে শৃঙ্খলা

পবিত্র কোরআনে আকাশ সম্পর্কে বহু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিভাবে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কেমন করে তার সাংগাঠনিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং কোন পদ্ধতিতে আকাশকে কোন ধরনের স্তম্ভ ব্যতিত যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মানুষকে ধারণা দান করেছে। আকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হননি। তারা প্রকৃত অর্থে আকাশের কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টি এখনো গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। মানুষ সসীম জ্ঞানের অধিকারী। কোন কিছু সম্পর্কে এরা সঠিক জ্ঞানার্জন করতে ব্যর্থ হলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা এদের স্বভাব। আকাশের ঠিকানা আবিষ্কারে ব্যর্থ কেউ কেউ আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেছে, আকাশ বলতে কিছুই নেই। পৃথিবীর ধূলিকণা মহাশূন্যে বায়বিয় স্তরে পুঞ্জিভূত হয় এবং তার ওপরে সূর্যের আলো পতিত হবার ফলে তা নীল দেখায়। প্রকৃত অর্থে আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ এই আকাশের যিনি স্রষ্টা তিনি বলছেন–

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ–

এই দুনিয়ার আকাশখানিকে তারকা প্রদীপ দিয়া, সাজায়ে রেখেছি মনের মতন দেখো তুমি তাকাইয়া। (সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত-৬)

উল্লেখিত আয়াতে পৃথিবীর আকাশ বলতে সেই আকাশকেই বুঝানো হয়েছে, যা আমাদের এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী। যে আকাশকে আমরা কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিতই খালি চোখে দেখে থাকি। এই আকাশ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ যে বিশ্বকে দেখে থাকেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যেসব বিশ্ব এখন পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর

হয়নি সেগুলো সবই দূরবর্তী আকাশ। কোরআনে আকাশ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে 'সাব'আ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার সরল অনুবাদ করা হয়েছে 'সাত আকাশ'। আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য মানুষের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। যে শব্দ ব্যবহার করলে মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হবে, সেই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। কোরআনে কোন জটিলতা রাখা হয়নি। আরবী পরিভাষায় 'আলিফ' বলতে অগণিত কিছু বোঝায়। এখন কেউ যদি এই আলিফ বলতে শুধুমাত্র একহাজার বুঝে, তাহলে সে তার জ্ঞান অনুযায়ী তা বুঝতে পারে। কিন্তু এই আলিফ দিয়ে আল্লাহর কোরআন অসংখ্য অগণিত বুঝিয়েছে।

যেমন সূরা কদরে লাইলাতুল কাদরি মিন আলফি শাহ্‌রে বলতে বুঝানো হয়েছে অসংখ্য অগণিত মাসের থেকেও উত্তম হলো কদরের রাত। আবার কিয়ামত সংঘটিত হবার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে গিয়ে কোরআন 'সুর' শব্দ ব্যবহার করেছে। এই 'সুর' শব্দের অর্থ হলো শিঙ্গা। হযরত ইসরাফিল আলাইহিস্ সালাম শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন, কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। সেই প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্তও কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচারের জন্য ঢেড়া পিটিয়ে বা শিঙ্গা বাজিয়ে মানুষকে একত্রিত করা হয়। এখানো সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করার জন্য বিউগল বাজানো হয়। অর্থাৎ মানুষ এই শিঙ্গা শব্দটির সাথে পরিচিত, এ কারণে কোরআন শিঙ্গা শব্দই ব্যবহার করেছে। এদেশেও কথার মাঝে মানুষ সীমাহীন দূরত্ব বুঝাতে 'সাত সমুদ্দুর তের নদী−সাত তবক আসমান' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করে থাকে। অমূল্য কোনকিছু বুঝাতে 'সাত রাজার ধন' বাক্যটি ব্যবহার করে। এ জন্য আল্লাহর কোরআন অসংখ্য আকাশকে বুঝাতে 'সাব'আ' বা সাত আকাশ শব্দ ব্যবহার করেছে, যেন মানুষ সহজে বুঝতে পারে। সূরা মু'মিনুন-এ আল্লাহ বলেন−

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ-وَمَاكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ-وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنَّهُ فِى الْاَرْضِ-وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُوْنَ-

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপরে অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করেছি। আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে মোটেও অমনোযোগী নই। আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসাব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি। আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে সক্ষম।

মহান আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামীন। তিনি অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি করেই তিনি অবসর গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। কোনটি কিভাবে পরিচালিত হবে, কোন সৃষ্টির কি প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তিনি মোটেও অমনোযোগী নন। তাঁর সৃষ্টি অসংখ্য জগৎ যেন যথা নিয়মে পরিচালিত হয়, এ ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ তা'য়ালা একই সঙ্গে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে বর্ষণ করেছিলেন যা পৃথিবী নামক এই গ্রহটির ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এভাবে পানিকে সংরক্ষণ করার কারণেই নদী, সাগর-মহাসাগর ও জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে, ভূগর্ভেও বিপুল পরিমাণ পানি রিজার্ভ রয়েছে। এই পানিই চক্রাকারে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী-নালা ঝরণা ও কুয়া, ডিপ টিউবওয়েল এই পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে।

মহাকাশের মেঘমালা

অসংখ্য জিনিসের সৃষ্টি ও উৎপাদনে পানির ভূমিকা অপরিসীম। তারপর এ পানি বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে আবার তার মূল ভান্ডারের দিকে ফিরে যায়। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পানির এ মওজুদ ভান্ডারের বিন্দুমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। তিনি কে-যিনি একই সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রিত করে পানির বিশাল ভান্ডার পৃথিবীর অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন ? কোন সে প্রতিপালক-যিনি এখন আর দুটো গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হতে পারে? অথচ এ দুটো পৃথিবীতে মওজুদ রয়েছে। আর পানি যখন বাষ্পাকারে বাতাসে মিশে যায় তখন অক্সিজেন ও হাড্রোজেন কেন পৃথক হয়ে যায় না? যিনি এসব নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পানির জগতকেও তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ-

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, এরপর তার খন্ডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার খোল থেকে বৃষ্টি বিন্দু অবিরাম ঝরে পড়ছে। (সূরা আন্ নূর-৪৩)

পৃথিবী যে অজস্র ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আবাসস্থল ও অবস্থান স্থল হয়েছে, এটা কোন সহজ বিষয় নয়। যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে পৃথিবী নামক এই গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। যারা এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন তারা অনুভব করতে থাকেন যে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণশক্তি সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ব্যতিত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। পৃথিবী নামক এই ভু-গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলন্তাবস্থায় বিদ্যমান।

এটি কোন জিনিসের ওপর ভর করে অবস্থান করছে না। কিন্তু এরপরও এর মধ্যে কোন কম্পন ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তাতে গোটা পৃথিবী যদি কোন কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো, তাহলে এখানে মানুষ বসবাস করতে সক্ষম হতো না। সূরা নমল-এর ৬১ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا-

আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন (পর্বতমালার) পেরেক, আর পানির দুটো ভান্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

মহাশূন্যে বাতাসের ঘনস্তর

পৃথিবী নামক এই গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সম্মুখ ভাগে একবার আসে এবং আবার পিছনের দিকে সরে যায়। এরই ফলে দিন ও রাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি পৃথিবীর একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে অবস্থান করতো এবং অন্য দিকটি সময় সময় সূর্যের আড়ালে অবস্থান করতো, তাহলে এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বসবাস

করতে সক্ষম হতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচন্ড উত্তাপ পৃথিবীর সূর্যের দিকে একইভাবে অবস্থানরত অংশকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণহীন করে দিতো।

উল্কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এই ভূ-মন্ডলের প্রায় আটশত কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত বাতাসের একটি ঘনস্তর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি এ ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে প্রতিদিন কোটি কোটি বিশালাকারের উল্কাপিন্ড প্রতি সেকেন্ডে আট চল্লিশ কিলোমিটারেরও অধিক গতিতে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। এর ফলে পৃথিবীতে যে ধ্বংস লীলা সাধন হতো তাতে করে মানুষ, পশু-প্রাণী, বৃক্ষতরু-লতা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না। সমস্ত কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চর্বিত তৃণের ন্যায় ধারণ করতো।

মহাকাশে পাথরের সাম্রাজ্য

এই পৃথিবীতেই শুধু পাথরের খনি বিদ্যমান নেই, আল্লাহ তা'য়ালা যে আরো অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানেও পাথর বিদ্যমান। মাহশূন্য সম্পর্কে যাদের সামান্য লেখাপড়া রয়েছে, তারা এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, মহাশূন্যে বিশালাকারের একটি পাথরের জগৎ রয়েছে। মহাকাশে শূন্যতার মহাসমুদ্রে ভাসমান পাথরের জগৎ বিদ্যমান।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্য বলয়ে এসটিরয়েড ও মিটিওরিট বেল্ট রয়েছে। এটাই হলো এককভাবে পাথরের জগৎ। এ ছাড়াও প্রায় প্রতিটি গ্রহেই পাথর রয়েছে। মহাশূন্যে ভাসমান পাথরের এই জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ জানতে পেরেছেন মাত্র উনিশ শতকে। অথচ আল্লাহর কোরআন এ জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেশ করেছে সেই সপ্তম শতাব্দীতে।

আল্লাহর কিতাবের সূরা জ্বিন-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে মহাশূন্যে পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞান অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে রয়েছে একটি সুবিশাল পাথরের বেল্ট, একটি ভাসমান পাথরের জগৎ। পাথরের এই জগৎ নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ মারাত্মক শঙ্কিত রয়েছেন। কি জানি, কখন কি অবস্থায় এসব পাথর পৃথিবীর দিকে সেকেন্ডে শত শত কিলোমিটার গতিতে ছুটে এসে আঘাত হেনে মানব সভ্যতাকে অস্তিত্বহীন করে দেয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই আকাশে যে শতকোটি নানা ধরনের জগৎ বিদ্যমান, এসব জগতই একদিন পৃথিবী নামক গ্রহটির সর্বনাশ করে ছাড়বে। হয়ত তাদের ধারণা একদিন বাস্তবে পরিণত হলে হতেও পারে। কারণ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আল্লাহর আদেশে সমস্ত আকর্ষণ বলয় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে মহাশূন্যে শতকোটি বিশালাকারের গ্রহ-উপগ্রহ পরিচালিত করছেন, সে আকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব থাকবে না, তখন তা পৃথিবীতে পতিত হবে।

বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, সুমেকার লেভী-৯ নামক একটি গ্রহের মাত্র একুশটি পাথর নিপতিত হয়েছিল বৃহস্পতি গ্রহের ওপর। যার ক্ষমতা ছিল প্রায় আড়াই কোটি মেগাটন টিএনটি'র ধ্বংযজ্ঞের। ছয়শত পঞ্চাশ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে একবার প্রায় দশ কিলোমিটার ব্যাসের একটি ঝুলন্ত পাথর আঘাত করে এক মহাধ্বংস যজ্ঞের সূত্রপাত করেছিল।

জীব বিজ্ঞানীদের ধারণা সে আঘাতেই বিরাটাকারের প্রাণী ডাইনোসোর পৃথিবী থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের মাঝে অসংখ্য পাথরের দল মহাশূন্যে চলমান অবস্থায় রয়েছে। এগুলো পৃথিবীতে পতিত হচ্ছে না। কে এগুলোর পতন রোধ করেছেন ? আল্লাহ বলেন–

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ-وَحِفْظًا-ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

আর পৃথিবীর আকাশকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সুরক্ষিত করে দিলাম। এসবই এক মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা।(সূরা হামীম আস সাজদাহ্–১২)

মহাশূন্য থেকে শুধু উল্কাই নয়, এমন অসংখ্য রশ্মি পৃথিবীর দিকে প্রতি মুহূর্তে ছুটে আসছে যে, তা পৃথিবীতে পতিত হবার সুযোগ পেলে মুহূর্তে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি প্রাণী বসবাসের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর আকাশকে সুরক্ষিত ছাদের মতো না করলে সূর্য থেকে আগত সৌর ঝন্‌ঝা পৃথিবীর ওপরে প্রচন্ড উত্তাপ আর ঝড়ের ধ্বংস আঘাত হানতো যে, পৃথিবীর বুকে কোন জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। শুধু তাই নয়,

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে এসটিরয়েড ও মিটিওরের বেল্ট থেকে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় কমবেশী ত্রিশ লক্ষ উল্কা পতিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে। কোন সে বিজ্ঞানী যিনি বিশালাকারের উল্কাগুলো মহাশূন্যের গ্যাসীয় বলয়ে মিশিয়ে দিচ্ছেন ? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا–আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ। (সূরা আল আম্বিয়া–৩২)

মহাকাশে বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য ছাতা

রাব্বুল আলামীন বায়ু মন্ডলে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য অথচ দৃঢ় ছাদই ক্ষতিকর বিকিরণ ছেঁকে যা পৃথিবীর পরিবেশের জন্য কল্যাণকর সেসব রশ্মি প্রবেশ করতে দেয়। এক্সরে আয়নোস্ফিয়ারে, আলট্রাভায়োলেট স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে, মাত্রাতিরিক্ত অবলোহিত রশ্মি ট্রপোস্ফিয়ারে বিশোষিত হয়ে যায়।

শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় রশ্মিরাই প্রতিপালন ব্যবস্থায় বিস্ময়করভাবে পৃথিবী পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে সোলার উইন্ড এবং লক্ষ লক্ষ উল্কাপতনের কবল থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এই অদৃশ্য ছাদই প্রতিরোধ্যতায় অটল-অবিচল। আল্লাহ তা'য়ালা বাতাস সৃষ্টি করেছেন। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। বাতাসের অনুপস্থিতিতে এ পৃথিবী কোন প্রাণী বসবাসের উপযোগী অবস্থান স্থলে পরিণত হতো না।

এই ভূ-মন্ডলের ভূ-ত্বকের নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খনিজ ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করেছেন। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। পৃথিবীর যে অঞ্চলে এসবের অবস্থান নেই, সে অঞ্চলের ভূমি জীবন ধারনের উপযোগী নয়।

পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতে নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, হ্রদ, ঝরণা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভান্ডার গড়ে তুলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পাহাড়ের ওপরও পানির বিশাল ভান্ডার ঘনীভূত করে এবং পরবর্তীতে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তিনি রব্ব, এ ব্যবস্থা যদি তিনি না করতেন, তাহলে পৃথিবী নামক গ্রহ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতো না। আবার এই পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব বস্তুর অবস্থান রয়েছে সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এই গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করা

হয়েছে। এ মধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের থেকে কম হতো তাহলে পৃথিবী বাতাস ও পানি শূণ্য হয়ে যেতো এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি লাভ করে এমন প্রচন্ড আকার ধারণ করতো যে, প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো।

মাধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হতো, তাহলে বাতাস এতটা ঘন হয়ে যেতো যে, কোন প্রাণী নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারতো না, মৃত্যু ছিল অনিবার্য। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি লাভ করতো এবং জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হতো না, ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হতো না, শীতলতা বৃদ্ধি লাভ করতো, ভূ-পৃষ্ঠের কোন এলাকাই বাসযোগ্য হতো না বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এতটা বৃদ্ধি লাভ করতো যে, তাদের পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হতো না।

রাব্বুল আলামীন পৃথিবী নামক এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দুরত্বে রেখেছেন। এরচেয়ে কম দূরত্বে যদি রাখতেন, তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে নিঃশেষে ভষ্ম হয়ে যেতো। যদি অধিক দূরত্বে রাখতেন তাহলে পৃথিবী প্রচন্ড ঠান্ডায় বরফে পরিণত হতো। প্রতিটি জগতকে যিনি সঠিক পরিমাপে নির্দিষ্ট কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করার ব্যবস্থা করেছেন, তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

গ্রহসমূহ কক্ষপথে সন্তরণশীল

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এসব জগৎ তিনি ঠিকানা বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেননি। প্রতিটি জগত-ই তার নির্দিষ্ট গতি পথে পরিভ্রমণ করছে। সূরা ইয়াছিনের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ–وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ–

সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাতের ক্ষমতা নেই দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে, সবাই এক একটি কক্ষ পথে সন্তরণ করছে।

সুদূর অতিত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষ যে জ্ঞানার্জন করেছে, এটাই শেষ না এর পরেও আরো কিছু জানার অবশিষ্ট আছে? এ

কথা দৃঢ়তার সাথে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে, জ্ঞানের শেষস্তর পর্যন্ত সে পৌছতে সক্ষম হয়েছে। চূড়ান্ত কথা তখনই বলা সম্ভব হবে, যখন বিশ্বজগতের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞানের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এটাই যে, মানুষের অর্জিত জ্ঞান প্রতিটি যুগে পরিবর্তনশীল ছিল এবং বর্তমানেও মানুষ যে জ্ঞানার্জন করেছে, যে কোন সময় তা পরিবর্তন হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্য সম্পর্কে মানুষ যুগে যুগে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণ করেছে। এক সময় লোকজন চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে সূর্য সম্পর্কে এ নিশ্চিত বিশ্বাস অন্তরে লালন করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এ ধারণা কিছু দিন প্রতিষ্ঠিত থাকার পর বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে এ ধারণা আবার প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সূর্য তার নিজের অবস্থানে স্থির রয়েছে এবং গোটা সৌরজগৎ তাকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে।

কালের আবর্তনে উল্লেখিত ধারণা স্থায়ী হলো না। পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হলো যে, শুধু সূর্যই নয়, মহাশূন্যে যা রয়েছে, তা সবই একদিকে ছুটে চলেছে। যে যার কক্ষপথে সঞ্চালনশীল। এসব কিছুর চলার গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে ষোল কিলোমিটার থেকে একশত একষট্টি কিলোমিটার পর্যন্ত। আল্লাহর কিতাবের সূরা ইয়াছিনের উক্ত আয়াতে যে 'ফালাক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ এবং আকাশের অর্থ থেকে ভিন্ন। আয়াতে বলা হয়েছে, সমস্ত কিছুই কক্ষপথে সন্তরণশীল। মুফাচ্ছিরগণ এ আয়াতের চার ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কেউ বলেছেন, শুধুমাত্র চন্দ্র, সূর্য নয়–বরং সমস্ত তারকা ও গ্রহ এবং সমগ্র আকাশ জগৎ আবর্তন করছে। আবার কেউ বলেছেন, এদের প্রতিটির আকাশ অর্থাৎ প্রতিটির আবর্তন পথ বা কক্ষপথ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আকাশসমূহ তারকারাজিকে নিয়ে আবর্তন করছে না বরং তারকারাজি আকাশসমূহে আবর্তন করছে। কারো ব্যাখ্যা হলো, আকাশসমূহে তারকাদের আবর্তন এমনভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে, যেমন কোন তরল পদার্থে কোন বস্তু ভেসে চলে, ঠিক তেমনি মহাশূন্যে সমস্ত কিছুই ভেসে চলছে।

যে বা যিনি যে ধরনের ব্যাখ্যাই দিন না কেন, একটি কথা স্মরণে রেখে আল্লাহর কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে যে, কোরআন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য

অবতীর্ণ হয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের বিষয়সমূহ উপস্থাপন করতে গিয়ে সৃষ্টির বিভিন্ন দিকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর ভেতর দিয়েই বিজ্ঞানের নানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, কোরআন নিরেট বিজ্ঞানের কিতাব।

বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার অর্থ হলো, মানুষকে এ কথা বুঝানো যে, যদি সে সমস্ত কিছুর ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং নিজের জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে তাহলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই তার সামনে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের অসংখ্য ও অগণিত যুক্তি-প্রমাণের এক বিশাল সমাবেশ দেখতে সক্ষম হবে।

এসব সৃষ্টিসমূহের ভেতরে মানুষ কোথাও আল্লাহর অস্তিত্বহীনতার ও অংশীদারিত্বের স্বপক্ষে সামান্যতম যুক্তি ও প্রমাণও অনুসন্ধান করে পাবে না। তিনি অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এসব যথা নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এ জন্যই করা হয়েছে যে, কোন সুদক্ষ স্রষ্টা ব্যতিত এসব কি এমনিতেই চলতে পারে ? শতকোটি জগৎ একটি নিয়মের অধীনে চলছে, স্রষ্টার যদি কোন অংশীদার থাকতো, তাহলে এসব পরিচালনা করতে গিয়ে অবশ্যই মতানৈক্য ঘটতো এবং তার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই মানুষ দেখতে সমর্থ হতো।

সুতরাং কোথাও যখন কোন অনিয়ম মানুষের চোখে পড়ছে না, তখন এ কথা কি অনুভব করতে অসুবিধা হয় যে, সৃষ্টি জগতসমূহের পেছনে একজন স্রষ্টা রয়েছেন এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয় ? সমস্ত কিছুই যখন একটি নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন কি এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয়, পৃথিবীর মানুষেরও একটি পরিণতি রয়েছে ? তোমরাই বলছো, সমস্ত কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে–এসব ধ্বংসের পরে তাঁর পক্ষে এসব আবার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি অসম্ভব ? প্রথমবার যিনি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বদান করেছেন, দ্বিতীয়বারও তো তিনি অস্তিত্বদান করতে সক্ষম–এই সহজ সরল কথাটি তোমাদের মাথায় প্রবেশ করে না ? সুতরাং আখিরাত অবশ্যম্ভাবী–এ কথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

ছায়াপথই গোটা সৃষ্টিজগৎ নয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহুমাত্রিক জগতের ধারণা দিয়ে অবিশ্বাসীদের সামনে তাঁর অস্তিত্বই প্রকাশ করেছেন। এসব দেখেও যারা তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর একত্বে, রিসালাতের ওপরে, আখিরাতের প্রতি সংশয়যুক্ত মানসিকতা লালন করবে, তাদেরকে কপাল পোড়া ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে। আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরজগতের অন্তরভুক্ত তার বিশালত্বের অবস্থা হলো এই যে, তার কেন্দ্রীয় সূর্যটি পৃথিবীর ভরের তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার আট শত গুণ। আর সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের একশত নয় গুণ। ঘনত্ব একহাজার চারশত দশ গ্রাম বা ঘন সেন্টিমিটার।

সূর্যের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ–যার নাম দেয়া হয়েছে নেপচুন, সূর্য থেকে এর দুরত্ব কমপক্ষে দুই শত উনআশি কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। বরং যদি প্লুটো নামক গ্রহটিকে দূরবর্তী গ্রহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে সূর্য তার দূরত্ব চারশত ষাট কোটি মাইলে গিয়ে উপনীত হয়। এত বড় বিশাল হবার পরও এ সৌরজগৎ একটি বিরাট বিশাল গ্যালাক্সী বা ছায়াপথের নিছক একটি ছোট্ট অংশ মাত্র।

মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, এই সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সী বা ছায়াপথটির অন্তরভুক্ত তার মধ্যে প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন অর্থাৎ তিনশত কোটি সূর্য রয়েছে এবং সে সূর্যের সবচেয়ে কাছের সূর্যটি এই পৃথিবী থেকে এতদূরে অবস্থান করছে যে, তার আলো পৃথিবীতে পৌছতে চার বছর সময়ের প্রয়োজন হয়।

এই ছায়াপথই গোটা সৃষ্টিজগৎ নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীগণ যে অনুমান করেছেন, তাহলো প্রায় বিশ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে এই ছায়াপথও একটি এবং ঐ বিশ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের ভেতর থেকে সবচেয়ে কাছের নীহারিকা এত দূরে অবস্থিত যে, তার আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌছতে দশ লক্ষ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের যে নীহারিকাটি দেখেছেন, তার আলো পৃথিবীতে পৌছতে দশকোটি বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। তারা বলছেন, এটাই শেষ নয়–এরপরও আরো অসংখ্য জগৎ রয়ে গিয়েছে, অসংখ্য নীহারিকা রয়ে গিয়েছে, যেগুলো বিজ্ঞানীদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এখনো ধরা পড়েনি। ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হলে, তার সাহায্যে অনেক কিছুই দেখা যেতে পারে। সুতরাং এ যাবৎ বিজ্ঞানীগণ

আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে নমুনা দেখেছে, তার তুলনা করা যেতে পারে, গোটা পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার মধ্যে মাত্র একটি বালুকণার সাথে। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির তুলনা যদি পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার সাথে করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানীগণ মাত্র একটি বালুকণার সমান অংশের সন্ধান পেয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যেসব উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং যে নিয়মের অধীন, গোটা সৃষ্টি জগতসমূহ সেই একই উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং সেই একই নিয়মের অধীন। পার্থক্য রয়েছে শুধু পরিবেশের। পৃথিবী সৃষ্টির উপাদান ও অন্যান্য জগৎ সৃষ্টির উপাদান যদি একই না হতো, তাহলে এই পৃথিবীতে অবস্থান করে মানুষ যে অতি দূরবর্তী জগতসমূহ পর্যবেক্ষণ করছে, দূরত্ব পরিমাপ করছে এবং তাদের গতির হিসাব বের করছে, এসব করা কখনো সম্ভব হতো না।

সমস্ত সৃষ্টি জগতে একই ধরনের উপাদান ও নিয়ম কার্যকর রয়েছে বলেই বিজ্ঞানীদের পক্ষে এসব করা সম্ভব হচ্ছে। সমস্ত জগতে যে নিয়ম-শৃংখলা, প্রজ্ঞা-দক্ষতা, কলাকৌশল, শিল্পকারিতা, সৃষ্টির নিপুণতা, নান্দনিক সৌন্দর্য, উন্নত রুচির প্রকাশ, নিঁখুত শিল্পকর্ম, একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক এবং অগণিত গ্যালাক্সী ও তাদের মধ্যে সঞ্চরণশীল শত শত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে দেখা যায়, এসব দেখে কি কোন জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিমান মানুষ এ কথা কল্পনা করতে পারে যে, এসব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে ? এসব নিয়ম-শৃংখলার পেছনে কোন ব্যবস্থাপক, কোন কৌশলী শিল্পী, কোন মহাবিজ্ঞানী এবং মহাপরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব অনুপস্থিত?

বিজ্ঞানীদের এসব আবিষ্কার ও কার্যাবলীই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সৃষ্টি জগতসমূহের স্রষ্টা আছেন এবং তিনি একজন। একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন মাত্র একটি সত্তাই সমস্ত সৃষ্টিজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন—আর তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন—সৃষ্টি জগতসমূহের রব—প্রতিপালক।

সূর্য অতি নগণ্য প্রকৃতির নক্ষত্র

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বিশ হাজার কোটি তারার মধ্যে একটি মধ্যম ধরনের তারা হলো সূর্য। এই সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সৌরজগৎ গড়ে উঠেছে। সৌরজগতে যতো কিছু রয়েছে তার নিরানব্বই দশমিক পঁচাশি ভাগই সূর্যের দখলে রয়েছে। এই সূর্যের থেকেও লক্ষ কোটি গুণ উজ্জ্বল আলো সম্পন্ন কোয়াসার ঊর্ধ্ব জগতে বিদ্যমান রয়েছে। মহাবিশ্বের পরিমাপে সূর্য অত্যন্ত নগণ্য প্রকৃতির নক্ষত্র যার উজ্জ্বলতাও অত্যন্ত নগণ্য। সূর্যের থেকেও পঞ্চাশ গুণ বড় এবং চল্লিশ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের নাম বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন, 'ইটা ক্যারিনা'। মহাশূন্যে অসংখ্য গ্যালাক্সি রয়েছে এবং নিত্য নতুন গ্যালাক্সি সৃষ্টি হচ্ছে।

এ ধরনের এক একটি গ্যালাক্সির ভেতরে সূর্যের থেকেও বিশাল আকৃতির অগণিত নক্ষত্র প্রবেশ করার পরও অসংখ্য জায়গা শূন্য রয়ে যাবে। সূর্যের চেয়ে বিশালাকৃতির আরেকটি তারকার নাম হলো 'বেটলজিয়ুজ'। এই বেটলজিয়ুজ নক্ষত্রের মধ্যে বর্তমান সূর্যের মতো পঞ্চাশ কোটি সূর্য অবস্থান করতে পারে। এ ধরনের অসংখ্য নক্ষত্র আল্লাহ তা'য়ালা গ্যালাক্সির ভেতরে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল তারকা ঊর্ধ্বাকাশে রয়েছে। এসব এক একটি তারকা একটির কাছ থেকে আরেকটি কত দূরে অবস্থিত ? একটি তারকা থেকে আরেকটি তারকায় পৌঁছতে সহস্র সহস্র বিলিয়ন আলোকবর্ষের প্রয়োজন হবে। অথচ আলোর গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পৃথিবী থেকে তের লক্ষ গুণ বড় হলো সূর্য, আর এ ধরনের পঞ্চাশ কোটি সূর্যের থেকেও বড় হলো বেটলজিয়ুজ তারকা।

মহাকাশে ব্লাকহোল

এসব তারকার থেকেও বিশাল দানব আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিজ্ঞানীগণ সেগুলোর নাম দিয়েছেন 'ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ'। এই ব্লাকহোল সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ-وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ-

শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তোমরা যদি জানতে তা এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ। (সূরা ওয়াকিয়া-৭৫-৭৬)

এই ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ এক অদৃশ্য দানবীয় শক্তি। নক্ষত্র তা যতো বড়ই হোক না কেন, পরিভ্রমণ করতে করতে তা এই ব্লাকহোলের রেঞ্জের মধ্যে বা আওতায় এসে গেলে, এমনভাবে শোষণ করে নেয় যে, তার আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের ব্লাকহোল মহাশূন্যে দু'একটি নয়, আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য ব্লাকহোল সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞানীগণ বলেন, আমাদের এই পৃথিবী কোনভাবে যদি ব্লাকহোলের আওতায় এসে পড়ে, তাহলে মুহূর্তের ভেতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ব্লাকহোল এই বিশাল পৃথিবীকে সংকুচিত করে এমন এক ক্ষুদে পিন্ডে পরিণত করবে যে, এর ব্যাসার্ধ হবে মাত্র এক সেন্টিমিটার। এই সৌরজগতের আয়তনের সমান একটি ব্লাকহোল শত লক্ষ কোটি সূর্যকে মুহূর্তে সংকুচিত করে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

মহাকাশে কোয়াসার

মহাকাশের রহস্যময় আবেগদীপ্ত জ্যোতিষ্কের নাম বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন 'কোয়াসার'। এই কেয়াসারের আলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিয়েছে। অথচ সৌরজগতের সবচেয়ে কাছের কোয়াসার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময়ের প্রয়োজন হয় দেড় শতকোটি বছর। আর দূরতম কোয়াসার থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছতে সময়ের প্রয়োজন হবে এক হাজার কোটি বছর।

বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেছেন, বর্তমান পৃথিবীর বয়স হলো চারশত ষাট কোটি বছর। তাহলে দূরতম কোয়াসার পৃথিবীতে পৌঁছবে আরো পাঁচশত কোটি বছর পরে। এই বিশাল ও উজ্জ্বল আলো সম্পন্ন কোয়াসারের সংখ্যা মহাকাশে অগণিত। এক একটি ধুমকেতুর কাছে ঐ বিশালাকের সূর্য ছোট্ট একটি বালুকণার মতো। সৃষ্টির শুরু থেকে এসব বিশাল আকৃতির জগৎ সেকেন্ডে শতকোটি কিলোমিটার গতিতে বিরামহীনভাবে একদিকে ছুটে চলেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে ছুটতেই থাকবে, ধ্বংস না পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। তবুও তা গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য সৃষ্টিজগতের রব। শুধুমাত্র তিনি মহাকাশেই কত বিশাল জায়গা সৃষ্টি করেছেন, তা কল্পনাও করা যায় না।

আদিতে আকাশ ও পৃথিবী সংযুক্ত ছিল

বিজ্ঞানীদের ধারণানুসারে আমাদের এ মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ হতে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে প্রচণ্ড ঘনায়নকৃত এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে Big Bang নামক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে–

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ–

অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (একে অপরের সাথে) পরস্পর সংযুক্ত ছিল, পরে আমি তাদের পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে আমি সৃষ্টি করেছি পানি হতে। তারপরও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (আম্বিয়া ঃ ৩০)

বিগ-ব্যাংগ বিন্দু হতে পর্যায়ক্রমে ৪টি ধাপ অতিক্রম করার পর 'শক্তি' পদার্থ কণার ধুঁয়ার অস্তিত্ব লাভ করে এবং মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বিভক্ত হয়ে নবীন মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যা পরবর্তীতে 'নেবুলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ–

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস-ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে। (হা-মীম সাজদা-১১)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন– هُوَالَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ–

তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। (মু'মিন-১৩)

শত-সহস্র লক্ষ মাইল ব্যাসের নক্ষত্রসমূহ মহাকাশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উত্তপ্ত ধূলা-বালি, অগ্নিশিখা ও মৌলিক পদার্থের গলিত মিশ্রণ দিয়ে শত–শত আলোকবর্ষ এলাকা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বর্তমান বিজ্ঞান এ ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিবেশ জয় করার জ্ঞান এখনও লাভ করতে পারেনি।

চন্দ্র ও সূর্যের সম্পর্ক

চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম মহাকাশীয় জ্যোতিষ্ক ও প্রাকৃতিক উপগ্রহ। এর ব্যাস প্রায় দুই হাজার মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মাত্র। পৃথিবী হতে গড়ে প্রায় দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔

আর সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। (নূহ ঃ ১৬)

বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের মানবসমাজ হতে বেশ কয়েকজনকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করাতে বাস্তবভাবে সফল হয়েছে। সাথে সাথে চন্দ্রের সর্ববিষয়ে লক্ষ লক্ষ বাস্তব ছবি পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছে। তাতে বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল নেই এবং সে কারণে চাঁদ নিজ দেহকে মহাজাগতিক পাথরখণ্ড বা গ্রহাণুদের সরাসরি আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারে না। সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠটি মহাকাশীয় পাথর এবং ধূমকেতুর আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্ন দিয়ে ভরপুর হয়ে রয়েছে। এ ক্ষতচিহ্নমূলক অধিকাংশ পুরানো গর্তগুলো গলিত লাভা দিয়ে প্রায় ভরে আছে। চাঁদের গঠন হচ্ছে কঠিন অমসৃণ মাটি ও পাথরস্তূপ দিয়ে। জলবায়ু না থাকায় ব্যাপকভাবে রুক্ষ ও বন্ধুর হয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞান অবহিত করছে, যখন কোন পাথরখণ্ড বা গ্রহাণু মহাশূন্য হতে চাঁদের মধ্যাকর্ষণের কারণে তার পৃষ্ঠের দিকে সবেগে ছুটে আসতে থাকে তখন চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল না থাকায় এরা বিনা বাঁধায় এত প্রচণ্ড গতিতে চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত হানে যে, পতিত স্থানে কল্পনাতীত ধাক্কায় 'Fusion' পদ্ধতিতে পারমাণবিক বোমার মত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে ব্যাপক তাপের সৃষ্টি হওয়ায় পতিত স্থানে মুহূর্তেই বিরাট অগ্নিগোলকের সৃষ্টি হয়। অগ্নিগোলকের প্রচণ্ড তাপে চাঁদের শক্ত-কঠিন মাটি, পাথর সব গলে গিয়ে উত্তপ্ত লাভায় পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ–

সূর্য এবং চন্দ্র (মহান আল্লাহ্‌র) গণনায় নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। (সূরা রাহ্‌মান-৫)

কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান

পবিত্র কোরআনে সূরা লুকমানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ–هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ–

তিনি (আল্লাহ) মহাকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন কোন রকম স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনিই (আল্লাহ) পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে সর্বপ্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রকার উত্তম জোড়া উৎপাদন করেন। এ আল্লাহর সৃষ্টি, তিনি ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। বরং সীমালঙ্ঘনকারীরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে। (লুকমান-১০-১১)

আল্লাহ তায়ালা এই বিশাল আকাশটি সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই। একটি প্যান্ডেল তৈরি করতে হলে শত শত খুঁটির প্রয়োজন দেখা দেয় ; কিন্তু এই বিশাল আকাশটি খুঁটি ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা রেখেছেন। بغير عمد ترونها এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ যে, কোন স্তম্ভ ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা আকাশটাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন স্তম্ভ আছে, যা তোমরা দেখতে পাওনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু বর্তমান যুগের পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় তাহলে এভাবে বলা যেতে পারে যে, সমগ্রবিশ্ব, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, এগুলোর একটি থেকে আরেকটি যেন ছিটকে না পড়ে সে জন্য একটি পদ্ধতি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা স্তম্ভ ছাড়াই কুদরতের ওপর রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا–

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে

—১৯

রেখেছেন, যেন একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। (সূরা ফাত্বির- ৪১)

এ পৃথিবী থেকে সূর্য অনেক বড়। সে সূর্যের চেয়ে তারকাগুলো আরো বড়। আবার তারকাগুলোর চেয়ে ছায়াপথ আরো অনেক বড়। এই বিশাল বিশাল গ্রহ-উপগ্রহগুলো আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে একটিকে আরেকটির সাথে আটকিয়ে রেখেছেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন সর্বপ্রথম মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু স্যার আইজ্যাক নিউটনের জন্মের অন্তত হাজার বছর পূর্বে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি কোন বিজ্ঞানাগারে লেখাপড়া করেননি, রিসার্চ করেননি, তাঁর মুখ থেকে মধ্যাকর্ষণের কথা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে ঘোষণা করেছেন।

এই মধ্যাকর্ষণ দিয়েই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, সৌররাজি একটির সাথে আরেকটিকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে, যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে না যায়। আল্লাহ তায়ালা মহাশূন্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে যদি সূর্যের কথাই বলা যায়, তাহলে সূর্য এত বিশাল যে, পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। এ রকমের তিন কোটি সূর্যকে খেয়ে হজম করতে পারবে এমন আরো রয়েছে গ্যালাক্সির ভেতরে একটি দুটি নয়, হাজার হাজার সূর্য। এই সূর্য হচ্ছে সে সূর্য যা পৃথিবীর মানব সভ্যতার বিকাশের জন্য আজ পর্যন্ত মানবগোষ্ঠী যত শক্তি ব্যয় করছে সূর্য তার চারদিকে ঘুরতে প্রতি সেকেন্ডে সে পরিমাণ শক্তি খরচ করছে।

শুধু তাই নয়, এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকার জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়। এগুলো প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই গ্যাস যদি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করত, তবে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে যে গ্যাস বের হচ্ছে– কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি ষাট হাজার মাইল বেগে সে গ্যাসকে আবার সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। যেন সৃষ্টিজগৎ কোন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ–

আমি আমার সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে অমনোযোগী নই।

এ পৃথিবীতে চন্দ্র এবং সূর্যকে পরিমাপ অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা রেখেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছে সূর্য যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এর থেকে যদি কয়েক ডিগ্রী ওপরে

উঠে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী বরফে পরিণত হয়ে যাবে। সমস্ত প্রাণীজগৎ বরফ হয়ে যাবে। আর যদি কয়েক ডিগ্রী নিচে নেমে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

চাঁদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে যদি কিছু অংশ ওপরে উঠে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যাবে। আবার যদি কিছু অংশ নিচে নেমে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী পানিতে তলিয়ে যাবে। هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি যেন পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে না পারে, সে জন্য ওজোন স্তরে লেয়ার দিয়েছেন। এই লেয়ার আছে বলেই আলট্রাভয়োলেট-রে পৃথিবীর মাটিতে আসে না। আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টি জগৎকে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু ওজোনের স্তরে ফাটল ধরেছে। কারণ হচ্ছে আমরা পরিবেশ দূষিত করেছি, পাহাড়গুলো কেটে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করেছি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি পাহাড়গুলোকে গেড়ে দিয়েছি যেন যমীন নড়া-চড়া করতে না পারে। আর মানুষেরা পাহাড় গাছ-গাছালি কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ সে পরিমাণ গাছ লাগানো হচ্ছে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গাছ লাগালে সদকার মত সওয়াব মিলে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ–

তোমাদের ওপরে যত বিপদ আসে সমস্ত বিপদ তোমাদের দু'হাতের উপার্জন করা, তোমরা যা উপার্জন কর সেটাই তোমাদের কাছে ফিরে আসে।

আল্লাহর নবী বলেছেন, গাছ কাটাতো দূরের কথা, গাছের পাতাটিও ছিঁড়বে না। প্রয়োজনে গাছ কাটতে পার বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতাটিও ছিঁড়বে না। কারণ গাছের পাতাগুলো আল্লাহর তাসবীহ পড়ছে। মহান আল্লাহ বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ–

আকাশে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ পাঠ করছে।

গাছ হল মানুষের প্রাণ। গাছ অক্সিজেন ছাড়ে আর আমরা সে অক্সিজেন গ্রহণ করি। আর আমরা যেটা ছাড়ি সেটা হল কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমরা কার্বন

ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দিয়ে গোটা পরিবেশকে দূষিত করে ফেলছি। দুনিয়ার কোন বিজ্ঞানী বা সরকার নেই যে, এ দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইডকে রিফাইন করে দূষণ মুক্ত করবে। গাছগুলোকে আল্লাহ্ তায়ালা এমন বন্ধু বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জন্য যেটা বিষ গাছের জন্য সেটা খাদ্য। আমরা গাছ হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে আমাদের বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেই, গাছ ঐ বিষাক্ত অক্সিজেনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। গাছের পাতার সবুজ রং আর সূর্যের তাপ দুটি মিলে এক প্রকারের রন্ধন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গাছ ঐ কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে প্রতি মুহূর্তে অক্সিজেন তৈরি করে ছেড়ে দিচ্ছে। এগুলোকে আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করে গোটা মানব জাতির কল্যাণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন−

فاروني ماذا خلق الذين من دونه−

এখন দেখাওতো অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানীরা কয়েকটি জিনিস একত্র করে একটি জিনিস তৈরি করেছেন।

কিন্তু মূল জিনিস হল আল্লাহ্ তায়ালার। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়েও একটি চাল বানাতে পারবে না। একটি মুরগীর ডিম বানাতে পারবে না। বিজ্ঞানীরা যা কিছু তৈরি করে তার পেছনে মহান আল্লাহর তৈরি করা জিনিস না হলে বানাতে পারবে না।

তাওহীদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ্ তাঁর নিজের সৃষ্টির উপমা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন− وما الله بظلام للعبيد তিনি বান্দার ওপরে কখনো জুলুম করেন না। তিনি মানুষের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেন না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন−

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِه حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا−

কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও যমীন? কে আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন? অতঃপর তা দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন? তাঁর বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এ সকল কাজে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কি কোন অংশীদার আছে? বরং এরা সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্ বলেন−

اَمَّنْ جَعَلَ الاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا-

কে এ যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন? কে এর মাঝে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন? কে তাতে সুদৃঢ় পর্বত ও দু'সাগরের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন? মহান আল্লাহ যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। জমি এভাবে শক্ত করলেন না, যেন কোদাল দিয়ে খনন করে পিলার উঠাতে না পারে। আবার এমন নরমও করলেন না, যাতে কোন গাছ রোপণ করা না যায়।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–তোমরা কি দেখ না? তোমরা কি চিন্তা কর না? বীচি মাটির ভেতরে দিয়ে দিলে আর মাটি ফেটে গিয়ে নরম পাতা উদ্গাত হয়ে গেল। মাটি থেকে কে এই পাতা উদ্‌গত করল? মাটি এমনভাবে সৃষ্টি করলেন যে, ছোট দু'টি পাতা মাটি ফেড়ে উপরে চলে আসতে পারে। আবার একশ' চল্লিশ তলা বিল্ডিং বানাচ্ছেন মাটি ধ্বসে বিল্ডিং মাটির নিচে চলে যাচ্ছে না। এভাবে মাটিকে বসবাসের উপযোগী করে কে বানালেন? আল্লাহ বলেছেন আমি বানিয়েছি।

পানিকে আল্লাহ তায়ালা দু'ভাগে ভাগ করে দিলেন। একদিকে লোনা পানি, অন্যদিকে মিষ্টি পানি। তাও কি চোখে দেখ না? চোখে দেখে না নাস্তিক এবং মুরতাদরা, ওদের চোখে ধরা পড়ে না? কিন্তু ঈমানদারদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় রেকর্ড করা হয় যে বইতে তার নাম গ্রীনিজ বুক। সে বইতে লেখা আছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের ভেতরে একটি নদী আবিষ্কার হয়েছে। সে নদীটি আড়াইশ' মাইল প্রস্থ চার হাজার মাইল দীর্ঘ। তার পানি মিষ্টি। চতুর্দিকের লোনা পানির সমুদ্রের মাঝখানে এই বিরাট নদী। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيَانِ-

তিনি প্রবাহিত করেন দু'টি সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত; কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।

মাঝখানে কোন বাধা নেই। অথচ লোনা পানির কোন ক্ষমতা নেই মিষ্টি পানিকে লোনা বানায়। এগুলো চোখে দেখ না? মহান আল্লাহ বলছেন–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

এই যে নদীর পানিকে আল্লাহ তায়ালা ভাগ করে দিলেন এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কেউ শরীক ছিল? বরং তোমরা এ ব্যাপারটি অনুধাবন কর না, বুঝতে চেষ্টা কর না।

মহান আল্লাহ বলেছেন–

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الاَرْضِ–

এমন কে আছে যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন। আর তোমাদেরকে দুনিয়ার খলীফা বানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। গভীর রাতে আপনি যে ক্রন্দন করেন, মামলা-মোকদ্দমায় পড়ে, ঋণগ্রস্ত হয়ে, রোগাক্রান্ত হয়ে, ব্যথা-বেদনা নিয়ে, অস্থির মন নিয়ে আপনি যে দোয়া করেন সে দোয়াতো আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ শ্রবণ করেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমি সব দেখতে পাই, শ্রবণ করতে পারি। এমন কিছু নেই যা আমি দেখি না, শ্রবণ করি না। সমুদ্রের অতল তলদেশে শৈবালের সাথে লাগানো ছোট্ট একটি পোকা যা মাইক্রোসকোপ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, তাও আমি দেখি। আটলান্টিক মহাসাগরের অতল তলদেশে যদি ছোট একটি পোকা ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করে, তাহলে পৃথিবীর কেউ সে চিৎকার শুনতে পায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আরশের মালিক আমি আল্লাহ সে পোকার চিৎকার শ্রবণ করি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ –

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সাথে কি কোন অংশীদার আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

আজ মানুষ মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে কিন্তু উপকার কতটুকু তা আমাদেরকে দেখতে হবে। পৃথিবীর মানুষ যেখানে না খেয়ে মারা যাচ্ছে, যে অর্থ ব্যয় করা হল মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য, সে অর্থ দিয়ে যদি বিদ্যুৎ তৈরি করা হত তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া যেত। যে অর্থ দিয়ে বোমা তৈরি করা হচ্ছে মানুষ মারার জন্য, সে অর্থগুলো যদি একত্রিত করা হত, তাহলে প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানি পৌছে দেয়া যেত। মানুষ মারার জন্য যে সব অস্ত্র তৈরি করা হয়, সে

অর্থ দিয়ে যদি পৃথিবীতে হাসপাতাল তৈরি করা হত তাহলে মানুষ আর বিনা চিকিৎসায় মারা যেত না। আজ অনর্থক অর্থ খরচ করা হয়। এই খরচ করার কি মূল্য? হিমালয় পর্বতের ওজন কত তা বের করার জন্য অর্থ খরচ করার কোন যুক্তি নেই। আবার আটলান্টিক মহাসাগরে কত কোটি গ্যালন পানি আছে তা বের করার জন্য অর্থ ব্যয় করার কোন মানে হয় না। এ ব্যাপারে লক্ষ কোটি ডলার খরচ করার কি মূল্য আছে? মানুষ মঙ্গল গ্রহে যায়, চাঁদে যায়। যাক্ না, কোন ক্ষতি নেই। যে গবেষণায় মানবতার কল্যাণ হয়, পৃথিবীর কল্যাণ হয়, অর্থ সেখানে খরচ করুক; কিন্তু পৃথিবীর একশ্রেণীর মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ যে, মানবতার কল্যাণে অর্থ খরচ করা হবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন–

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ–

কে তিনি? যিনি জলে, স্থলে, অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান। সমুদ্রের ভেতরে নাবিকেরা যখন পথ চলে, দিনের বেলায় সূর্য দেখে নাবিকেরা পথ নির্ণয় করে; কিন্তু রাতের বেলায় অন্ধকারে নাবিকেরা যেন পথ হারিয়ে না ফেলে সে জন্য আমি আকাশকে তারকাখচিত করে রেখেছি। তারকা দেখে নাবিকেরা পথ নির্ণয় করে গন্তব্যে পৌছে যায়, পথ হারিয়ে যায় না। অন্ধকারের ভেতর আমিই তাদের পথ নির্ণয় করে দেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

ঐ আল্লাহর সাথে কি কোন শরীক আছে যে আল্লাহর সাথে উক্ত কাজে সহযোগিতা করেছে। যারা শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ মুক্ত। (আন্ নামল,৬৫)

তিনি বৃষ্টি বর্ষণে বৃষ্টির আগে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে বৃষ্টি আসছে এ সুসংবাদ প্রদান করেন। এ কাজের মধ্যে কি কেউ আল্লাহর শরীক আছে? মহান আল্লাহ্ বলেন–

ءاله مع الله ط قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقين–

আল্লাহর সাথে কি কোন অংশীদার আছে? যদি তোমাদের কাছে কোন দলীল থাকে তাহলে তা পেশ কর। আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, সৌর জগত, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ইত্যাদি যা কিছু আমি বানিয়েছি এতে আমার সাথে কে শরীক আছে? যদি তোমাদের কাছে যুক্তি থাকে তাহলে তা পেশ কর। এদের কাছে যুক্তি হল আকাশ

বলতে কিছুই নেই, স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহই তো আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোন পালনকর্তা নেই, কোন আইনদাতা নেই, কোন বিধানদাতা নেই, কোন শাসনকর্তা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الله الذى خلق السموت والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقالكم-

আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে দিয়েছেন।

এই পানি হচ্ছে মানুষের জন্য জীবন। এ জন্যই পানির অপর নাম জীবন বলা হয়। এই পানিকে নিয়ন্ত্রণ করেন মহান আল্লাহ তায়ালা। এই পানি যদি কয়েক ফুট উঁচু হয়ে আসে তাহলে আল্লাহ এর মাধ্যমে মানুষকে শেষ করে দিতে পারেন। আবার আল্লাহ ইচ্ছা করলে পানির ভেতরেই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। সমস্ত কর্তৃত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহর।

আবার আল্লাহ তায়ালা আগুনের ভেতর থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারেন। সব ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার। সব কিছুই আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وان تعدوا نعمت الله لاتحصوها-

তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه-

এই হল আল্লাহর সৃষ্টি। যদি পার তাহলে দেখাও যে অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে?

মাত্র কয়েক দশক আগে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা গ্রহ এবং সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি-মহাবিশ্বের গঠন প্রকৃতি নিয়ে তাদের সকল গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সর্বজন স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর আগে মহাবিশ্ব ছিল একটি বিশাল বস্তুপিণ্ড মাত্র। পরে ঐ বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে ঘটল এক বিস্ফোরণ, ফলে বিশাল বস্তুটি খণ্ড খণ্ড বস্তুতে বিভক্ত হয়ে একটি আদি ভরবেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এভাবে সৃষ্টি হল চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। অর্থাৎ

মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু। আজ অবধি তারা তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃত্তাকারে ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে দিনের পর দিন। এক সময় বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত দিল যে, পৃথিবী স্থির, সূর্য তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ; কিন্তু পরে আবার সিদ্ধান্ত দিল সূর্য স্থির পৃথিবী ঘুরছে। এ মতবাদগুলো ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সত্য হচ্ছে মহাবিশ্বের সকল বস্তুই বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের বিজ্ঞানী সমাজ মাত্র কয়েক দশক আগে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ আজ হতে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে এ কথাই বলেছেন–

اولم يرالذين كفروا ان السموت والارض كانتا رتقا ففتقنهما–

কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম। (আম্বিয়া : ৩০)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দিন–রাত এবং চন্দ্র–সূর্য সম্পর্কে বলেন–

وهو الذى خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون–

আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য। সব আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (আম্বিয়া : ৩৩)

এমনিভাবে যদি বিজ্ঞানীদেরকে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করি তাহলে তারা বলবেন, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে সমুদ্রের বুকে প্রাচীন বস্তুকণা থেকে প্লাটোপ্লাজম–এর উৎপত্তি হয়। এই প্লাটোপ্লাজম থেকেই জন্ম নেয় এমিবা নামের ক্ষুদ্রতম এককোষী প্রাণী। এভাবে সমুদ্রের উৎস থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাণীর জন্ম হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমুদ্র থেকেই সকল প্রাণীর জন্ম। অর্থাৎ সমুদ্র বা পানিই হচ্ছে সকল প্রাণের উৎস। এই তথ্য বিজ্ঞানীরা আমাদের জানিয়েছেন মাত্র কিছুদিন পূর্বে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় কয়েক দশক, মাত্র কয়েকদিন বটে। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে চৌদ্দশত বছর আগে ঘোষণা করেছেন–

وجعلنا من الماء كل شئ حى افلا يؤمنون-

আর প্রাণবন্ত সব কিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। এর পরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (আম্বিয়া : ৩০)

প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে অবশ্যই পানির প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাযুক্ত নয় ; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন। উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে। পৃথিবী ব্যতীত আরো পাঁচটি গ্রহের অস্তিত্বের কথা প্রাচীন কাল থেকে মানুষ জানতো। আধুনিক কালে আরো তিনটি গ্রহের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। সূর্যের গতিপথ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনই প্রথমবারের মত মানুষকে এ তথ্য দিয়েছে যে, সূর্যের একটি কক্ষপথ বা গতিপথ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

لا الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر ولا اليل
سابق النهار وكل فى فلك يسبحون-

অর্থাৎ, সূর্য কখনও ধরতে পারবে না চন্দ্রকে, কিংবা রাত্রি অতিক্রম করতে পারবে না দিবসকে, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে আধুনিক বিজ্ঞান জানতে পেরেছে যে, আমাদের ছায়াপথ এবং সূর্যেরও একটি গতিপথ আছে এবং তাদের নিজ নিজ মেরুদণ্ডের ওপরে ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের কেন্দ্রকে আবর্তন করে আসতে মোট সময় লাগবে পঁচিশ কোটি বছর। একথা মাত্র এই শতাব্দীতে জানা গেছে যে, কোপার্নিকাসের থিওরী মতে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করলেও সূর্য স্থির বসে নেই, আর পবিত্র কোরআনে চৌদ্দশত বছর পূর্বে এই তথ্য প্রদান করেছে যখন এ সম্পর্কে মানুষের কোন কিছুই জানা সম্ভব ছিল না।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

মহান আল্লাহ বলেন–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ–

আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলেই এই আকাশ সৃষ্টি করেছি, অবশ্যই আমি মহান ক্ষমতাশালী। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

এই আয়াতে ব্যবহৃত 'মুছিউন' শব্দের অর্থ, বিশালতা ও বিস্তৃতি দানকারী, ধনীগণ, বিত্তশালীগণ, প্রচন্ড ক্ষমতাধর, শক্তির নিরিখে কোন কিছুর সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটানো ইত্যাদি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এখানে আকাশমন্ডলের প্রসঙ্গে উক্ত শব্দের অর্থ দাঁড়াবে বিস্তৃতি ও বিশালতা দানকারী। সুতরাং এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে বর্তমানেও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অনন্ত কাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয়। মহাবিশ্বে যদি সম্প্রসারণ গতি না থাকতো, তাহলে মহাবিশ্বের কোন বস্তুরই বিকাশ ঘটতো না এবং যে গতিতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে গতি সামান্য কম বা বেশী হলে মহাবিপর্যয় ঘটতো, মহাবিশ্বের কোন অস্তিত্বই থাকতো না।

মহাবিশ্ব কি নিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর মানুষের জানা নেই। বিজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে যতটুকু জানতে পেরেছেন, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আমরা খালি চোখে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের যে অবস্থা দেখতে পাই, এর থেকে কয়েক শত কোটিগুণ বিশাল হলো এই মহাবিশ্ব। মানুষ ধারণা করতো রাতের দৃশ্য অসীম আকাশই হলো মহাবিশ্ব জগৎ। কিন্তু মাত্র কিছুদিন পূর্বে বিজ্ঞানীগণ দেখতে পেলেন, দৃশ্য জগতের অগণিত অযুত নক্ষত্রমালা শুধুমাত্র একটি গ্যালাক্সি যা পৃথিবীর ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মানে হলো দৃশ্যমান নিকটতম প্রতিবেশী, যা আমাদের থেকে প্রায় ২২ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরের আর বিপুল বিরাট জগৎ, নক্ষত্র ধারণ ক্ষমতায় যা ছায়াপথের তিনগুণ এবং বিশাল জগতটিও লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূর-দূরান্তে অবস্থিত একশত কোটির মধ্যে একটি সামান্য গ্যালাক্সি মাত্র। এই আলোক বর্ষের হিসাবটি কি! আমাদের জানা আছে যে, আলো প্রতি মুহূর্তে ১, ৮৬, ০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তথা আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সুতরাং আলোর এক মিনিটে অতিক্রমযোগ্য দূরত্ব হলো তার ৬০ গুণ। তাহলে ঘন্টায় বৃদ্ধি পায় আরো ৬০ গুণ। দিনে বৃদ্ধি পায় আরো ২৪ গুণ। বছরে বৃদ্ধি পায় ৩৬৫, ২৫ গুণ। যার দূরত্বের দৈর্ঘ্য হলো কমবেশী ৫, ৮৬৯, ৭১৩, ৬০০, ০০০ মাইল। এর নাম হলো আলোক বর্ষ আর এই হিসাবে পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে তার ব্যাস হলো ১০০, ০০০ গুণ বা ৫৮৬, ৯৭১, ৩৬০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইল–যা ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য। এটা হলো সেই গ্যালাক্সির মাপ বলেছেন বিজ্ঞানীরা, যেটায় এই পৃথিবী অবস্থান করছে। আর এর থেকে কয়েক কোটি গুণে বড় গ্যালাক্সি রয়েছে ঊর্ধ্ব আকাশে এবং এ ধরনের অতিকায় গ্যালাক্সির সংখ্যা যে কত কোটি, তা বিজ্ঞানীরা আজো জানে না।

আর এসব গ্যালাক্সি একটির থেকে আরেকটি ১৬০, ০০০ থেকে ১০, ০০০, ০০০, ০০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থান করছে এবং যার যার দূরত্ব ঠিক রেখে প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতিতে ধাবিত হচ্ছে। এই পৃথিবী যে গ্যালাক্সি গুচ্ছে অবস্থান করছে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে এই গ্যালাক্সির সংখ্যা হলো মাত্র ২০টি। আর পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যেসব বিশাল গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন, সেসব গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের মহাশূন্যতার মহাসমুদ্রে এক একটি বিশাল জগৎ, যে জগৎ সম্পর্কে মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। এসব গ্যালাক্সি বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। এসব গ্যালাক্সির সামনে আমাদের দৃশ্যমান এই বিশাল জগৎ ক্ষুদ্র একটি বালু কণার সমানও নয়। পৃথিবীর ছায়াপথ বা মিল্কীওয়ে এক অতি সাধারণ দীন হীন গ্যালাক্সি, অনন্ত ঐ মহাবিশ্বে যার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই।

বর্তমানের বিজ্ঞানীরা এই পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্ব আকাশের মাত্র ১০, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের কোয়াসারকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ ১০, ০০০ মিলিয়ন আলোক বছর দূরত্বের ওপারে ঐ মহাশূন্যে আরো কত বিশাল জগৎ যে রয়েছে, এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণাই নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এতদিন মানুষ যাকে বিশ্বজগৎ বলে মনে করেছে, এই বিশ্বজগতের সমান এবং এর থেকে কয়েক কোটি গুণে বিশাল জগতের সংখ্যা ঐ মহাশূন্যে ১০০ কোটির বেশী। তারা বলছেন, ঐ এক একটি জগতের মধ্যে রয়েছে কল্পনার অতীত অগণিত বিশাল

ছায়াপথ, এসব ছায়াপথে রয়েছে অকল্পনীয় সংখ্যক সূর্য, তারকা, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি। এসব কিছুই সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই পৃথিবী এবং গ্যালাক্সি কেন্দ্রের মাঝে অবস্থিত বাহু প্রতি মুহূর্তে ৫৩ কিলোমিটার বেগে এবং বিপরীত বাহু প্রতি সেকেন্ডে ১৩৫ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

একই পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে ২০০০ আলোক বর্ষ ব্যাসের গ্যালাক্সি কেন্দ্রও প্রতি সেকেন্ডে ৪০ কিলোমিটার গতিতে। আর এই সম্প্রসারণ নীতি গ্যালাক্সির ভেতরে, বাইরে ও গ্যালাক্সিসমূহের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। একটি গ্যালাক্সি থেকে আরেকটি গ্যালাক্সির দূরত্ব শত কোটি আলোক বর্ষ এবং এই দূরত্বের মাঝে রয়েছে আরো অগণিত বস্তু। কোন কোন গ্যালাক্সি আলোর গতিতে এক অজানা পথে সৃষ্টির শুরু থেকেই ছুটে চলেছে। মানুষ বিজ্ঞানীরা ১১, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষের ওপারে কোন গ্যালাক্সি চলে গেলে আর দেখতে পান না।

এর পরিষ্কার অর্থ হলো, প্রতি মুহূর্তে কত শতকোটি গ্যালাক্সি কোথায় কোন দূর অজানায় হারিয়ে গিয়েছে, তার সন্ধান একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। ১১, ০০০ মিলিয়ন দূরের গ্যালাক্সির সন্ধান বিজ্ঞানীদের জানা নেই এবং এই দূরত্বের পরে আর কি রয়েছে, তাও তাদের জানা নেই।

আর এসবের কত ওপরে যে আকাশ রয়েছে, তা বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আকাশ সম্পর্কে তারা কিভাবে ধারণা দেবে! মহাকাশের এতকিছু নিয়ে গোটা মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এ অবস্থায় যখন তা শেষ সীমানায় পৌঁছে যাবে, তখন ঐ মহাকাশ বেলুনের মতই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ছোট্ট একটি কথায় এই মহাবিশ্বের আকৃতি তুলনা করা যায় এভাবে যে, বিজ্ঞানীগণ এই পৃথিবী ও পৃথিবী থেকে মহাশূন্যের দিকে ১১, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের যে মহাবিশ্বের সন্ধান পেয়েছেন, তা গোটা বিশ্বের সমস্ত বালু কণার তুলনায় একটি মাত্র বালুকণার সমান। সমস্ত কিছুই এক অবিশ্বাস্য গতিতে এক অজানা পথে কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন, আকাশমন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে–সেদিকেই মহাবিশ্ব ধাবমান। অথচ এই একই কথা মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনে জানিয়েছেন।

কিয়ামতের দিন সেদিন তারকাসমূহ এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। কিভাবে তা পড়বে, বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে তীব্র গতিতে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। এই আকর্ষণী শক্তিকে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন (Gravitational Force) বা মহাকর্ষীয় শক্তি। সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ সূর্যের আকর্ষণে আবর্তিত হয়ে থাকে আবার উপগ্রহগুলো গ্রহের আকর্ষণে আবর্তিত হয়। গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্যের চারদিকে দলবদ্ধভাবে পরিক্রমণ করে। এভাবে একক গ্যালাক্সি গুচ্ছ গ্যালাক্সির আকর্ষণে আবর্তিত হয়। এভাবে করে প্রতিটি বস্তুই একে অপরের সাথে মিলিত হতে আগ্রহী। পক্ষন্তরে এই মিলন ঘটতে না পারার কারণ হলো অর্থাৎ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি (Force of Expansion.)। এই গতির ফলেই পরস্পরের মধ্যে Space সৃষ্টি হয় এবং দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সম্প্রসারণ গতি একদিন হরণ করবেন। বিজ্ঞানীগণও বলছেন, সম্প্রসারণ গতি ক্রমান্বয়ে থেমে যাবে। তখন মহাকর্ষীয় আকর্ষণে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি গুচ্ছ, নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পরের কাছে তাদের অকল্পনীয় গতি নিয়ে। ফলে একটির সাথে আরেকটির মহাসংঘর্ষ ঘটবে। তখন সমস্ত নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে। মহাকর্ষ শক্তি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ (Expansion) স্তব্ধ করে দেবে মহাজাগতিক পদার্থের ঘনত্ব সৃষ্টি করে। মহাজাগতিক পদার্থের ঘনত্ব এক সময় এত অধিক বৃদ্ধি লাভ করবে যে, তখন মহাকর্ষ শক্তি অধিক পরিমাণে শক্তিশালী হবে। ফলে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করে মহাসংকোচের দিকে নিয়ে যাবে। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন Big Crunch.

অর্থাৎ আল্লাহর কোরআনের সূরা দুখানে যেমন বলা হয়েছে, আদিতে সমস্ত কিছুই একটি বিন্দুতে ধূমায়িত ছিল এবং আল্লাহ তা'য়ালা তা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করেছেন, তেমনি Big Crunch-এর মাধ্যমে পুনরায় মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে এসে বিস্ফোরিত হবে। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, মহাকাশে নতুন নতুন নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই কারণে মহাজাগতিক গড় ঘনত্ব প্রভাবিত হচ্ছে। আবার মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর ভেতর ১০ কোটি Neutrino রয়েছে। এর পরিমাণও বিশাল ভরে সমৃদ্ধ এবং তাদের মোট ওজন মহাবিশ্ব closed করার জন্য যথেষ্ট।

এ ছাড়া বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক ধূলি (Cosmic Dust) মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি করছে। যেমন প্রতি বছর ১০ হাজার টন ধূলি কণা শুধু পৃথিবী গ্রহে পতিত হয়। এরপরে রয়েছে মহাকাশে রয়েছে কৃষ্ণ বিবর (Black Hole)। বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাকর্ষের আকর্ষণে নক্ষত্রগুলো পরস্পরের কাছাকাছি হলেই সংঘর্ষ হয় তখন Black Hole-এর সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি গুচ্ছ, নক্ষত্রমন্ডলী তীব্র আকর্ষের কারণে একে অপরের দিকে আলোর গতিতে ছুটে আসতে থাকবে। তখন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে এবং তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে।

পৃথিবীর ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যত তথা পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখিত ধারণা পোষণ করছে বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ। তারা বলছেন, তাপের উৎস হলো সূর্য। আর এই তাপের কারণেই গোটা সৃষ্টিজগৎ সচল রয়েছে। অথচ এই সূর্য ক্রমশঃ তার জ্বালানি শক্তি নিঃশেষ করে ফেলছে। অর্থাৎ সূর্য একটি পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির জন্যই একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখা অঙ্কন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ-مَاخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى-

তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করেনি ? আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক ও উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর রূম-৮)

এই পৃথিবীতে যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অনাদি ও অনন্ত নয়, এ কথা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টির সামনেই মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, পুরাতনের স্থানে নতুনের আগমন ঘটছে। কিন্তু এর একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিভাবে-কি করে ঘটবে তা গবেষকদের কাছে আর অনাবৃত নেই।

দিন ও রাতের আবর্তন ও বিবর্তন

আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করছে–

وَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ -نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ -وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا-ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ-لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ-وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

এদের জন্য রাত হচ্ছে আরেকটি নিদর্শন। আমি তার ওপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়। আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে। এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসাব। আর চাঁদ, তার জন্য আমি মন্‌যিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শুকনো শাখার মতো হয়ে যায়। না সূর্যের ক্ষমতা রয়েছে চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাতের ক্ষমতা রয়েছে দিনকে অতিক্রম করতে পারে, এসব কিছুই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সন্তরণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৩৭-৪০)

পৃথিবীর সামনে থেকে সূর্যের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনো দিবাবসান ও রাতের আগমন ঘটতে পারে না। দিবাবসান ও রাতের আগমনের মধ্যে যে চরম নিয়মানুবর্তিতা পাওয়া যায় তা সূর্য ও পৃথিবীকে একই অপরিবর্তনশীল বিধানের আওতায় আবদ্ধ না রেখে সম্ভবপর ছিল না। তারপর এ রাত ও দিনের আসা-যাওয়ার যে গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর সৃষ্ট প্রাণীকুলের সাথে পরিলক্ষিত হয় তা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, চরম বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোন বিজ্ঞ স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে অনুগ্রহ করে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষ, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব, পানি ও বাতাসের অস্তিত্ব এবং নানা ধরনের খনিজ সম্পদের অস্তিত্বও প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করানোর এবং তারপর পৃথিবীর নানা অংশের একটি ধারাবাহিকতা সহকারে নির্ধারিত বিরতির পর সূর্যের সামনে আসার এবং তার সামনে থেকে সরে যেতে থাকার ফসল।

যদি পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে একটু কম বা বেশী হতো অথবা তার এক অংশে প্রতি মুহূর্তে রাত ও অন্য অংশে দিন অবস্থান করতো অথবা দিন-রাতের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত বা খুবই কম গতিসম্পন্ন হতো অথবা নিয়ম অনুসারে না ঘটে হঠাৎ কখনো দিন বা রাতের আগমন ঘটতো, তাহলে পৃথিবী কোন প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতো না। শুধু তাই নয় বরং এ অবস্থা যদি হতো তাহলে পৃথিবীর নিষ্প্রাণ জড় পদার্থসমূহের বর্তমান আকৃতি থেকে ভিন্ন আকৃতির হতো।

এসব দেখে কোন মানুষ যদি একেবারে মূর্খ না হয় এবং অন্তরের চোখ বন্ধ করে না রাখে, তাহলে সে মানুষ এসব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক আল্লাহর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে, যিনি এই পৃথিবীর বুকে এই বিশেষ ধরনের সৃষ্ট প্রাণী জগতকে অস্তিত্ব দান করার ইচ্ছে করেন এবং সৃষ্টির যথাযথ প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধন স্থাপন করেন।

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তথা তাওহীদ যারা মানতে অস্বীকার করে তারা এ কথা বলুক যে, সৃষ্টিজগতের এই বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ কয়েকজন স্রষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট করা অথবা কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের আওতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব কিছু সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা কতটা মূর্খতার পরিচয় বহন করে?

রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগমনের অর্থ পৃথিবী ও সূর্যের ওপর একই আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে, এখানে অন্য কারো আধিপত্য বিস্তারের সামান্যতম সুযোগ নেই। রাত আর দিনের ঘুরে ফিরে আসা এবং পৃথিবীর আর সমস্ত সৃষ্টির জন্য তা উপকারী হওয়া এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, একমাত্র আল্লাহই এসব জিনিসের স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক।

তিনি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করে এমনভাবে এই ব্যবস্থা চালু করেছেন যেন তাঁর সৃষ্টির জন্য সমস্ত কিছুই কল্যাণকর হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا-اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ-

আল্লাহই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাতের পরিবেশে আরাম করতে পারো। আর দিনকে আলোকিত করেছেন। সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পাশীল। তবে অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না। (সূরা আল মু'মিন-৬১)

ভূগোল সম্পর্কে যাদের সাধারণ জ্ঞান রয়েছে তারাও এ কথা জানে যে, পৃথিবী নামক এই গ্রহের দুটো গতি রয়েছে এবং তার একটি নাম হলো আহ্নিক গতি ও অপরটির নাম হলো বার্ষিক গতি। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের এই পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার ঘুরে আসে। আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরছে এবং এ কারণে দিন রাতের আবর্তন ও বিবর্তন হচ্ছে। এই কক্ষগতির সাথে অক্ষগতির একটা সুসামঞ্জস্য রয়েছে বলেই দিন, রাত ও ঋতুর আবর্তন হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অক্ষগতির সঠিক কারণ কি এবং তার উৎস কোথায় ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান শুধুমাত্র অনুমানলব্ধ। সম্প্রসারণশীল এই মহাবিশ্বের শাসনে বার্ষিক গতির পাশাপাশি দিন রাত আবর্তনকারী এই আহ্নিক গতি একটি মহাবিস্ময়কর বিষয়।

মহাকাশে চাঁদ-সূর্যের দুরত্ব

এই পৃথিবী যদি চাঁদের সমান হতো অথবা তার নিজস্ব ব্যাসের এক চতুর্থাংশ হতো, তাহলে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বর্তমানে যতটা রয়েছে তার এক ষষ্ঠাংশে হতো। এই ষষ্ঠাংশ শক্তি সম্পন্ন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কখনো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলীয় পানিকে ধরে রাখতে সমর্থ হতো না। এই পৃথিবীতে মওজুদ সমস্ত পানির ভান্ডার দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতো।

বাতাসের জলীয় বাষ্পমাত্রা বায়ুমন্ডলীয় বলয় থেকে বিমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী হারিয়ে ফেলতো তার তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি লাভ করতো ফলে এখানে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেত না। সূর্যের প্রাণঘাতী অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray) প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে পৌঁছে সমস্ত কিছু মুহূর্তে চিরকালের জন্য ভস্মীভূত করে দিতো। পৃথিবী হারিয়ে ফেলতো তার জীবন সংক্ষরণ ক্ষমতা। বর্তমান ব্যাসের দ্বিগুণ হলে বর্ধিত পৃথিবীর উপরিভাগের পরিমাণ বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠের চারগুণ হতো।

এমন একটি অবস্থায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল বৃদ্ধি লাভ করতো বর্তমানের দ্বিগুণ যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সৃষ্টি করতো ৩০ পাউন্ড চাপ। মারাত্মকভাবে কমে যেত বায়ুমন্ডলের স্তরগত উচ্চতাসমূহ। এই উচ্চতা কমে যাওয়ার ফলে অনিবার্য ধ্বংসের ভয়াবহ বিভীষিকা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ উল্কা এই পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে আসে। আমরা অনুভবও করতে পারিনা, আল্লাহ্ উর্ধ্ব জগতে যে বায়ুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তার পুরুত্ব ও ব্যাপ্তি দিয়ে পৃথিবীর প্রাণীকুল ও অন্যান্য বস্তুকে ধ্বংসকারী উল্কাপতন থেকে হেফাজত করে যাচ্ছে।

পৃথিবীর আকারের বৃদ্ধি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বর্ধিত করে দিত, তাহলে নীচে নেমে আসতো বায়ুমন্ডলের এই অদৃশ্য প্রতিরোধী ব্যবস্থার বিস্তার। পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছার পূর্বে বায়ুমন্ডলীয় ঘর্ষণে ভস্মীভূত না হয়ে উল্কাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে আঘাত হানার পথ সুগম হয়ে পড়তো। ফলে মুহূর্তে সমস্ত প্রাণী মুহূর্তে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হতো।

এই পৃথিবী বর্তমানে সূর্য থেকে যে দুরত্বে অবস্থান করছে, এর থেকে যদি দ্বিগুণ দুরত্বে সরিয়ে নেয়া হতো তাহলে পৃথিবী বর্তমানে সূর্যের কাছ থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ লাভ করছে, তখন লাভ করতো মাত্র এক চতুর্থাংশ। এই দুরত্বের কারণে বার্ষিক গতির মাত্রা হতো বর্তমানের অর্ধেক কিন্তু অক্ষ পরিধির পরিমাপ হতো বর্তমানের দ্বিগুণ।

ফলে একটি বছরের পরিমাপ হতো চারটি বছরের সমান। এতে যে ফলাফল হতো তাহলো দুরত্ব জনিত কারণে তাপমাত্রার এক মারাত্মক হ্রাসপ্রাপ্তি যা বর্তমানের এক চতুর্থাংশ অথবা তারও কম মাত্রায় পৌঁছে যেতো। শীত মৌসুমের ব্যাপ্তি বর্তমানের চারগুণ দীর্ঘতর হয়ে যেতো ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমস্ত প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ জমাট বদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এমনকি প্রচন্ড খরা মৌসুমে কোন একটি তরুলতাও প্রয়োজনের সময় এক বিন্দু মুক্ত পানি লাভ করতে সক্ষম হতো না।

আবার পৃথিবীর সৌর দুরত্ব বর্তমান দুরত্বের অর্ধেক হলে কক্ষপথের পরিধি নেমে আসতো অর্ধেকে কিন্তু গতিবেগ হতো দ্বিগুণ। যার ফলে বর্তমানের একটি সৌর বছর হতো মাত্র ৩ মাস দীর্ঘ। এমন অবস্থায় সূর্য থেকে আগত তাপের পরিমাণ

হতো বর্তমানের চেয়ে চারগুণ অধিক। ফলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে রাত ও দিনের আবর্তনের মাধ্যমে এসব কল্যাণ তাঁর সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। এসবের পেছনে স্রষ্টা যদি একজন না হয়ে অধিক হতো, তাহলে আবহমান কাল থেকে একই নিয়মে এসব চলতো না, ব্যতিক্রম অবশ্যই হতো।

মহাকাশে সূর্যের পরিণতি

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে সূর্য হলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ২০ হাজার কোটি তারকার মধ্যে একটি মাঝারি মানের তারকা হলো সূর্য এবং এটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই সৌরজগৎ। সৌরজগতে যতো বস্তু আছে তার ৯৯ দশমিক ৮৫ ভাগই রয়েছে সূর্যের দখলে। সৌরজগতের ভেতরের দিকের গ্রহগুলোকে বলা হয় ইনার প্লানেট এবং তুলনামূলকভাবে এরা আয়তনে ছোট। সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র সূর্যের প্রভাব বলয় বিশাল এবং এই প্রভাব বলয়ভুক্ত অঞ্চলকে বলা হয়ে থাকে হেলিওস্ফেয়ার। আর এর সীমান্ত রেখাকে বলা হয় হেলিওপজ। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে সূর্য থেকে হেলিওপজ-এর দূরত্ব ১শ' এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা জ্যোতির্বিদ্যা একক। ১ এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট সমান ১৫ কোটি কিলোমিটার বা ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকেই এক জ্যোতির্বিদ্যা একক বলা হয়।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কয়েকটি সর্পিল বাহু রয়েছে। তেমনই একটি বাহুতে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান। সৌরজগৎ অবস্থান করছে মিল্কিওয়ের নিরক্ষীয় তল থেকে ২০ আলোকবর্ষ ওপরের দিকে। আর গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে সৌরজগতের দূরত্ব ২৮ হাজার আলোকবর্ষ। সূর্য আকাশের বুকে জ্বলন্ত এক অগ্নিকুন্ড। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভেতরে দান করেছেন বিপুল শক্তি, বিশাল আয়তন আর তীব্র গতি। এ কারণে সূর্য লাভ করেছে এক মহাদানবীয় মর্যাদা। এই সূর্য ভয়ঙ্কর উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে আর সেই অগ্নিস্নানে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে বিশাল একটি জগৎ বিকাশ আর সমৃদ্ধির বিস্ময়কর সোপানে। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে সূর্য তাপের কারণেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু সজীব রয়েছে। সূর্য মানেই জীবন ও সৃষ্টির উৎস। সূর্যহীনতায় এই সমৃদ্ধজগৎ পরিণত হবে প্রাণের স্পন্দনহীন এক মহাঅন্ধকার জগতে।

মহাজগতের বিচারে সূর্য এক অতি তুচ্ছ একটি তারকা। কারণ এর থেকে কয়েক কোটি গুণ বিশালাকৃতির সূর্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য গ্যালাক্সির ভেতরে এবং বর্তমান দৃশ্যমান সূর্যের মতো তিনকোটি সূর্যকে ঐসব সূর্য চুষে খেয়ে হজম করার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য যে শক্তি ব্যয় করা হয়েছে, বর্তমান সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরতে প্রতি সেকেন্ডে সেই শক্তি ব্যয় করে থাকে।

শুধু তাই নয়, এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকার জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছে 'স্পাইকোল'। এই গ্যাস প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। এই স্পাইকোল গ্যাস যদি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করত, তবে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত। কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে যে গ্যাস বের হচ্ছে—কোন এক অদৃশ্য শক্তি ষাট হাজার মাইল বেগে সে গ্যাসকে আবার সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেন সৃষ্টিজগৎ কোন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সৌর জগতের মোট ভরের ৯৯. ৮৫ শতাংশই সূর্যের। সূর্যের ভর হলো আমাদের পৃথিবীর ভরের ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৮ শ' গুণ। আ সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার কিলোমিটার। সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৫৮০০ ডিগ্রি কেলভিন এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১ কোটি ৫৬ লক্ষ কেলভিন। বিশাল সৌরজগতের মোট ভরের ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশের বেশি ভর হচ্ছে সূর্যের। সূর্যের মোট ভরের ৭৫ শতাংশ হলো হাইড্রোজেন এবং বাকি ২৫ শতাংশ হিলিয়াম। সূর্যের মোট অণুর সংখ্যা হিসাব করলে এর ৯২ দশমিক ১ শতাংশ হলো হিলিয়াম। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়া আরেকটু ভারী পদার্থের পরিমাণ সূর্যে দশমিক ১ শতাংশ। সূর্য অবিরত মিল্কিওয়ের কেন্দ্রকে যেমন প্রদক্ষিণ করে চলেছে তেমনি নিজেও অবিরাম নিজ অক্ষে লাটিমের মতোই ঘুরছে।

প্রতি সেকেন্ডে সূর্য থেকে ৩৮৬ বিলিয়ন মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। এই পরিমাণ হাইড্রোজেন পুড়ে উৎপন্ন হয় ৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন হিলিয়াম এবং গামারে'র আকারে ৫০ লক্ষ টন শক্তি। উৎপাদিত এই শক্তি কেন্দ্র ছেড়ে যতই বাইরে দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে ততই সেই শক্তি মহান আল্লাহর কুদরতি ব্যবস্থার কারণে শোষিত হতে থাকে এবং তা থেকে বিকীর্ণ তাপমাত্রা হ্রাস পেতে

থাকে। সূর্যের বাইরের দিককে বা পৃষ্ঠদেশকে বলা ফটোস্ফিয়ার। এই এলাকার তাপমাত্রা ৫ হাজার ৮ শ' কেলভিন। গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০, ০০০ আলোকবর্ষ দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সূর্য ছায়াপথের নিজস্ব সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৫৬ মাইল বেগে ধাবিত হচ্ছে। সূর্যের এই প্রচন্ড গতিই তাকে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সূর্য তার সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানি এক সময় শেষ করে ফেলবে এবং ক্রমশঃ তা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সূর্যের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে। এক সময় তার গতি থাকবে না, তেজ থাকবে না, তখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে গেলেই সূর্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে লাল দানবে (Red giant)। নক্ষত্রের বিলয় প্রক্রিয়ায় এই লাল দানবের অভ্যন্তরে জ্বালানি সংকট, অভিকর্ষ বলের প্রভাব তখন কার্যকর হবে ধ্বংস পতন ঘটিয়ে। এই ধ্বংস পতনের কেন্দ্রবিন্দুতে চাপজনিত কারণে পরিণামে সৃষ্টি হবে একটি সাদা বামন। শীতল, অনুজ্জ্বল, নির্জীব ও অত্যধিক ঘনত্বসম্পন্ন সূর্য সাদা বামনাকৃতি লাভ করবে, তখন তা মহাজাগতিক উচ্ছিষ্টে পরিণত হবে এবং তখনই সূর্য চিরতরে হারিয়ে যাবে মানুষের দৃষ্টির বাইরে।

এই অবস্থার দিকেই নির্দেশ করে আল্লাহর কোরআন বলছে, সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে অর্থাৎ সূর্যকে এমন অবস্থায় উপনীত করা হবে যে, তার আলো ও উত্তাপ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সূর্যে আলো এবং উত্তাপ থাকবে না ফলে এই পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দনও থাকবে না, কোন উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে না, নদী-সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘমালায় পরিণত হবে না, বৃষ্টি বর্ষণও হবে না। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত সৃষ্টির অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসবে। সূর্যের মতই অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকা পুঞ্জের অভ্যন্তরে যে জ্বালানি শক্তি রয়েছে এবং যার কারণে তা উজ্জ্বল দেখায়, এসব জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এক সময় তা অন্ধকারের বিবরে হারিয়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে বর্তমানে যে যার অবস্থানে রয়েছে। সেদিন মাধ্যাকর্ষন শক্তিকে অকার্যকর করে দেয়া হবে। তখন সমস্ত কিছুই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে।

মুহূর্তে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অগণিত সৃষ্টির মধ্যে এমন এক অদৃশ্য শক্তি যার নাম মধ্যকার্ষন-অভিকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। যে শক্তি আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু অনুভব করি। পৃথিবীর আকার আয়তন যত বড় তার চেয়েও আকার আয়তনে বড় ওই সূর্য, আবার যে সমস্ত তারকা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, তা ওই সূর্যের চেয়েও বড় আবার যে সমস্ত তারকার আলো এ পর্যন্ত পৃথিবীর এসে পৌছেনি, ওই সমস্ত তারকা আরো বড়। এক অদৃশ্য শক্তির কারণেই ওই সমস্ত তারকা, গ্রহ, নক্ষত্র যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। কিয়ামতের দিন ওই অদৃশ্য শক্তি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিষ্ক্রিয় করে দেবেন। ফলে সমস্ত তারকা, গ্রহ, নক্ষত্র নিজের কক্ষচ্যুত হয়ে যাবে। সংঘর্ষ ঘটবে একটির সাথে অপরটির। ফলে সমস্ত কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মধ্যাকর্ষণ শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার ফলে পৃথিবীর সমস্ত কিছু তুলার মতো ভেসে বেড়াবে। তখন একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটে বিকৃত হয়ে অবশেষে তা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এ ঘটনা ঘটবে মুহূর্তের মধ্যে। কিয়ামত সংঘটিত হতে কতটুকু সময় লাগবে সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন—

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَاَقْرَبُ-اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

মহাধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। শুধু এতটুকু সময় মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে বা তার চেয়েও কম। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (নাহ্‌ল-৭৭)

কোন প্রক্রিয়ায় সেই মহাধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন—

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا شَاۤءَ اللّٰهُ-

আর সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সমস্তই মরে পড়ে থাকবে। তবে আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে ইচ্ছুক তারা ব্যতীত। (সূরা যুমার-৬৮)

এই পৃথিবী যে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। সুদূর সপ্তম শতাব্দীতে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে এই পৃথিবী নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস হবে, সে কথাটি বিজ্ঞান নতুন করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের ব্যাপারে যারা সন্দেহ করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ-لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ-

যখন সেই সংঘটিত হবার ঘটনাটি হয়েই যাবে, তখন তার সংঘটনের ব্যাপারে মিথ্যা বলার মতো কেউ থাকবে না। (সূরা ওয়াকিয়াহ্-১-২)

সমস্ত কিছুই মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সেদিন, পার্থিব কোন কিছুই টিকে থাকবে না। শুধু টিকে থাকবে মহান আল্লাহর আরশে আযিম। তাঁর চিরঞ্জীব সত্তা ব্যতিত অন্য কোন কিছুই টিকে থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَلِ وَالاكْرَامِ -

সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু টিকে থাকবে তোমার মহীয়ান-গরীয়ান রবের মহান সত্তা। (সূরা রাহ্মান-২৭)

সৃষ্টি জগতের ধ্বংস, নতুন জগত সৃষ্টি ও মানুষের পুনর্জীবন লাভ সবই আল্লাহর মহান পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। মহাধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার জন্য ফেরেশতা হযরত ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম সিঙ্গা মুখের কাছে ধরে আরশে আজিমের দিকে আগ্রহে তাকিয়ে আছেন, কোন মুহূর্তে আল্লাহ্ আদেশ দান করবেন। ব্যাপারটা সহজে বুঝার জন্যে এভাবে ধারণা করা যায়, ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর আদেশে এক মহাশক্তিশালী সাইরেন বাজাবেন বা বংশী ধ্বনি করবেন। কোরআনে এই বংশীকে বলা হয়েছে 'সূর'। ইংরেজীতে যাকে 'বিউগল' বলা হয়। সে বংশী ধ্বনি এক মহাপ্রলয়ের মহা তান্ডবলীলার পূর্বাভাস। সেটা যে কি ধরণের বংশী এবং তার আওয়াজই বা কি ধরনের তা মানুষের কল্পনারও অতীত। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা সহজ হয়ে যায়। যেমন বর্তমান কালে যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজানো হয়। যুদ্ধকালীন সাইরেনের অর্থ হলো বিপদ-মহাবিপদ আসন্ন। মহাবিপদের সংকেত ধ্বনি হিসেবে যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজানো হয়।

তেমনি কিয়ামত সংঘটিত হবার মুহূর্তে চরম ধ্বংস, আতংক ও বিভীষিকা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে–এটা জানানোর জন্যই সিংগায় ফুঁক বা সাইরেন বাজানো হবে। সিংগা

থেকে ভয়ংকর শব্দ হতে থাকবে এবং বিরতিহীনভাবে এক ধরনের আতংক সৃষ্টিকারী আওয়াজ হতে থাকবে। সে শব্দে মানুষের কানের পর্দা ফেটে যাবে। সবাই একই গতিতে সেই বিকট শব্দ শুনতে পাবে। মনে হবে যেন তার কানের কাছেই এই শব্দ হচ্ছে। ভয়ংকর সেই শব্দ কেউ একটু কম কেউ একটু বেশী শুনবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম কুদরতের মাধ্যমে সবার কানে সেই শব্দ একই গতিতে পৌছে দেবেন।

হাদীস শরীফে এই 'সূর' বা সিংগাকে তিন ধরনের বলা হয়েছে। নাফখাতুল ফিযা–অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত ও আংকতগ্রস্থ করার সিংগা ধ্বনী। নাফখাতুস সায়েক–অর্থাৎ মরে পড়ে যাওয়ার সিংগা ধ্বনী। নাফখাতুল কিয়াম–অর্থাৎ কবর হতে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে সকলকে একত্র করার সিংগা ধ্বনী। অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম তিনবার সিংগায় ফুঁক দিবেন। প্রথমবার সিংগায় ফুঁক দেয়ার পরে এমন এক ভংকর প্রাকৃতিক বিশৃংখলা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে যে, মানুষ ও জীবজন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উম্মাদের মতো ছুটাছুটি করবে। গর্ভিনীর গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে। বাঘের পেটের নিচে ছাগল আশ্রয় নেবে কিন্তু বাঘের স্মরণ থাকবে না ছাগলকে ধরে খেতে হবে। অর্থাৎ এমন ধরনের ভয়ংকর সন্ত্রাসের সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথেই যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে, সে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হবে। সে সময় কত বছর, কত মাস, কতদিন বা কত ঘন্টা হবে তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। এরপর তৃতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে সমস্ত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে। হাশরের ময়দানের বিশালতা কি ধরনের হবে তা আল্লাই জানেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ–وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ–سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ–اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ–

(তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও) যেদিন যমিন আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ দেয়া হবে। তারপর সকলেই মহাপরাক্রান্তশালী এক আল্লাহর সামনে হাতে পায়ে শিকল পরা এবং আরামহীন অবস্থায় হাজির হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা পাপীদেরকে দেখবে আলকাতরার পোষাক পরিধান করে আছে আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমন্ডলের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটা এ জন্যে হবে যে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেবেন। আল্লাহর হিসাব গ্রহণ করতে বিলম্ব হয় না। (সূরা ইবরাহীম-৪৮-৫১)

গভীরভাবে কোরআন হাদীস অধ্যায়ন করলে অনুমান করা যায় যে, কিয়ামতের দিন বর্তমানের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটিয়ে নতুন একজগত মহান আল্লাহ প্রস্তুত করবেন। সে জগতের নামই পরকাল বা পরজগত।

সে জগতের জন্যেও নিয়ম কানুন রচনা করা হবে। তারপর তৃতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী সমস্ত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। এই উপস্থিত হওয়াকেই কোরআনে হাশর বলা হয়েছে। হাশর শব্দের অর্থ হলো চারদিক থেকে গুটিয়ে একস্থানে সমাবেশ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا– পৃথিবীটা তখন হঠাৎ করেই কাঁপিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ্-৪)

কিয়ামতের দিন প্রচন্ড ভূমিকম্প হবে। এ ভূমিকম্পের কম্পনের মাত্রা যে কত ভয়ংকর হবে তা অনুমান করা কঠিন। পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোন এলাকায় ভূমিকম্প হবে না, বরং গোটা পৃথিবী জুড়ে একই সময়ে হবে। হঠাৎ করেই পৃথিবীটাকে ধাক্কা দেয়া হবে। ফলে পৃথিবী ভয়াবহভাবে কাঁপতে থাকবে। সেদিন মহাশূন্যে পাহাড় উড়বে। আল কোরআন ঘোষণা করছে, পৃথিবী সৃষ্টির পরে তা কাঁপতে থাকে, পরে পাহাড় সৃষ্টি করে মধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা পেরেকের ন্যায় পৃথিবীতে বসিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবী তখন স্থির হয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আল্লাহ উঠিয়ে নেবেন। ফলে পাহাড়সমূহ উড়তে থাকবে অর্থাৎ মহাশূন্যে ভেসে বেড়াবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ– পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে। অবশেষে তা কেবল মরিচিকায় পরিণত হবে। (সূরা নাবা-২০)

মহাশূন্যে বিক্ষিপ্তভাবে পাহাড়সমূহ চলতে থাকবে। ফলে একটার সাথে আরেকটির ধাক্কা লেগে ধ্বংসের এক বিভিষীকা সৃষ্টি হবে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا–

আর মানুষ আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি জানিয়ে দিন আমার রব্ব তা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দিবেন। (সূরা ত্ব-হা-১০৫)

পাহাড় বলতে মানুষ অনুমান করে এমন একবস্তু যা কোন দিন হয়ত ধ্বংস হবে না। মানুষ কোন বিষয়ের স্থিরতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পাহাড়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে কথা বলে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ–

আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছো যে এটা বোধহয় অত্যন্ত দৃঢ়মূল হয়ে আছে, কিন্তু সেদিন তা মেঘের মতোই উড়তে থাকবে। (সূরা নামল-৮৮)

পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যার যার স্থানে স্থির রয়েছে–আল্লাহর সৃষ্টি বিশেষ এক আকর্ষণী শক্তির কারণে। সেদিন এসব আকর্ষণী শক্তি আল্লাহর আদেশে অকেজো হয়ে পড়বে। ফলে পাহাড়গুলো যমীনের ওপরে আছাড়ে পড়তে থাকবে এবং তার অবস্থা কেমন হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا–

পাহাড়গুলো রংবেরংয়ের ধুনা পশমের মতো হয়ে যাবে। (সূরা মায়ারিজ-৯)

পৃথিবীর পাহাড়সমূহকে শূন্যে উঠিয়ে তা আবার যমীনের বুকে আছড়ে ফেলা হবে। ফলে তা প্যাঁজা ধুনা তুলার মতো করে-বালির মতো করে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীতে কোথায় কোনদিন পাহাড় ছিল, এ কথা কল্পনাও করা যাবে না।

পাহাড়সমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে

সূরা কারিয়ায় বলা হয়েছে–

اَلْقَارِعَةُ مَاالْقَارِعَةُ–وَمَاۤاَدْرَاكَ مَاالْقَارِعَةُ–يَوْمَيَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ–وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ–

ভয়াবহ দূর্ঘটনা! কী সেই ভয়াবহ দূর্ঘটনা? তুমি কি জানো সেই ভয়াবহ দূর্ঘটনা কি? সেদিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার মতো এবং পাহাড়সমূহ রংবেরংয়ের ধুনা

পশমের মতো হবে। পৃথিবীর সমস্ত পর্বত একই ধরনের নয়। সব পর্বতের রং ও বর্ণও এক নয়। কোনটা লাল কোনটা কালো আবার কোনটা শুধু বরফের। পশম যেহেতু বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে সে হেতু পশমের সাথে আল্লাহ তুলনা দিয়েছেন। পশম বাতাসে উড়ে। পাহাড়সমূহও কিয়ামতের দিন পশমের মতো উড়তে থাকবে। শুধু তাই নয়, সেদিন ওই বিশাল পর্বতমালা শুন্যে উঠিয়ে মাটির উপর প্রচন্ড বেগে আছাড় দেয়া হবে। মহান আল্লাহ সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে বলেন–

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً-فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ-

পৃথিবী ও পর্বতসমূহকে শুন্যে প্রচন্ড আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনা ঘটবেই। (সূরা হাক্কাহ্-১৪-১৫)

পাহাড়সমূহ কিয়ামতের দিন মরিচীকার ন্যায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। যেখানে পাহাড়সমূহ স্থির অটলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কোন চিহ্নই থাকবে না। কোরআন বলছে– وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا-فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا-

পাহাড়সমূহকে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে যে, তা শুধু বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পরিণত হবে। (সূরা ওয়াকিয়া-৫-৬)

মহাশূন্যের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্রমালা, তারকামন্ডলী জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সমস্ত কিছুর আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। উর্ধ্বজগতের সে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার কারণে প্রতিটি তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহসমূহ নিজ নিজ কক্ষ পথে অবিচল হয়ে রয়েছে এবং যে কারণে বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিস নিজ নিজ সীমার মধ্যে আটক হয়ে আছে, তা সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হবে। যাবতীয় বন্ধান সেদিন শিথিল করে দেয়া হবে। সূরা মুরসালাতে বলা হয়েছে–

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ-وَاِذَاالسَّمَاءُ فُرِجَتْ-وَاِذَاالْجِبَالُ نُسِفَتْ

এরপর যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে। তখন পাহাড়-পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। (সূরা মুরসালাত-৮-১০)

কিয়ামতের দিন ওই বিশাল পাহাড়ের অবস্থা যখন ধূলিকণায় পরিণত হবে, তখন মানুষের অবস্থা যে কি ধরনের হবে তা কল্পনা করলেও শরীর শিহরিত হয়। শূন্যে ভাসমান পাহাড়কে জমিনের উপরে আছড়ানো হবে। ভাসমান অবস্থায় একটার

সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটতে থাকবে, ফলে গোটা পৃথিবী জুড়ে এক ভয়াবহ বিভীষিকার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সূরা দুখানে বলেন–

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ-يَغْشَى النَّاسَ-هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ-

তোমরা অপেক্ষা করো সেই দিনের যখন আকাশ-মন্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে। তা মানুষদের উপর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এটা হলো পীড়াদায়ক আযাব।

সেদিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অসংখ্য তারকামালা খচিত সৌন্দর্য-মন্ডিত আসমান বর্তমান অবস্থায় থাকবেনা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ-

যখন আকাশ-মন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। (সূরা ইনফিতার-১)

সেদিন এমন ভায়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করা হবে যে, ভয়ে-আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় অল্প বয়স্ক বালকগুলোকে বৃদ্ধের ন্যায় দেখা যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا-السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ-كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا-

তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিন বালকদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেয়া হবে। এবং যার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর ওয়াদা তো অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। (সূরা মুয্যাম্মিল-১৭-১৮)

অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়ংকর ঘটনা যে ঘটবে–আল্লাহ বারবার তা বলেছেন। সুতরাং, আল্লাহ যা বলেন তা অবশ্যই হবে। আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে-পৃথিবীর মাটি ওলট–পালট হতে থাকবে। ফলে মাটির নিচে যা কিছু আছে, কিয়ামতের দিন মাটি তা উদগিরণ করে দেবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনবলেন–

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ-وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ-

যখন আকাশ মন্ডল ফেটে যাবে এবং নিজের রবের নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্যে এটাই যথার্থ। যখন মাটিকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার গর্ভে যা কিছু আছে, তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে মাটি শূন্য হয়ে যাবে। (সূরা ইনশিকাক-১-৪)

সেদিন আকাশ মন্ডল ভয়ংকরভাবে কাঁপতে থাকবে। কিয়ামতের দিন উর্ধ্বলোকের সমস্ত শৃংখলা ব্যবস্থা চুরমার হয়ে যাবে। তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনে হবে, যে জমাট-বাঁধা দৃশ্য চিরকাল একই রকম দেখাতো–একইরূপ অবস্থা বিরাজমান মনে হতো, তা ভেঙে-চুরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে আর চারদিকে একটা প্রলয় ও অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধরিত্রীর যে শক্ত পাঞ্জা পর্বতগুলোকে অবিচল করে রেখেছিল, তা শিথিল হয়ে যাবে। পর্বতগুলো নিজের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন ও উৎপাটিত হয়ে মহাশূন্যে এমনভাবে উড়তে থাকবে, যেমন আকাশে মেঘমালা উড়ে। সূরা তুর-এ ৯-১০ নং আয়াতে ঘোষনা করছে–

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا–وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا–

সেদিন আসমান থর থর করে কাঁপতে থাকবে। আর পর্বতসমূহ শূন্যে উড়ে বেড়াবে।

কিয়ামতের দিন কোন বস্তুই তার নির্দিষ্ট স্থানে থাকবে না। প্রতিটি বস্তু সেদিন নিজের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি করতে থাকবে। ফলে একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটে সব কিছু প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। আকাশ মন্ডল এমনভাবে কাঁপতে থাকবে যেমনভাবে প্রচন্ড ঝড়ে বৃক্ষ তরুলতা কাঁপে। (কত জোরে কাঁপবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। সাধারণভাবে বুঝার জন্য ঝড় এবং বৃক্ষ তরুলতার উদাহরণ দেয়া হলো।)

তাবিজ বানানোর পূর্বে পাত বানোনো হয়। পরে পাত গুটিয়ে তাবিজ বানানো হয়। সেদিন আকাশের সেই অবস্থা হবে। কোন বই-পুস্তকের বন্ধন শিথিল করে প্রবল বাতাসের সামনে মেলে ধরলে যেমন একটির পর আরেকটি পৃষ্ঠা উড়তে থাকে, সেদিন আকাশমন্ডলী তেমনিভাবে উড়তে থাকবে। আকাশকে এমনভাবে গুটিয়ে নেয়া হবে, কাগজকে গুটিয়ে যেভাবে বান্ডিল বাঁধা হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ–كَمَا بَدَأْنَا
اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ–وَعْدًا عَلَيْنَا–اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ–

সেদিন, যখন আকাশকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে ফেলবো যেমন বান্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখায় হয় লিখিত কাগজ। যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অনুরূপভাবে আমরা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো। এটা একটা ওয়াদা বিশেষ যা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার। এটা আবশ্যই আমি করবো। (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, চূড়ান্ত বিচারের দিন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট দিন। সেদিন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে। আর আকাশমন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দুয়ার আর দুয়ারে পরিণত হবে। পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে, পরিণামে তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে। মহান আল্লাহ যতগুলো আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তা একটির পর আরেকটি উন্মুক্ত হতে থাকবে। কোরআনের অন্যস্থানে আকাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ–

সেদিন আসমানসমূহ গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। (সূরা মায়ারিজ-৮)

কিয়ামতের দিন এমন অবস্থা হবে যে, যে ব্যক্তিই তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে শুধু আগুনের ন্যায় দেখতে পাবে। গলিত তামা যেমন অগ্নিকুন্ডে রক্তবর্ণ ধারণ করে টগবগ করে ফুটতে থাকে, সেদিন মহাশূন্যলোক তেমনি আগুনের রূপ ধারণ করবে। সূরা রাহমানের ৩৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ–

যখন আকাশ মন্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা রক্তিমবর্ণ ধারণ করবে।

সেদিন আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে অর্থাৎ উর্ধ্বজগতে কোনরূপ আড়াল বা বাধা প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব থাকবেনা, যেন বর্ষনের সমস্ত দরোজা খুলে দেয়া হয়েছে, গযব আসার কোন দরোজাই আর বন্ধ নেই। উর্ধ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে বিশাল বিশাল উল্কাপাত হচ্ছে। যে উল্কা কোন দেশের উপর পড়লে সে দেশ মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ মধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং উর্ধ্বে শূন্যলোকে এমন অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে ওই সমস্ত উল্কা পৃথিবীর মানুষের উপর পতিত না হয়। মাঝে মধ্যে দু'একটি উল্কা পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছে, কিন্তু সেটাও মরুপ্রান্তরে পতিত হয়। কোন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পতিত হয় না। আল্লাহ বলেন–

وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًاوَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ফলে তা দুয়ার আর দুয়ার হয়ে যাবে। পাহাড়কে চলমান করে দেয়া হবে। পরিণামে তা শুধু মরিচিকায় পরিণত হবে। (সূরা নাবা-১৯-২০)

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে এই পৃথিবী ক্রমশঃ এক মহাধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীও একদিন মৃত্যুবরণ করবে। চন্দ্র, সূর্য, তারকা, গ্রহ-নক্ষত্র সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ এ সমস্ত কথা পৃথিবীর মানুষকে বহু শতাব্দী পূর্বে মহাগ্রন্থ আল কোরআন জানিয়ে দিয়েছে। কোরআনের সূরা কিয়ামাহ্ ঘোষণা করছে—

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ-وَخَسَفَ الْقَمَرُ-وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ-يَقُوْلُ الاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ-كَلاَّ لاَ وَزَرَ-اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ-

দৃষ্টিশক্তি যখন প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে এবং চন্দ্র আলোহীন হয়ে যাবে এবং সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হবে। তখন মানুষ (সন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করে) বলবে কোথায় পালাবো? কখনো নয়, সেদিন তারা পালানোর জায়গা পাবে না। সেদিন সবাই তোমার রবের সামনে অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

চন্দ্রের আলোই শুধু নিঃশেষ হবে যাবে না, চন্দ্রের আলোর মূল উৎস স্বয়ং সূর্যও জ্যোতিহীন ও অন্ধকারময় হয়ে যাবে। ফলে আলো ও জ্যোতিহীনতা উভয়ই সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন এই পৃথিবী অকস্মাৎ বিপরীত দিকে চলতে শুরু করবে ফলে সেদিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই একই সময় পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। চন্দ্র আকস্মিকভাবে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ও সূর্যের গহ্বরে নিপতিত হবে। মহাশূন্যে যে সর্বভূক ব্লাকহোল সৃষ্টি করা হয়েছে, এই ব্লাকহোলের মধ্যে সমস্ত কিছু হারিয়ে যাবে। আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে—

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ-وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ-

যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে এবং নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে যাবে।

কোন বস্তুকে প্যাঁচানো বা গুটানোকে আরবী ভাষায় "তাকভির" বলা হয়। যেহেতু কিয়ামতের দিন সূর্যকে আলোহীন করা হবে সে কারণে রূপকভাবে বলা হয়েছে সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। অর্থাৎ সূর্যের আলোকে গুটিয়ে ফেলা হবে। সমস্ত নক্ষত্রমালা জ্যোতিহীন হয়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলোয় চন্দ্র উজ্জ্বল দেখায়। সুতরাং সূর্যের আলো ছিনিয়ে নেয়ার পরে চন্দ্র আর আলোকিত দেখাবে না। চন্দ্র আর সূর্য বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকবে। ফলে সূর্য পশ্চিম দিকে দেখা যাবে। এমনটিও হতে পারে চন্দ্র হঠাৎ

করেই পৃথিবীর মধ্যাকর্ষন শক্তি হতে বন্ধনমুক্ত হয়ে সূর্যের কক্ষপথে গিয়ে পড়বে। ফলে চন্দ্র, সূর্য মিলে একাকার হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন কোন কিছুই সুশৃংখলভাবে নিজ অবস্থানে থাকতে পারবে না। সমস্ত বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় মিশে যাবে।

নদী-সমুদ্রকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে

নদী-সমুদ্র ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআন মজিদে মহান আল্লাহ বলেন–وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ–যখন নদী-সমুদ্রকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে। (সূরা ইনফিতার-৩)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিয়ামতের সময় গোটা পৃথিবী জুড়ে জলে–স্থলে এবং অন্তরীক্ষে এক মহাকম্পন সৃষ্টি করা হবে। ঐ কম্পনের ফলে নদী এবং সমুদ্রের তলদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পানি বলতে কোন কিছুই নদী-সমুদ্রে অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ বলেন–وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ–এবং যখন নদী–সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে। (সূরা আত-তাকভীর-৬)

কিয়ামতের দিন পানি পূর্ণ নদী ও অগাধ জলধী-সমুদ্রে, মহাসাগরে আগুন জ্বলতে থাকবে। কথাটা অনেকের কাছে নতুন অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য ও আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যাদের পড়া আছে সেই সাথে পানির মূল উপাদান সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, তাদের কাছে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয় এবং অবিশ্বাস্য তো নয়ই। আল্লাহর অসীম কুদরতের বলে পানি হচ্ছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দু'টো গ্যাসের মিশ্রণ। হাইড্রোজেন দাহ্য, এই গ্যাস নিজে জ্বলে। আর অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে। পানি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রন হলেও আল্লাহর অসীম কুদরত যে, পানিই আগুন নেভায়। পানি-আগুনের শত্রু। আবার পানির অপর নাম জীবন। এক আয়াতে কোরআন বলছে নদী, সমুদ্র কিয়ামতের সময় আগুনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। অপর আয়াত বলছে, সেদিন নদী ও সমুদ্র দীর্ণ-বিদীণ হয়ে যাবে। এখানে দু'টো ব্যাপার, (এক) আগুনে পরিপূর্ণ হবে নদী ও সমুদ্র। (দুই) নদী, সমুদ্র; দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে। দু'টো বিষয়কে সামনে রাখলে নদী, সমুদ্রে আগুন জ্বলার বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান বলছে এবং টিভির মাধ্যমে মানুষকে দেখাচ্ছেও মহাসাগরের অতল তলদেশে আগ্নেয়গিরি আছে। সেখান থেকে উত্তপ্ত লাভা নির্গত হচ্ছে। কিয়ামতের

সময় প্রচণ্ড কম্পনের ফলে নদী ও সমুদ্রের তলদেশ ফেটে সমস্ত পানি এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছবে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে এক কঠিন উত্তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটছে ও আলোড়িত হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের এই স্তরে পানি পৌঁছে পানির দু'টো মৌল উপাদানে-হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিভক্ত হয়ে যাবে। অক্সিজেন প্রজ্জ্বালক ও হাইড্রোজেন উৎক্ষেপক। তখন এভাবে বিশ্লেষিত হওয়া এবং অগ্নি উদগীরণ হওয়ার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। এভাবেই পৃথিবীর নদী ও সমুদ্র কিয়ামতের সময় আগুনে পরিপূর্ণ হবে। সমস্ত প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হবে, সে বিষয়ে মানুষের সঠিক জ্ঞান নেই, প্রকৃত বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে মানুষ যদি সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে সামান্য ধারনা লাভ করতে চায়, তাহলে বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি থেকে ধারণা লাভ করতে পারে।এমন অনেক আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যাদের অবস্থান মহাসমুদ্রের গভীরে অথবা সমুদ্র নিকটবর্তী। সমুদ্রের পানির প্রচন্ড চাপকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে রক্তিমবর্ণ উত্তপ্ত লাভা তীব্র বেগে ছুটতে থাকে। পানির ভেতর দিয়ে লাভা যে পথে অগ্রসর হয়, চারদিকের পানি উত্তপ্ত লাভা শোষণ করতে থাকে বা বাষ্পাকারে উড়ে যায়। পানির ভেতরেও তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটতে থাকে।

আতঙ্কে মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে

সেদিন ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটবে। মায়ের কাছে সন্তান সবচেয়ে প্রিয়। সন্তানের জন্য মা প্রয়োজনে নিজের জীবনও দান করতে পারে। কিন্তু কিয়ামতের সময় যে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা দেখে মা সন্তানের কথা ভুলে যাবে। পৃথিবীতে ভূমিকম্প পূর্বাভাস দিয়ে সংঘটিত হয় না। মাত্র কিছু দিন পূর্বে তুরুস্কে এবং ভারতের গুজরাটের ভূজ শহরে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল, সেখানে মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় নিয়োজিত ছিল। কেউ আহারে, ভ্রমণে, সাংসারিক উপকরণ যোগানের কাজে, কেউ গান-বাজনায়-নৃত্যে, কেউ বা অবৈধভাবে যৌন সম্ভোগে নিয়োজিত ছিল। ভূমিকম্পে তুরুস্কে যেসব নামি-দামী হোটেল, তথাকথিত আধুনিকতার দাবিদারদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়েছিল, সেসব ধ্বংসাবশেষ থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের সময় এমন সব নারী-পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যারা অবৈধভাবে যৌন সম্ভোগে নিয়োজিত ছিল। যে মুহূর্তে তারা কিয়ামত, বিচার দিবসের কথা ভুলে আল্লাহর বিধান অমান্য করে কুকর্মে নিয়োজিত ছিল, ঠিক সেই

মুহূর্তে ভূমিকম্পের কবলে তারা পড়েছিল। কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালাই অবগত আছেন। মানুষ সে সময়ে নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকবে। মাতৃস্তন সন্তান মুখে নিয়ে চুষতে থাকবে, সেই মুহূর্তেই মহাধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। মায়েরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে দুধ পান করানো অবস্থায় ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি অবস্থা হলো, তা কোন মায়ের মনে থাকবে না। সূরা হজ্জ-এ মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى الالنَّاسَ سُكرى وَمَا هُمْ بِسُكرى وَلكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيْدٌ

হে মানুষ ! তোমাদের রব-এর গযব থেকে বাঁচো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই ভয়ঙ্কর জিনিস। সেদিনের অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তন দানকারিনী (ভীতগ্রস্থ হয়ে) নিজের স্তনদানরত সন্তান রেখে পালিয়ে যাবে। ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। তখন মানুষদের তুমি দেখতে পাবে মাতালের মতো, কিন্তু তারা কেউ নেশাগ্রস্থ হবে না। আল্লাহ্র আযাব অত্যন্ত ভয়ংকর হবে।

কিয়ামতের দিন মানুষ নেশাগ্রস্থের মতো আচরণ করতে থাকবে। মদপান না করেও ভয়ে আতঙ্কে মানুষ মাতালের মতো হবে। মানুষের তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হবে যেন চোখের তারা কোটর ছেড়ে ছিটকে বের হয়ে যাবে। চোখের পলক ফেলতেও মানুষের মনে থাকবে না। ভয়ে আতঙ্কে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকবে, মনে হবে যেন পাথরের চোখ। সূরা ইবরাহীমে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّلِمُوْنَ-اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الاَبْصَارُ-مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ-وَاَفْئِدَ تُهُمْ هَوَاءٌ-

আল্লাহ্ তো তাদেরকে ক্রমশঃ নিয়ে যাচ্ছেন সে দিনটির দিকে, যখন চোখগুলো দিকভ্রান্ত হয়ে যাবে। আপন মস্তকসমূহ উর্ধমুখী করে রাখবে। তাদের দৃষ্টি আর তাদের দিকে ফিরে আসবে না এবং ভয়ে তাদের অন্তরসমূহ উড়ে যাবে।

ভয়ে আতঙ্কে মানুষের বুকের কলিজা কণ্ঠনালীর কাছে চলে আসবে। পবিত্র কোরআনের সূরা নাযিয়াতে বলা হয়েছে–اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ– তাদের দৃষ্টিসমূহ তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। (সূরা নাযিয়াত-৯)

সূরা কিয়ামাহ্ বলছে, 'তখন তাদের দৃষ্টি সমূহ প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে।' সেদিন মানুষ ওই ভয়ংকর অবস্থা এমন ভীত সংকিত, বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে দেখতে থাকবে যে, নিজের শরীরের দিকে তাকানোর কথা সে ভুলে যাবে। কিয়ামতের দিন মানুষ এমন কাতরভাবে তাকাবে, দেখে মনে হবে মানুষের চোখগুলোয় বুঝি প্রাণ নেই–পাথরের নির্মিত চোখ। সবার দৃষ্টি বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। সূরা মু'মিনের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

وَاَنْذِرْ هُمْ يَوْمَ الازِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ–

হে নবী, ভয় দেখাও এ মানুষদেরকে সেদিন সম্পর্কে, যা খুব সহসাই এসে পড়বে। যখন প্রাণ ভয়ে উষ্ঠাগত হবে এবং মানুষ নীরবে ক্রোধ হজম করে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। আল-কোরআন জানাচ্ছে–

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ–تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ–قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ–

যেদিন ধাক্কা দিবে মহাকম্পনের একটি কম্পন, তারপর আরেকটি ধাক্কা, মানুষের অন্তরসমূহ সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (সূরা নাযিয়াত-৬-৮)

মানুষ যখন চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয় তখন তাকে দেখে অনেকেই মন্তব্য করে, মানুষটিকে চিন্তায় বুড়ো মানুষের মতো দেখাচ্ছে। এর অর্থ হলো মানুষটি ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্থ। এ ধরনের উদাহরণ দিয়েই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলেন–

كَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا–السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ–كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُوْلاً–

সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে এবং যার কঠোরতায় আসমান দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা মুযযাম্মিল-১৭-১৮)

কি ধরনের বিপদে পড়লে মানুষ নিজ সন্তান-প্রাণের প্রিয়জনকে ছেড়ে পালায় তা কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠবে। রাসূলের

স্ত্রীদের একজন (কোন বর্ণনানুযায়ী হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং কোন বর্ণনানুসারে হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, আবার কোন বর্ণনাকারীর মতে অন্য একজন নারী) আতঙ্কিত হয়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের গোপন অঙ্গসমূহ সেদিন সবার সামনে অনাবৃত ও উন্মুক্ত হবে? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রাসূল কোরআন থেকে জানিয়ে দিলেন, সেদিন কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার মতো সচেতনতা কারো থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

فَاذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ-يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ-وَاُمِّهِ
وَاَبِيْهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ-لِكُلِّ امْرِئٍ-مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ-
شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ-وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ
مُّسْتَبْشِرَةٌ-وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ-تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ

সবশেষে যখন সেই কান বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে। সেদিন মানুষ তার নিজের ভাই, মাতা-পিতা ও স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তাদের প্রত্যেকের উপর সেদিন এমন একটি সময় (ভয়ংকর ও বিভীষিকাপূর্ণ সময়) এসে পড়বে যখন নিজকে ছাড়া (নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা ছাড়া) আর কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ থাকবে না। সেদিন কতিপয় মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল থাকবে, হাসি-খুশী ভরা ও সন্তুষ্ট-স্বচ্ছন্দ হবে। আবার কতিপয় মুখমন্ডল ধুলি মলিন হবে। অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হবে। (সূরা আবাসা-৩৩-৪১)

কোন স্নেহদাতা পিতা ও স্নেহময়ী মাতা যদি ফাঁসির আসামী হয় এবং কোন সন্তানকে মঞ্চে উঠিয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়, তোমাকে মুক্তি দিয়ে যদি তোমার কোন সন্তানকে ফাঁসি দেয়া হয়, তাতে তুমি রাজী আছো কিনা? পৃথিবীর কোন পিতা-মাতাই বোধহয় এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেনা, নিজে ফাঁসিতে ঝুলবে কিন্তু সন্তানের মৃত্যু সে কামনা করবে না। পৃথিবীতে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, অর্থ-সম্পদ নিজের দখলে নেয়ার লক্ষ্যে কত মামলা মোকদ্দমা, একজন সুন্দরী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে লাভের জন্য কত চেষ্টা। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন বিপদের ভয়াবহতা দেখে মানুষ গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে হলেও নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করবে। পরিচিত-আপনজনদের অবস্থা যে কি, তা জানারও চেষ্টা করবেনা। নিজের চিন্তা ছাড়া সে আর কারো চিন্তা করবে না।

আত্মীয়তার বন্ধন কোনই কাজে আসবে না

মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَايَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا-يُّبَصَّرُوْنَهُمْ-يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ-وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ-وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا-ثُمَّ يُنْجِيْهِ

সেদিন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও প্রশ্ন করবে না। অথচ তাদের পরস্পর দেখা হবে। অপরাধীগণ সেদিনের আযাব হতে মুক্তি পাবার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই, তাকে আশ্রয়দানকারী অত্যন্ত কাছের পরিবারকে এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও মুক্তি পেতে চাইবে। (সূরা মায়ারিজ-১০-১৪)

কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সব রকমের আত্মীয়তা, সম্পর্ক-বন্ধন ও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দল, বাহিনী, বংশ, গোত্র, পরিবার ও গোষ্ঠী হিসেবে সেদিন হিসাব নেয়া হবে না। এক এক ব্যক্তি একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই সেদিন হিসাব দেবে। সুতরাং আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, স্ত্রী-সন্তান ও নিজ দলের খাতিরে কোন ক্রমেই অন্যায় কর্মে লিপ্ত হওয়া বা অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা, ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করা উচিত নয়। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সাথে অসহযোগিতা করলে নিশ্চিত জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ সেদিন নিজের কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হবে। দল, আত্মীয়তা, স্ত্রী-সন্তান কোন উপকারেই আসবে না। আল্লাহ বলেন- لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ-يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক, তোমাদের কোন কাজে আসবে, না তোমাদের সন্তান-সন্তুতি। (সূরা মুমতাহিনা-৩)

তবে হ্যাঁ, কোন মানুষ যদি নিজের স্ত্রী-সন্তানকে ইসলাম শিক্ষা দেয়, ইসলামী বিধান মেনে চলার ব্যাপারে সহযোগিতা করে, আল্লাহ চাইলে তারা উপকারে আসতেও পারে। সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না।, কারো কোন ক্ষমতাও থাকবে না। পৃথিবীর রাজা, বাদশাহ, ক্ষমতাসীন দল, ক্ষমতাবান মানুষ কত অত্যাচার করে দুর্বলদের ওপর। ভুলে যায় কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন জলদ গম্ভীর স্বরে ডাক দিয়ে বলবেন, আজ কোথায় পৃথিবীর সেই রাজা, বাদশাহগণ? কোথায় সেই অত্যাচারীগণ?' কোরআনের সূরা মুমিনের ১৬-১৭ নং আয়াত ঘোষণা করছে–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ-لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-اَلْيَوْ تُجْزَاى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ-لَاظُلْمَ الْيَوْمَ-اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

(কিয়ামতের দিন চিৎকার করে প্রশ্ন করা হবে) আজ বাদশাহী কার? (পৃথিবীর ক্ষমতাগর্বী শাসকগণ আজ কোথায়?) (উত্তরে বলা হবে) আজ বাদশাহী কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব একমাত্র পরম পরাক্রান্তশালী আল্লাহর। (বলা হবে) আজ প্রত্যেক মানুষকে সে যা অর্জন করেছে-তার বিনিময় দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আর আল্লাহ হিসাব নেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষীপ্র।

অবিশ্বাসের আবরণ সৃষ্টি করে যারা নিজেদের দৃষ্টিকে আবৃত করে রেখেছে, তাদের চোখে সত্য ধরা পড়ে না। কিয়ামত, বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম তথা অদৃশ্য কোন শক্তিকে যারা বিশ্বাস করেনি, এসব ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয়ারও প্রয়োজন অনুভব করেনি, সেদিন এদেরকে বলা হবে, যে অবিশ্বাসের পর্দা দিয়ে নিজেদের দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে রেখেছিলে, আজ সে পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন দেখো না, আমার ঘোষণা কতটা সত্য ছিল। মহান আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ-

(সেদিন আল্লাহ প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে বলবেন, এ দিনের প্রতি অবিশ্বাস করে তুমি অবহেলায় জীবন কাটিয়েছো) আজ তোমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। যা তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি, অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাওনি, তা আজ দেখো এ সত্য দেখার জন্যে আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দিয়েছি। (সূরা কাফ-২২)

দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেয়ার অর্থ হলো, চোখের সামনের যাবতীয় পর্দাকে অপসারিত করা। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে, মানুষ এ পৃথিবী থেকে তা দেখতে পায় না। যেসব কারণে তা দেখতে পায় না, সেদিন সেসব কারণসমূহ কার্যকর থাকবে না। ফলে পৃথিবীতে যারা ছিল অবিশ্বাসী, তারা নিজ চোখে সমস্ত দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে যাবে। বিপদের ভয়াবহতা অবলোকন করে মানুষ দিশ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু পালানোর জায়গা সেদিন থাকবে না।

এই পৃথিবীই হবে হাশরের ময়দান

এই পৃথিবীটিই হাশরের ময়দান হবে। বর্তমানে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ একই রূপ নয়। কোথাও পানি, কোথাও বরফ, কোথাও বন-জঙ্গল, কোথাও আগ্নেয়গিরি, কোথাও পাহাড়-পর্বত উঁচু নিচু ইত্যাদি। কিন্তু কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দান কেমন হবে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেসমস্ত মানুষ একটি ময়দানে একত্র হবে। তাহলে ময়দানটা কেমন হবে? বোখারী শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন-বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যমীনকে চাদরের মতো এমনভাবে বিছিয়ে দেয়া হবে, কোথাও একবিন্দু ভাঁজ বা খাঁজ থাকবে না।' ইসলামী পরিভাষায় হাশর বলা হয় কিয়ামতের পর পুনরায় পৃথিবীকে সমতল করে সেখানে সমস্ত সৃষ্টিকে হিসাব নিকাশ নেয়ার জন্যে একত্র করাকে। হাশর আরবী শব্দ। হাশর শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্রিত করা, সমাবেশ ঘটানো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا-لاَّتَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَّلاَ أَمْتًا-

এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, সেদিন এই পাহাড়গুলো কোথায় চলে যাবে? আপনি বলে দিন, আমার রব তাদেরকে ধূলি বানিয়ে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন সমতল, রুক্ষ-ধূসর ময়দানে পরিণত করা হবে যে, যেখানে তুমি কোন উঁচু-নীচু এবং সংকোচন দেখতে পাবে না। (সূরা ত্ব-হা-১০৬-১০৭)

মানুষের ভেতরে এমন অনেকে রয়েছে, যারা পরকাল অস্বীকার করে না। পরকাল বিশ্বাস করে কিন্তু কোরআনের আলোকে বিশ্বাস করে না। এদের ধারণা সমস্ত কিছু সংঘটিত হবে একটি আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। সেদিন যে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যার ভেতরে আল্লাহর আরশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি অবস্থান করবে, তা হবে সম্পূর্ণ এক আধাত্মিক জগৎ। কোরআনের ঘোষণার সাথে তাদের ঐ বিশ্বাসের কোন সামঞ্জস্য নেই। কোরআন বলছে, যমীন ও আকাশের বর্তমান রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হবে। বর্তমানে যে প্রাকৃতিক আইন কার্যকর রয়েছে, সেদিন তা থাকবে না। ভিন্ন আইনের অধীনে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন মহান আল্লাহ। এই পৃথিবীর যমীনকে পরিবর্তন করে হাশরের ময়দান বানানো হবে। এখানেই বিচার অনুষ্ঠিত হবে। মানুষের সেই দ্বিতীয় জীবনটি

যেখানে এসব পরকালীন জগতের ব্যাপার ঘটবে–তা নিছক আধ্যাত্মিক ব্যাপার হবে না, বরং তা ঠিক এমনভাবেই দেহ ও প্রাণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে, এমনভাবে মানুষদেরকে জীবন্ত করা হবে, যেমন বর্তমানে মানুষ জীবিত হয়ে পৃথিবীতে রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি সেদিন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সহকারে সেখানে উপস্থিত হবে, যা নিয়ে সে পৃথিবী থেকে শেষ মুহূর্তে বিদায় গ্রহণ করেছিল। সেদিনের সে ময়দান সম্পর্কে সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَالاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ–

যখন যমীন ও আসমান পরিবর্তন করে অন্য কিছু করে দেয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রমশালী প্রভুর সম্মুখে উন্মোচিত–স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হবে।

হাশরের দিন গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে, নদী-সমুদ্রকে ভরাট করে পাহাড় পর্বতকে যমীনের উপর আছাড় দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং বন-জঙ্গলকে দূর করে গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে মসৃন ধূষর রংয়ের এক বিশাল ময়দানে পরিণত করা হবে। এ ময়দানের আকৃতি যে কত বড় হবে, তা আল্লাহই জানেন। সূরা কাহাফে বলা হয়েছে–

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا–

যখন আমি পাহাড়-পর্বতগুলোকে চালিত করবো তখন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পাবে। আর আমি সমস্ত মানুষকে এমনভাবে একত্রিত করবো যে (পূর্বের ও পরের) কেউ বাকী থাকবে না। (সূরা কাহাফ-৪৭)

সেদিন মৃত্তিকা গর্ভে কিছুই থাকবে না। কারণ পৃথিবীতে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর প্রয়োজনে আল্লাহ তা'য়ালা নানা স্থানে অজস্র ধরণের সম্পদ ও খাদ্যভান্ডার মওজুদ রেখেছেন। মাটির নীচে প্রচুর সম্পদসহ অন্যান্য বস্তু রয়েছে। এসব কিছু আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরত বলে তার বান্দাহ্দেরকে দান করেছেন। পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্যে এসবের প্রয়োজন। কিন্তু কিয়ামতের সময় মানুষের জীবন ধারনের কোন প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং সম্পদের থাকারও প্রয়োজন নেই। জান্নাতে যা প্রয়োজন এবং দোযখে যা প্রয়োজন সবই আল্লাহ মওজুদ রেখেছেন। অতএব সেদিন মাটির নিচের সম্পদের কোন প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ বলেন–

اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا-وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا-وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا-

পৃথিবী তার গর্ভের সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে। মানুষ প্রশ্ন করবে-পৃথিবীর হলো কি?

সেদিন কবরে শায়িতদেরকে উঠানো হবে

মানুষ মৃত্যুর পর হতে অনন্ত অসীম জীবনে মহাবিশ্বের যে অংশে অবস্থান করে ইসলামী পরিভাষায় সে অংশকেই আলমে আখিরাত বা পরলোক বলে। আখিরাত দু'ভাগে বিভক্ত। আলমে বারযাখ এবং আলমে হাশর। মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে কিয়ামতের মাঠে উঠার অর্থাৎ পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে অবস্থান করে, সে জগতই হলো আলমে বারযাখ। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আল কোরআনের সূরা মুমিনুনে বলেছেন-

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ-

এখন এসব মৃত মানুষদের পিছনে একটি বরযাখ অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত। (সূরা মু'মিনূন-১০০)

বারযাখ শব্দের অর্থ হচ্ছে পর্দা বা যবনিকা। পৃথিবী ছেড়ে বিদায় গ্রহণের পরে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবী, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক জগতে মানুষের আত্মা অবস্থান করবে। এ আলমে বারযাখ এমনি একটি স্থান যেখান থেকে মানুষের আত্মা পৃথিবীতেও ফিরে আসতে পারবেনা বা জান্নাত-জাহান্নামেও যেতে পারবে না। এ আলমে বারযাখকেই কবর বলা হয়। আলমে বারযাখের দুটো স্তর। একটির নাম ইল্লিন অপরটির নাম সিজ্জিন। পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর আইন কানুন-বিধান মেনে চলেছে সে সমস্ত মানুষের আত্মা ইল্লিনে অবস্থান করবে। ইল্লিন যদিও কোন বেহেশ্ত নয়-তবুও সেখানের পরিবেশ বেহেশতের ন্যায়। পৃথিবীতে জীবিত থাকতে যারা আল্লাহর আইন মেনে চলেছে তারা মৃত্যুর পরে ইল্লিনে আল্লাহর মেহমান হিসেবে অবস্থান করবে।

আর যে সমস্ত মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলেনি, এমনকি ইসলামকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছে, মৃত্যুর পরে তাদের অপবিত্র আত্মা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। এটা জাহান্নাম নয় কিন্তু এখানের পরিবেশ জাহান্নামের মতোই। কবর আযাব

বলতে যা বুঝায় তা এই সিজ্জিনেই হবে। কবর বলতে মাটির সে নির্দিষ্ট গর্ত বা গুহাকে বুঝায় না যার মধ্যে লাশ কবরস্থ করা হয়। ইন্তেকালের পরে মানুষের দেহ ব্যঘ্র, সর্প যদি ভক্ষণ করে ফেলে বা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথবা সমুদ্রে কোন জীব জন্তুর পেটে চলে যায় তবুও তার আত্মা কর্মফল অনুযায়ী ইল্লিন অথবা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। মানুষ মৃত্যুর পর এমন এক জগতে অবস্থান করে, যে জগতের কোন সংবাদ, বা তাদের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপন পৃথিবীর জীবিত মানুষের পক্ষে অসম্ভবই শুধু নয়–সম্পূর্ণ অসাধ্য।

মৃত মানুষগণ কি অবস্থায় কোথায় অবস্থান করছে, তা পৃথিবীর জীবিত মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এ কারণেই মৃত্যুর পরের ও কিয়ামতের পূর্বের এ রহস্যময় জগতকে বলা হয় আলমে বারযাখ বা পর্দা আবৃত জগত। মৃত্যুর পরবর্তী জগত সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কবরের বর্ণনা করা হয়েছে। আলমে বারযাখই হলো সেই কবর। কিয়ামতের সময় তৃতীয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষ ঐ কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে এবং তারপরই শুরু হবে বিচার পর্ব। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا–وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ–

কিয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে। এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সেই মানুষদের অবশ্যই উঠাবেন যারা কবরে শায়িত। (সূরা হজ্জ-৭)

পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা সবাই কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। সূরা ইয়াছিনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ -

পরে একবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর অমনি তারা নিজেদের রব-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবরসমূহ থেকে বের হয়ে পড়বে। (সূরা ইয়াছিন-৫১)

মানুষকে মৃত্যুর পরে যেখানে যে অবস্থায়ই দাফন দেয়া হোক অথবা পুড়িয়ে ফেলা হোক না কেন, সবার আত্মা আলমে বারযাখ বা কবরে অবস্থান করছে। সেখান থেকেই তারা হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। কবর থেকে উঠে এমনভাবে মানুষ আদালতে আখেরাতের দিকে দৌড়াবে যেমনভাবে মানুষ কোন আকর্ষণীয় বস্তু দেখার জন্য ছুটে যায়। আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَعًا كَاَنَّهُمْ اِلى نُصُبٍ يُوْفِضُوْنَ

সেদিন তারা কবর হতে বের হয়ে এমনভাবে দৌড়াবে যে, দেবতার স্থানসমূহের দিকে দৌড়াচ্ছে। তখন তাদের দৃষ্টি অবনত হবে। অপমান লাঞ্চনা তাদেরকে (পাপীদেরকে) ঘিরে রাখবে। এটা সেই দিন যার ওয়াদা তাদের নিকট করা হয়েছিল। (সূরা মায়ারিজ-৪৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আদিয়াতে বলেছেন–

اَفَلاَ يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَافِى الْقُبُوْرِ –

তারা কি সে সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে সমাহিত সবকিছু বের করা হবে।

কিয়ামতের দিন ভয়বিহ্বল চেহারা নিয়ে মানুষ আল্লাহর দরবারের দিকে দৌড়াতে থাকবে। পবিত্র কোরআনের সূরা ক্বামার-এর ৬-৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلى شَىْءٍ نُّكُرٍ-خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ
يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ-

যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে নিজেদের কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, যেন বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহ।

আধুনিক বিজ্ঞান জানাচ্ছে সমস্ত বিশ্বজগৎ অসংখ্য পরমাণু দ্বারা গঠিত। এ থিউরি অনুযায়ী কোন বস্তু বা জিনিষের নিঃশেষে ধ্বংস নেই। কোন প্রাণীর দেহকে যা-ই করা হোকনা কেন, তা নিঃশেষে ধ্বংস হয় না। মাটির সাথে মিশে থাকে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকা পরমাণুগুলো পুনরায় একত্রিত হয়ে পূর্বের আকৃতি ধারণ করবে। মানুষের দেহ পচে গলে যে অবস্থাই ধারণ করুক না কেন, তা সেদিন পূর্বের আকৃতি ধারণ করে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার জন্যে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ প্রশ্নের ভাষায় বলেন–

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الاَوَّلِ-بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ-

আমি কি প্রথম বার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? মূলত একটি নবতর সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে এই লোকগুলো সংশয়ে নিমজ্জিত। (সূরা ক্বাফ-১৫)

সে যুগেও ছিল বর্তমান যুগেও এক শ্রেণীর অজ্ঞ, মূর্খ, জ্ঞান পাপী আছে, যাদের ধারণা এই মানুষের দেহ সাপের পেটে বাঘের পেটে মাছের পেটে যাচ্ছে। মাটির গর্তে পচে গলে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই শরীর কি পুনরায় বানানো সম্ভব? সুতরাং হাশর, বিচার কিয়ামত একটা বানোয়াট ব্যাপার। পৃথিবীতে যতক্ষণ আছো, খাও দাও ফূর্তি করো। এদেরকে উদ্দেশ্য করে সূরা কিয়ামাহ্-এর ৩-৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

اَيَحْسَبُ الاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَه-بَلى قدِرِيْنَ عَلى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَه-

মানুষ কি মনে করে আমি তার হাড়গুলো একস্থানে করতে পারবো না? কেন পারবো না? আমি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গিরাসমূহ পর্যন্ত পূর্বের আকৃতি দিতে সক্ষম। এই পৃথিবীতে মানুষ যে দেহ নিয়ে বিচরণ করছে, যে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে আল্লাহর বিধান পালন করেছে অথবা অমান্য করেছে, সেই দেহ নিয়েই সেদিন উত্থিত হবে। সূরা আম্বিয়ার ১০৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُه-

আমি যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি ঠিক অনুরূপভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো।

সেদিন কেউ বাদ পড়বেনা। প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে চূড়ান্ত প্রলয়ের দিন পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীর আলো-বাতাসে এসেছে, তাদের সকলকেই একই সময়ে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ-لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ-

সেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। তারপর (সেদিন) যা কিছু ঘটবে তা সকলের চোখের সামনেই ঘটবে। (সূরা হূদ–১০৩)

অর্থাৎ পৃথিবীতে কারো বিচার চলাকালীন অনেক অবিচারই করা হয়। আসামীর চোখের আড়ালে তাকে ফাঁসানোর জন্যে কত কিছু করা হয়। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে এমন করা হবে না। মানুষ প্রতি মুহূর্তে যা কিছু করছে তার রেকর্ড সংরক্ষণ করছেন সম্মানিত দু'জন ফেরেশতা। সে সব রেকর্ড মানুষ নিজেই পড়বে। সেই রেকর্ডের ভিত্তিতেই বিচার করা হবে। তার দৃষ্টির আড়ালে কিছুই করা হবে না। সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে–

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ-لَمَجْمُوْعُوْنَ-اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

হে রাসূল ! আপনি বলে দিন, প্রথম অতীত হওয়া ও পরে আসা সমস্ত মানুষ নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত করা হবে, এর সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

অপরাধীদেরকে ঘিরে আনা হবে

কিয়ামতের দিন শরীর প্রকম্পিত হওয়ার মতো অবস্থা দেখে মানুষ ভয়ে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়বে যে, তারা কিছুতেই স্মরণ করতে পারবে না পৃথিবীতে জীবিত থাকা কালে তারা কত দিন জীবিত ছিল। পরকালের সূচনা এবং তার দীর্ঘতা দেখে পৃথিবীর শত বছরের হায়াতকে তারা মনে করবে বোধ হয় এই ঘন্টাখানেক পৃথিবীতে ছিলাম। ইসলামী বিধান যারা মানেনি তারা সেদিন পৃথিবীতে কত হায়াত পেয়েছিল তা ভুলে যাবে। এ ভুলে যাওয়া কোন স্বাভাবিকভাবে ভুলে যাওয়া নয় বরং ভয়ে আতঙ্কে ভুলে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا-يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ عَشْرًا-

অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘিরে আনবো যে তাদের চক্ষু আতংকে বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। তারা পরস্পর ফিসফিস করে বলাবলি করবে, আমরা পৃথিবীতে বড় জোর দশদিন মাত্র সময় কাটিয়েছি। (সূরা ত্ব-হা-১০২)

মহান আল্লাহ সেদিন মানুষকে প্রশ্ন করবেন–

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَسِنِيْنَ-قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ-

তোমরা পৃথিবীতে কতদিন ছিলে? উত্তরে তারা বলবে একদিন বা তার চেয়ে কম সময় আমরা পৃথিবীতে ছিলাম। (সূরা মুমিনুন-১১২-১১৩)

আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ-مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ-

যখন সে সময়টি এসে পড়বে, তখন অপরাধীগণ শপথ করে বলবে যে পৃথিবীতে আমরা এক ঘন্টার বেশি ছিলাম না। (সূরা রূম-৫৫)

কিয়ামতের ময়দানে ঐলোকগুলোর মুখমন্ডল ধূলিমলিন হবে, পৃথিবীতে যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছিল এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণে অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। এই পৃথিবীতে শত কোটি মানুষ। কেউ কালো কেউ ফর্সা। কেউ মোটা কেউ পাতলা। কেউ সুন্দর কেউ অসুন্দর কুৎসিত। কারো চেহারা এতই সৌন্দর্য মন্ডিত যে, একবার দেখে সাধ মিটে না, বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। আবার কারো চেহারা এতই কুৎসিত যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে বিতৃষ্ণা চলে আসে।

কিন্তু কতক কুৎসিত মানুষের মন, আমল-আখলাক এতই সুন্দর যে, মহান আল্লাহ তাদের উপর রাজী-খুশী থাকেন। আবার কতক সুন্দর চেহারার মানুষ আছে, যাদের মন-মানসিকতা, স্বভাব-চরিত্র এতই জঘন্য যে, খোদ শয়তানও তাদের ক্রিয়াকর্ম দেখলে দূরে সরে যায়। এই পৃথিবীতে বোধহয় সবচেয়ে কঠিন মানুষকে চেনা। সুন্দর মিষ্টি ভদ্র চেহারার আড়ালে জঘন্য মন লুকিয়ে থাকে। ভদ্রতার মুখোশ পরে ভদ্র-সৎ মানুষদের সাথে এই পাপীরা মেশে। পৃথিবীতে এদের চেহারা দেখে অনুমান করা যায় না এরা কত জঘন্য অপরাধী। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন ওই পাপীদের চেহারা এমন হবে যে, ওদের চেহারার দিকে তাকালেই স্পষ্ট চেনা যাবে এরা পাপী। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আবাসায় বলেন–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ–وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَاغَبَرَةٌ–تَرْهَقُهَاقَتَرَةٌ–أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ–

এবং সেদিন কতিপয় মুখমন্ডল ধূলিমলিন হবে। কালিমা লিপ্ত অন্ধকার লিপ্ত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হবে। এরাই হলো অবিশ্বাসী ও পাপী লোক।

যারা আসামী-অপরাধী তাদের চেহারা-ই বলে দেবে সেদিন তারা পাপী। সূরা আর রাহ্মানের ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالاَقْدَامِ–

অপরাধীগণ সেখানে নিজ নিজ চেহারা দিয়েই পরিচিত হবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে চ্যাংদোলা করে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে।

সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে–

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الاَصْفَادِ–سَرَابِيْلُهُمْ

مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ- সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, শিকল দ্বারা শক্ত করে হাত-পা বাঁধা রয়েছে এবং গায়ে গন্ধকের পোষাক পরানো হয়েছে। আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সূরা ইবরাহীম-৪৯-৫০)

গন্ধক আগুনের স্পর্শ পেলে যে কিভাবে জ্বলে ওঠে তা সবাই জানে। সেদিন পাপীদের শরীরে গন্ধকের পোষাক পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আগুন তাদের হাড় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু কখনো মৃত্যু হবে না। আযাবের পরে কঠিন আযাবই শুধু ভোগ করবে।

মানুষ পৃথিবীতে সামান্য দু'দিনের জীবন সুন্দর করার জন্য কত রকমের সাধনা-চেষ্টা করে। সন্তান যখন দু'আড়াই বছর বয়সে কথা বলতে শেখে তখন থেকেই তাকে লেখা-পড়া শিক্ষা দেয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রী অর্জন করার পরেও তাকে আরো উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিদেশে পাঠায়।

এ সবই করা হয় পৃথিবীতে সুন্দরভাবে জীবন-যাপনের জন্য। কিন্তু এই দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত স্বল্প সময়ের। স্বল্প সময়ের এই জীবনকে সুন্দর করার জন্য এত চেষ্টা-সাধনা। অথচ পরকালের অনন্তকালের জীবন সুন্দর করার জন্য কোন প্রচেষ্টা নেই। বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করে শিক্ষিত হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু নিজের ঘরে কোরআন শরীফ, সেটা একবার খুলেও দেখছে না এর ভেতর কি আছে। ইসলাম সম্পর্কে যারা জ্ঞান অর্জন না করে শুধু অন্যান্য বিষয়েই বিরাট বিরাট পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী সেজেছে, তাদেরকে আল্লাহ অন্ধ বলেছেন। কারণ এদের চোখ থাকতেও এরা কোরআন হাদিস, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে সেই অনুযায়ী কাজ করেনি। সত্য পথ এই সব জ্ঞানপাপী, পন্ডিত, বুদ্ধিজীবীগণ দেখার চেষ্টা করেনি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

আর যারা পৃথিবীতে (সত্য দেখার ব্যাপারে) অন্ধ হয়ে থাকবে, তারা আখেরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে। বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে তারা অন্ধদের চেয়েও ব্যর্থকাম। (বনী-ইসরাইল-৭২)

পৃথিবীতে কত দৃষ্টিবান মানুষ এই চোখ দিয়ে নানা ধরনের পুস্তক পড়ে, গবেষণা করে, পর্যবেক্ষণ করে বিরাট বিরাট পন্ডিত হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অন্ধই থেকে যাচ্ছে। আবার কত দৃষ্টিহীন অন্ধ মানুষ, যারা অপরের সাহায্যে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে ইসলামের বিধান মেনে চলছেন। জ্ঞানপাপীদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেছেন এরা প্রকৃত অন্ধদের চেয়েও অন্ধ ব্যর্থকাম। মহান আল্লাহ বলেন–

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا-مَأْوهُمْ جَهَنَّمُ-

আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন অন্ধ, বোবা ও কালা (বধির) করে উল্টো করে টেনে নিয়ে আসবো। এদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। (সূরা বনী-ইসরাইল-৯৭)

এই সমস্ত জ্ঞান পাপী মুর্খ পন্ডিতগণ যারা ইসলামী জ্ঞান অর্জনও করেনি মেনেও চলেনি বা বিশ্বাসও করেনি। এরা যখন কিয়ামতের ময়দানে অন্ধ হয়ে উঠবে তখন এরা কি বলবে সে সম্পর্কে সূরা ত্বাহায় মহান আল্লাহ বলেন–

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْمى-قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا-

কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো তখন সে বলবে, হে রব! পৃথিবীতে তো আমি দৃষ্টিমান ছিলাম কিন্তু এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে?

পৃথিবীতে যারা জীবিত থাকতে নিজের খেয়াল খুশী মতো চলেছে, তারা কিয়ামতের ময়দানে ভয়াবহ অবস্থা স্বচোক্ষে দেখে অনুশোচনা-অনুতাপ করবে। আফসোছ করে বলবে কেন আমি এই পরকালের জীবনের জন্যে কিছু অর্জন করে পাঠাইনি! কিন্তু মৃত্যুর পরে তো কোন অনুতাপ আফসোছ কাজে আসবে না। কোরআন শরীফে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ওই পাপীদেরকে আফসোছ করতে দেখে তিনি বলবেন, 'কেন, পৃথিবীতে তো আমি তোমাদেরকে যথেষ্ট হায়াত দিয়েছিলাম, তখন তো আজকের এই অবস্থাকে তোমরা অবিশ্বাস করেছো।' সূরা ফজর-এর ২৩-২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَجَاىْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ-يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّى لَهُ الذِّكْرى-يَقُوْلُ يلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ-

আর জাহান্নামকে সেদিন সবার সামনে হাজির করা হবে। তখন মানুষের বিশ্বাস জন্মাবে। কিন্তু তখন তার বিশ্বাস অবিশ্বাসের তো কোন মূল্য থাকবে না। আফসোস করে তখন সে বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি এই জীবনের জন্যে অগ্রিম কিছু পাঠাতাম!

সেদিন মানুষ সবকিছু দেখতে থাকবে

পৃথিবীতে মানুষ যা করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন সে নিজ চোখে দেখতে পাবে। আল্লাহর সৃষ্টি এই মানুষ আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দিয়েই কত কিছু আবিষ্কার করেছেন এবং করছে। মানুষে কণ্ঠস্বর, ছবি, ক্রিয়াকান্ড, হাসি, কান্না শত শত বছর ফিতা। মাধ্যমে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছে। তেমনিভাবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের সকল কর্মকান্ড, কথা ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের নিজের আমলসমূহ কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে। সূরা নাবা-এর ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ يلَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا-

সেদিন মানুষ সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রিম পাঠিয়েছে। তখন প্রতিটি অবিশ্বাসী কাফের চিৎকার করে বলবে, "হায়! আমি যদি (আজ) মাটি হয়ে যেতাম।

সেদিন নেতা ও অনুসারীগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করবে

পৃথিবীর এমন মানুষের সংখ্যা অগণিত, যারা নিজেদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগায় না। অপরের পরামর্শ অনুযায়ী চলে। কেউ চলে পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী। কিন্তু চিন্তা করে দেখে না পিতা-মাতার কথা ইসলাম সম্মত কিনা। আবার কেউ চলে নেতাদের কথা অনুযায়ী। চোখে দেখছে, মসজিদে আজান হচ্ছে, নামাজের সময় চলে যাচ্ছে তবুও নেতা বক্তৃতা করেই যাচ্ছেন। নেতা নিজেও নামাজ আদায় করছে না দলের লোকদেরকে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছে না। এই ধরনের খোদাদ্রোহী নেতৃবৃন্দের কথা অনুযায়ী এক শ্রেণীর মানুষ চলে। আবার আরেক ধরনের মানুষ আছে যারা অন্ধভাবে পীর-মওলানাদের কথা অনুযায়ী চলে। চিন্তা করে দেখে না, পীর বা মওলানা সাহেবের কথার সাথে আল্লাহ রাসূলের কথার

মিল আছে কিনা। পীর বা মাওলানা হলেই যে সে ফেরেশতা হয়ে যাবে এটা তো কোন যুক্তি নয়। পৃথিবীতে যারা নিজে ইসলামী জ্ঞান অর্জন না করে অন্যের পরামর্শে ভুল পথে চলে তাদের অবস্থা কিয়ামতের দিন কেমন হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা ফুরকানের ২৭-২৯ নং আয়াতে বলেন–

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً-يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِى لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً-لَقَدْ اَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَاءَ نِىْ-

অপরাধী জালিমগণ সেদিন নিজের হাত কমাড়াতে থাকবে এবং বলবে-হায়, আমি যদি রাসূলের সংগ গ্রহণ করতাম। (অর্থাৎ রাসূলের আদর্শ যদি মেনে চলতাম) হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনায় পড়েই আমি সে নসীহত গ্রহণ করিনি যা আমার নিকট এসেছিল।

অর্থাৎ ওই সমস্ত ব্যক্তিকে যদি অনুসরণ না করতাম, যারা আমাকে ভুল পথে চালিয়েছে। তাদের কারণেই আমি ওই সমস্ত মানুষদের কথা শুনিনি–যারা আমাকে ইসলামের পথে ডেকেছে। অপরাধীগণ আযাবের ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবে, যদি এই হাশর বিচার না হতো! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا-وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ-تَوَدُّلَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا-

নিশ্চয়ই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে। (সে ফল) হোক ভালো অথবা মন্দ, সেদিন তারা কামনা করবে যে, এ দিনটি যদি তাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করতো, তবে কতই না ভালো হতো। (আল-ইমরান-৩০)

পৃথিবীর আদালতে উকিল-ব্যারিষ্টারকে টাকার বিনিময়ে আসামীর পক্ষে নিয়োগ করা হয়। তারা নানা যুক্তি দিয়ে, কথার কূটকৌশল প্রয়োগ করে, মিথ্যে কারণ দেখিয়ে স্পষ্ট চিহ্নিত খুনী আসামীকেও নির্দোষ বানানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন এ সমস্ত কূট কৌশল চলবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের প্রতিটি মানুষের সাথে আল্লাহ কোন মাধ্যম ছাড়াই কথা বলবেন, (অর্থাৎ হিসাব নেবেন) সেখানে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কোন উকিল বা দো-ভাষী থাকবে না। আর তাকে লুকিয়ে রাখার কোন আড়াল

থাকবে না। সে যখন ডান দিকে তাকাবে তখন নিজের কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সেদিকেও নিজের কর্মসমূহ ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা। যখন সামনের দিকে তাকাবে তখন জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা। অতএব অবস্থা যখন এই তখন তোমরা একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন হতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো। (বোখারী, মুসলিম)

পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধানে সাথে বিরোধিতা করেছে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, কিয়ামতের ময়দানে যখন জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী তাদেরকে প্রশ্ন করবে। পবিত্র কোরআনের সূরা মূল্‌ক-এর ৭-৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ-تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ-كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ-

তারা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে। জাহান্নাম উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তার ভেতরে কোন জনসমষ্টি (অপরাধী দল) নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার দ্বার রক্ষী সেই লোকদেরকে প্রশ্ন করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসেনি?

জাহান্নামের দ্বাররক্ষী বলবে, এই ভয়ঙ্কর স্থানে তোমরা কেমন করে এলে? এই জাহান্নামের মতো কঠিন স্থান আল্লাহ আর দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করেননি। আল্লাহর বিধান অমান্য করলে এই স্থানে আসতে হবে, পৃথিবীতে এ সংবাদ কি তোমাদেরকে কেউ অবগত করেনি? তখন জাহান্নামীগণ কি জবাব দিবে আল্লাহ তা শোনাচ্ছেন-

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَ نَا نَذِيْرٌ-فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ-اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ-

তারা জবাবে বলবে, হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের কাছে এসেছিল বটে কিন্তু আমরা তাকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আসলে তোমরা মারাত্মক ভুলের ভেতরে নিমজ্জিত রয়েছো।

ইসলামী আন্দোলন বিরোধী জাহান্নামের যাত্রীরা প্রশ্নকারীকে বলবে, 'আমাদের কাছে নবী-রাসূল, আলেম-ওলামা, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী এসেছিল। তারা আমাদেরকে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল। আমরা তাদের দাওয়াত কবুল করিনি। তাদের সাথে আমরা বিরোধিতা করেছি। আমরা তাদেরকে মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়ে বলেছি, তোমরা সেকেলে আদর্শ অনুসরণ করে চলছো। আল্লার বিধান বলে তোমাদের কাছে কিছুই নেই। ইসলামের নামে তোমরা নিজেদের বানানো আদর্শ দেশ ও জাতির বুকে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছো। দেশ ও জাতিকে তোমরা প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে অধঃগতির দিকে নিয়ে যেতে চাও।' এই লোকগুলো সেদিন আফসোস করে নানা কথা বলবে। সূরা মূল্‌ক-এ আল্লাহ শোনাচ্ছেন, সেদিন তারা কি বলবে–

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

আর তারা বলবে, হায়! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না!

আমরা যদি কোরআনের কথা শুনতাম, ইসলামের বিধান অনুধাবন করে তা অনুসরণ করতাম, তা হলে আজ এই জাহান্নামে যেতে হতো না। ইন্না কুন্না লাকুম তাব'আন–আমরা যদি অনুসরণ করতাম–আমরা যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতাম, তাহলে আজ এই কঠিন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হতাম না।

সেদিন সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা হবে

পৃথিবীর মানুষ একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে, গোপনে খুন, নারী ধর্ষণ, চুরি করে। ঘুষ খায়। সমাজে সে সব হয়ত কোনদিন প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেদিন! সেদিন যে কত সাধু ধরা পড়ে যাবে তা আল্লাহই জানেন। সূরা হাক্কায় মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ–

সেদিন সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা হবে। তোমাদের কোন তত্ত্ব ও তথ্যই লুকিয়ে থাকবে না।

এই পৃথিবীর মাটির উপরে মানুষ বিচরণ করছে। কিয়ামতের দিন এই মাটি কথা বলবে। মহান আল্লাহ বলেন– يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا – সেদিন তা (জমিন) নিজের উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে? (সূরা যিলযাল-৪)

কোরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল বলেন, 'তোমরা কি বলতে পারো, সেই অবস্থাটা কি-যা সে (মাটি) বলবে?' উপস্থিত লোকেরা বললো, 'আল্লাহ এবং তার রাসূলই এ বিষয়ে অধিক জানেন।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মাটি প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী লোক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যে, তার উপর (মাটির উপর) থেকে কে কি করেছে। মাটি এসব অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিবে। মানুষের আমল বা কর্ম সমূহকেই এ আয়াতে আখবার (সংবাদের নিদর্শন) বলা হয়েছে। (তিরমিজি ও আবু দাউদ)

যমীন তার উপরে যা কিছু ঘটবে সব কিছু কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে প্রকাশ করে দিবে, এ কথাটি সে যুগের মানুষের কাছে অদ্ভুত বিস্ময়কর মনে হয়েছে। অনেকে অবিশ্বাসও করেছে। মাটি কথা বলবে, এটা তাদের বোধহয় বোধগম্য হতো না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের অপূর্ব আবিষ্কার সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, টেপ-রেকর্ডার, আলট্রাসনোগ্রাফী, কার্ডিওলজি টেলেক্স, ফ্যাক্স কম্পিউটার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ও ব্যবহার মানুষকে স্পষ্ট ধারণা দিচ্ছে-মাটি কথা বলবে এটা অসম্ভবের কিছু নয়। মানুষ নিজের মুখে যা বলে, তা বাতাসে ইথারের প্রবাহ, ঘরের প্রাচীর, ঘরের ছাদ ও মেঝেতে, ঘরের আসবাবপত্রের প্রতিটি বিন্দুতে বিন্দুতে সমস্ত কিছুর অণু-পরামাণুতে মিশে থাকে। মানুষের বলা কথা কণ্ঠ হতে উচ্চারিত যে কোন ধ্বনির ক্ষয় নেই ধ্বংস নেই।

মহাবিজ্ঞানী পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনযখন চাইবেন তখন পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে মিশে থাকা মানুষের কণ্ঠস্বর ও উচ্চারিত ধ্বনি ঠিক তেমন ভাবেই পুনরায় উচ্চারণ করাতে পারবেন-যেমন তা প্রথমবার মানুষের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত বা ধ্বনিত হয়েছিল। মানুষ বহু শত বছর পূর্বে তার নিজের বলা কথা তখন নিজ কানেই শুনতে পাবে। তার পরিচিত লোকরাও শুনে বুঝতে পারবে এই কণ্ঠস্বর অমুকের। মানুষ পৃথিবীর বুকে যে অবস্থায় এবং যেখানে যে কাজ করেছে তার প্রত্যেকটি গতিবিধি ও নড়াচড়ার ছবি বা প্রতিবিম্ব মানুষের আশে পাশে নিচে উপরে যা থাকে অর্থাৎ পরিবেশের প্রতিটি জিনিষের উপরেই পড়ছে। মানুষের স্পন্দনের প্রতিটি ছায়া প্রতিটি বস্তুর উপরে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বর্তমানে মানুষ স্যাটালাইটের মাধ্যমে যে কেরামতি দেখাচ্ছে, কিন্তু যে আল্লাহ মানুষকে ঐ স্যাটালাইট আবিষ্কারের জ্ঞানদান করেছেন, সেই আল্লাহ কি স্যাটালাইট বানিয়ে মানুষের প্রতিটি গতিবিধির ছবি ধরে রাখছেন না? মানুষ পানির অতল প্রদেশে, তিমিরিাচ্ছন্ন ঘন অন্ধকারে স্পষ্ট চবি তোলার জন্যে ক্যামেরা বানিয়ে তা ব্যবহার করছে। ঠিক তেমনি মানুষ নিশ্ছিদ্র ঘন অন্ধকারে কোন কাজ করলেও তার ছবি উঠে যাচ্ছে।

কারণ আল্লাহর এ বিশাল পৃথিবীর এমন শক্তিশালী ক্যামেরা বা আলোকরশ্মি চলমান আছে যার কাছে আলো অন্ধকারের কোন তারতম্য বা পার্থক্য নেই, তা যে কোন অবস্থায় কাছের ও দূরের যে কোন ছবি তুলতে সক্ষম। মানুষের যাতবীয় কর্ম তো বটেই এমনকি তার পায়ের নিচে চাপা পড়ে ছোট একটা উকুনও যখন মারা যাচ্ছে তখন তখনই সে ছবি উঠে যাচ্ছে। এসব ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব কিয়ামতের দিন চলচ্চিত্রের মতোই সমস্ত মানুষের দৃষ্টির সামনে ভাসমান ও ভাস্কর হয়ে উঠবে। মানুষ নিজের চোখেই দেখবে সে ডাকাতি, ছিনতাই করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে, হত্যা করেছে, নারী ধর্ষন করেছে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করেছে, সুদ, ঘুষ খেয়েছে সব কিছুই দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়-মানুষের মনের মধ্যে যে সব চিন্তা চেতনা কামনা বাসনার উদয় হয় তা-ও বের করে মানুষের দৃষ্টির সামনে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেয়া হবে।

বিচার দিবসে পাপীগণ নিজের দোষ অন্যে ঘাড়ে চাপাবে। মানুষ তার মানবিক দূর্বলতার কারণে অন্যের খেয়াল খুশী মতো কাজ করতে বাধ্য হয়, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর জন্যে, স্ত্রী-স্বামীর জন্যে, পিতা সন্তানের জন্যে, সন্তান পিতার জন্যে, বন্ধু-বন্ধুকে খুশী করার জন্যে, রাজনৈতিক নেতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, পীর ও শিক্ষককে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে, উর্ধ্বতন অফিসারকে খুশী করে নিজের চাকরী পাকাপোক্ত করার জন্য, অথবা চাকরিতে প্রমোশনের জন্যে, মন্ত্রী, এম, পি, চেয়ারম্যান-মেম্বারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমন কাজ করে, যে কাজ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

এ সমস্ত মানুষদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে হাশরের ময়দানে তাদেরকে চরমভাবে প্রতারিত ও নিরাশ হতে হবে এবং আযাব ভোগ করতে হবে। পরকালে তারা কঠিন আযাব ভোগ করবে, এ কথা পবিত্র কোরআনে বার বার উল্লেখ করে এ ধরনের আত্মপ্রবঞ্চিত দলকে সর্তক করে দেয়া হয়েছে।

সেদিন কর্মীগণ নেতাদের ওপরে দোষ চাপাবে

পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الاَسْبَابُ–وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا–كَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ–وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ–

যাদের কথায় (নেতা বা ক্ষমতাবান) মানুষ চলতো, তারা (নেতাগণ) কিয়ামতের দিন তাদের দলের লোকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ কেটে পড়বে। নেতা এবং অনুসারীগণ সেদিনের ভয়ংকর শাস্তির ভয়াবহতা দর্শন করবে। নেতা এবং অনুসারীদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীগণ বলতে থাকবে, যদি কোন প্রকারে আমরা একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরা সেখানে (পৃথিবীতে নেতাদের) এদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম যেমন করে আজ তারা (নেতাগণ) আমাদের থেকে (বিচ্ছিন্ন) হয়েছে, কিন্তু মহান আল্লাহ সকলকেই (নেতা ও কর্মীদেরকে) তাদের কর্মফল দেখিয়ে দিবেন যা তাদের জন্যে অবশ্যই অনুতাপ-অনুশোচনার কারণ হবে। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা সে জাহান্নামের আগুন থেকে কোনক্রমেই বের হতে পারবে না।

অতএব হায়াত থাকতে অবশ্যই মানুষকে সাবধান হতে হবে। কারো নির্দেশ মেনে চলা যাবে না, সে যত বড় নেতা হোক, যত বড় পীর-মাওলানা হোক না কেন। কেউ কোন নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ ইসলাম সম্মত কিনা-তা যাচাই করে তারপর মেনে চলতে হবে। পৃথিবীতে যারা যাচাই-বাছাই না করে, যে কোন নেতা গোছের মানুষের অনুসরণ করেছে তাদের ও তাদের নেতাদের মৃত্যুকালের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। মৃত্যুর সময়ে ফেরেশ্তা তাদেরকে প্রশ্ন করবে-সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قَالُوْا اَيْنَ مَاكُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ–قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ–قَالَ ادْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ فِى النَّارِ–كُلَّمَا

دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا-حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا-قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ-قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَعْلَمُوْنَ-وَقَالَتْ اُوْلٰهُمْ لِاُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের আইন-নির্দেশ মেনে চলতে, তারা আজ কোথায়? (উত্তরে) তারা বলবে, তারা (নির্দেশদাতাগণ) তাদের কাছ থেকে সরে পড়েছে। তারপর তারা স্বীকার করবে যে, তারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসই করেছে। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের মধ্যে জ্বিন এবং মানুষের মধ্যে যে দল অতিত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। অতঃপর এদের একটি দল (অনুসারীগণ) যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরই অনুরূপ দলের (নেতাগণের) প্রতি অভিশাপ করতে থাকবে। যখন সব দলগুলো (অনুসারী দল ও খোদাদ্রোহী নেতাদের দল) সেখানে প্রবেশ করবে তখন (অনুসারী দল-নেতাদের সম্পর্কে) পরবর্তী দল তার পূর্ববতী দল সম্পর্কে একথা বলবে-হে প্রভু, ওরা (খোদাদ্রোহী নেতাগণ) আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের উভয়ের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোন জ্ঞান রাখোনা।' তাদের প্রথমটি শেষেরটিকে বলবে, তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও, অতএব তোমরা তোমাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করো। (সূরা আরাফ)

ইসলাম বিরোধী নেতা-কর্মীরা জাহান্নামে কঠিন আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং এরা একে অপরের প্রতি অভিশাপ দিতে থাকবে। এদের অবস্থা সম্পর্কে সূরা আহযাবের ৬৬-৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا-وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا-رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا-

যেদিন তাদের চেহারা আগুনে ওলট-পালট করা হবে তখন তারা বলবে, হায় ! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব্ব ! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর অভিশাপ বর্ষণ করো।

মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যারা পৃথিবীতে আন্দোলন করেছে, চেষ্টা-সাধনা করেছে, সেসব নেতাদের যারা অনুসরণ করেছে, সেসব কর্মীদেরকে যখন জাহান্নামের আগুনের ভেতরে জ্বালানো হবে, তখন তারা বলবে, পৃথিবীর ঐ সব নেতা এবং সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকগুলো আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা দান করেছে, তাদের কারণেই আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। হে আল্লাহ ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উভয়ের (অনুসারীগণ ও খোদাদ্রোহী নেতাগণ) জন্যেই দ্বিগুণ আযাব। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোন জ্ঞান রাখো না। তাদের প্রথমদল (অনুসারী দল) শেষের দলটিকে বলবে (নেতাদের দল) তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও। অতএব তোমাদের অর্জিত কর্মের শাস্তি ভোগ কর।

পৃথিবীতে সাধারণত দেখা যায় যাদের অর্থ নেই, বিত্ত নেই, দুর্বল, যারা শোষিত তারাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্ষমতাবান মানুষদের অত্যাচারী খোদাদ্রোহী শাসকদের আইন-কানুন, নির্দেশ মেনে চলে। মানতে বাধ্য হয়। কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে এদের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে–

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ -قَالُوْا لَوْهَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ-سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ-

যখন উভয়দলকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে, তখন দুর্বল মানুষগুলো ক্ষমতা গর্বিত উন্নত শ্রেণীর (ক্ষমতাবানদের) লোকদের বলবে, আমরা তোমাদেরই কথা মেনে চলেছিলাম। আজ তোমরা কি আল্লাহর আযাবের কিছু অংশ আমাদের জন্যে লাঘব করে দিতে পারো? তারা বলবে, তেমন কোন পথ আল্লাহ আমাদের দেখালে

তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এখন এ শাস্তি আমাদের জন্যে অসহ্য হোক অথবা ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করি উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। এখন আমাদের পরিত্রানের কোন উপায় নেই। (সূরা ইবরাহীম-২১)

অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে কর্মিদের দল আযাবের ভয়াবহতা দেখে তাদের নেতাদের বলবে, পৃথিবীতে আমরা ইসলামের বিধান মানিনি, তোমাদের নির্দেশ মেনে চলেছি। আজ জাহান্নামের এই যে ভয়ংকর আযাব আমরা ভোগ করছি, ও নেতারা, আজ কি পারো আল্লাহর আযাব কিছুটা কমিয়ে দিতে। পৃথিবীতে তো তোমরা অনেক বড় বড় কথা বলেছো, অনেক ক্ষমতা দেখিয়েছো। আজ সেই ক্ষমতা একটু দেখাও না! খোদাদ্রোহী নেতারা বলবে, আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ আমাদেরই জানা নেই, তোমাদের জানাবো কিভাবে? এখন আমরা সবাই যে শাস্তি ভোগ করছি, তা যতই অসহ্য হোক না কেন, অথবা ধৈর্যের সাথেই আযাব ভোগ করি না কেন। একই ব্যাপারে আজ আমরা ধরা পড়েছি। এই আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ আর খোলা নেই। পবিত্র কোরআনের সূরা সাবা বলছে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلاَ بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ–وَلَوْتَرَاى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ–يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ–يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ–قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ–وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْتَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَه اَنْدَادًاوَاَسَرُّوا النَّدَا مَةَ لَمَّارَاَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الاَغْلٰلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا–هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

এসব অবিশ্বাসীগণ বলে, কিছুতেই কোরআন মানবো না। এর আগের কোন কিতাবকেও মানবো না। তোমরা যদি তাদের অবস্থা (হাশরের দিন) দেখতে যখন

ও জালেমরা তাদের প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে। সেদিন অসহায় দূর্বলগণ (পৃথিবীতে যারা ছিল অর্থবিত্তহীন) গর্বিত সমাজপতিদের (পৃথিবীতে যারা ছিল ক্ষমতাবান) বলবে, তোমরা না থাকলে তো আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনতাম। (অর্থাৎ তোমরাই আমাদেরকে ইসলামী আইন মানতে দাওনি।) গর্বিত সমাজপতিরা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট হেদায়েতের বানী পৌছার পর আমরা কি তোমাদেরকে সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম? তোমরা নিজেরাই তো অপরাধ করেছো। দুর্বলেরা বড় লোকদের বলবে-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বরং তোমাদের দিবারাত্রির চক্রান্তই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিল, আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তার আইন মানার ব্যাপারে, তার সাথে শরীক করতে তোমরাই তো আমাদের নির্দেশ দান করতে। তারা যখন তাদের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি দেখতে পাবে তখন তাদের লজ্জা ও অনুশোচনা গোপন করার চেষ্টা করবে। আমরা এসব অপরাধীদের গলায় শৃংখল পরিয়ে দেব। যেমন তাদের কর্ম, তেমনি তারা পরিণাম ফল ভোগ করবে।

ইসলামের বিধান অমান্যকারীরা ওই সমস্ত মানুষদের সাথে শত্রুতা করে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর আইন মেনে চলে। ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, মারধোর করে, নানাভাবে কষ্ট দেয়। হাশরের পরে ইসলামের দুশমনরা যখন জাহান্নামের যাবে –তখন তারা জাহান্নামের মধ্যে ওই মানুষগুলোকে খুঁজবে-পৃথিবীতে যারা ইসলামের আইন মেনে চলেছে। কোরআন শরীফ বলছে–

وَقَالُوْا مَالَنَا لاَنَرَاى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الاَشْرَارِ–

এবং তারা (অবিশ্বাসীরা জাহান্নামের মধ্যে থেকে) বলবে, কি ব্যাপার তাদেরকে তো দেখছি না, যাদেরকে আমরা দুষ্ট মানুষদের মধ্যে গণ্য করতাম। (অর্থাৎ পৃথিবীতে যাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ, শত্রুতা করেছি, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়েছি) (সূরা সোয়াদ-৬২)

পৃথিবীতে মানুষ কখনো মুক্ত স্বাধীন হতে পারে না-হবার উপায়ও নেই। মানুষ কারো না কারো আইন মেনে চলেই। কেউ নিজের মনের আইন মানে, কেউ সমাজের সমাজপতিদের আইন মানে, নেতা-নেত্রীদের নির্দেশ মেনে চলে অর্থাৎ মানুষ একটা নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়ম তার নিজের মনের বানানো অথবা অন্য মানুষের বানানো। হাশরের ময়দানে নেতা অর্থাৎ সমাজে বা দেশে, নিজ এলাকায়

ছিল প্রভাবশালী, তারা এবং ওই সমস্ত মানুষ, যারা প্রভাবশালীদের নির্দেশ মেনে চলতো মুখোমুখি হবে। চোখের সামনে ভয়ংকর আযাব দেখে ওই প্রভাবশালী লোকদেরকে অর্থাৎ নেতাদেরকে সাধারণ মানুষ ঘিরে ধরবে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলবে–এই তোমরা, তোমাদের কারনেই আজ আমরা জাহান্নামের যাচ্ছি। তোমাদেরকে আমরা নেতা বানিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেরাও ইসলামী আইন মানোনি আমাদেরকেও মানতে আদেশ করোনি।

প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় মানুষগুলো তখন বলবে-দেখো, আমরা তোমাদেরকে জোর করে আমাদের আদেশ মানতে বাধ্য করিনি। কেন তোমরা পৃথিবীতে আমাদের পেছনে ছুটতে? আমাদের কি ক্ষমতা ছিল? আসলে তোমরা ইচ্ছা করেই ইসলামের আইন অমান্য করেছো। আমরাও ভুল পথে ছিলাম তোমরাও ভুল পথে ছিলে। এখন আমাদের সবাইকে জাহান্নাম যেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে যারা ইসলামের পথে চলতো এবং দিকে ডাকতো তারাই সত্য পথের পথিক ছিল।

সেদিন শয়তান বলবে আমার কোনো দোষ নেই

কিয়ামতের ময়দানে শাস্তির ভয়াবহতা অবলোকন করে সমস্ত অপরাধীগণ সম্মিলিতভাবে ইবলিস শয়তানকে চেপে ধরে বলবে-আজ তোকে পেয়েছি। তুই আমাদেরকে পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট করেছিলি। আমাদের কাছে তুই ওয়াদা করেছিলি, আমরা যদি তোর কথা মতো চলি তাহলে সুখ শান্তি পাবো। কিন্তু কোথায় আজ সেই সুখ শান্তি? তখন শয়তান বলবে–দেখো, আজ আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ো না। আজ আমার কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমি তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম সে ওয়াদা ছিল মিথ্যে, আমার দেখানো পথে চলতে আমি তোমাদেরকে বাধ্য করিনি, আমি তোমাদের ঘাড় ধরে আমার দলে ডাকিনি। দোষ আমার এতটুকুই যে, আমি তোমাদের ডাক দিয়েছি আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। সূরা ইবরাহীমের ২২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন–

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْ تُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ–وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ–فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ–مَا اَنَا

بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ-اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ-اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

আর যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেসব ওয়াদা করেছিলেন, তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম, তার মধ্যে একটিও পূরণ করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোন জোর ছিল না। আমি এ ছাড়া আর কিছুই করিনি, শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিও না, তিরস্কার করো না, নিজেরাই নিজেদেরকে তিরস্কার করো। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে রব্ব-এর ব্যাপারে অংশীদার বানিয়ে ছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ধরনের জালিমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।

অর্থাৎ শয়তান ও তার অনুসারীরা পরস্পর দোষারোপ করতে থাকবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমার আইন মেনে চললে জান্নাত পাবে, না মানলে জাহান্নামে যাবে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর আমি তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম, তা ভঙ্গ করেছি। এখন আমার উপর তোমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমি তো শুধু পৃথিবীতে তোমাদেরকে ডাক দিয়েছি, আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো। সুতরাং আজ আমার উপর দোষ চাপিও না বরং নিজেদেরকে দোষ দাও। কারণ আমি তোমাদের ঘাড় ধরে কিছু করাইনি আর তোমারাও আমাকে জোর করে কিছু করাওনি। তোমরা আমার পথ ধরে যে কুফরি করেছো, সে সবের দায় দায়িত্ব আমার নয়, আমি সব অস্বীকার করছি।

চুলচেরা হিসাবের দিন হাশরের ময়দান। কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে যখন মানুষের সমস্ত কাজের বিচার অনুষ্ঠিত হবে-সেদিনটিকে মহান আল্লাহ কোরআন শরীফে মানুষের জয় পরাজয়ের দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সফলতা ও ব্যর্থতার দিন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا-قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ-وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ-فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ

وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا-وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ-وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا-ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا-وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অবিশ্বাসীগণ বড় অহংকার করে বলে বেড়ায়, মৃত্যুর পরে আর কিছুতেই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। (হে নবী) তাদেরকে বলে দিন, আমার প্রভুর শপথ-নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পরকালে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। তারপর তোমরা পৃথিবীতে যা যা করেছো, তা জানানো হবে। আর এসব কিছুই আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই 'নূরের' প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তোমরা যা কিছু করো, তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত। এসব কিছুই তোমরা জানতে পারবে সেই দিন, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সেই মহাসম্মেলনের (হাশরের দিনে মানুষের জমায়েত) জন্যে একত্র করবেন। সেদিনটা হবে পরস্পরের জন্যে জয়-পরাজয়ের দিন। যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহর তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার দান করবেন। যে জান্নাতের নিম্নভাগে দিয়ে প্রবাহিত হবে স্রোতস্বিনী। তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। অপরদিকে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের অস্বীকার করবে এবং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে আমার বাণী ও নিদর্শন, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সে স্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা তাগাবুন-৭-১০)

এই আয়াতে 'নূর' বলতে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। কোরআন শরীফের অনেকগুলো নাম আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। নূর আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো স্পষ্ট উজ্জ্বল আলো। সুতরাং কোরআন শরীফ এমনি উজ্জ্বল আলোর ন্যায়-যা অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায় অবিচারের অন্ধকারকে দূর করে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করতে। মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টি করে তাকে পরিপূর্ণ

স্বাধীনতা দান করেছেন। সে ইচ্ছে করলে তার স্রষ্টা আল্লাহ, তার নবী-র্‌াসূল, তার জীবন বিধান কোরআন অস্বীকার করে পৃথিবীতে যেমনভাবে মন চায় তেমনভাবে চলতে পারে। অবশ্য এভাবে চললে মানুষের পরিণাম যে কি হবে, তা-ও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আবার মানুষ ইচ্ছে করলে আল্লাহ, রাসূল, কোরআন ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে পৃথিবীতে অত্যন্ত সৎভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। এভাবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করলে তার ফলাফল যে কি, তা-ও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেমন স্বাধীনতা দান করেছেন, সৎ এবং অসৎ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সৎপথে চললে পুরস্কার এবং অসৎপথে চললে শাস্তি-এ ঘোষনাও দিয়েছেন, তেমনিভাবে এ পরীক্ষাও তিনি মানুষের কাছ থেকে নেবেন পৃথিবীর জীবনে কোন মানুষ জয়ী বা সফল হলো আর কোন মানুষ পরাজিত বা ব্যর্থ হলো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের
তাফসীর মাহফিল থেকে

বিষয়ভিত্তিক
তাফসীরুল কোরআন

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী